

মাসুদ রানা

স্বর্ণ-বিপর্যয়

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

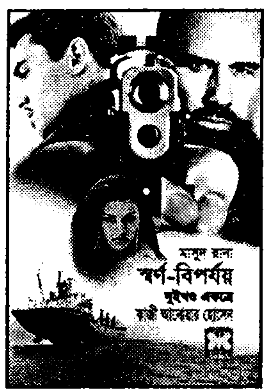
সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

স্বর্ণ-বিপর্যয়

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7686-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১১

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
SHARNO-BIPORJOY
Part I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

একাত্তর টাকা

স্বর্ণ-বিপর্যয়-১ : ৫–১৩০
স্বর্ণ-বিপর্যয়-২ : ১৩১–২৬৪

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৬৪/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৬৭/-
৭-৩৭২	শত্রু ভয়ঙ্কর+অরক্ষিত জলসীমা	৫৯/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৫৯/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪৯/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৫৮/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৪৬/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৩৩/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৫৯/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৮/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৫২/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	৪৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৫৯/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৫০/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৬০/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১,২ (একত্রে)	৫৭/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৯৬/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৮/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৮৮/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৮/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৬৪/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৭৫/-
১৫৬-১৫৭	মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৫৯/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৯০/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৮৫/-
১৬৮-১৬৯	অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭০-১৭১	যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৭৪-১৭৫	কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭	কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৬১/-

১৮২-১৮৩ যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৮৪-১৮৫ আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৬৫/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৯৩-১৯৪ প্রলয়সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৭৫/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৬৭/-
২১৭-২১৮ অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৬০/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭ অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে)	৬৩/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে)	৫৬/-
২৬৯-২৮৫ বিগব্যাঙ+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৯/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৫২/-
২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৯-২৮২ মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৫১/-
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭ আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪৬/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৪৭/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে)	৪১/-
২৯০-২৯৩ গুডবাই, রানা+কান্তার মরু	৪৬/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩০১-৩৪৪ জলশত্রু+ক্রাইম বস	৪১/-
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী	৪৭/-
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম	৫৪/-
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা	৪১/-
৩১১-৩১৪ বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ	৪৭/-
৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু	৪৯/-
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা	৪০/-
৩১৮-৩৪৭ চরসদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা	৫০/-
৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর	৫৫/-
৩২২-৩৩৬ আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা	৫৪/-
৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা	৬২/-
৩২৪-৩২৮ অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল	৭৬/-
৩২৫-৩৫১ কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ	৪৪/-
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে)	৭৬/-
৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ	৪৬/-
৩৩১-৩৪১ ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার	৬১/-
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সঙ্কেত+সবুজ সঙ্কেত	৫০/-
৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+প্রজেক্ট X-15	৫৯/-
৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন	৫৪/-
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব	৪৮/-
৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে)	৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী	৬৬/-
৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন	৪৮/-
৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ	৫০/-
৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুঈন কন্যা	৭১/-
৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৩৬০-৩৬৭ কমান্ডো মিশন+সহযোদ্ধা	৬৬/-
৩৬১-৩৬২ শেষ হাসি-১,২ (একত্রে)	৭৪/-
৩৬৩-৩৬৪ স্মাগলার+বন্দি রানা	৫৯/-
৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন	৫৪/-
৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+অমানুষ	৭৯/-
৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
৩৭৫-৩৭৭ সর্পলতা+অখণ্ড অবসর	৭৮/-
৩৭৮-৩৭৯ স্নাইপার ১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৮০-৩৮১ ক্যাসিনো আন্দামান+জলরাক্ষস	৮৯/-
৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+নিখোঁজ	৮১/-
৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে)	৭৮/-
৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বুশ পাইলট	৬৭/-
৩৯০-৩৯১ অচেনা বন্দর ১,২ (একত্রে)	৮৪/-
৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা	৬৪/-
৩৯৩-৩৯৪ অন্তর্ধান ১,২ (একত্রে)	৭০/-
৩৯৫-৩৯৬ ড্রাগ লর্ড+দ্বীপান্তর	৬৮/-
৩৯৭-৩৯৮ গুপ্ত আততায়ী ১,২ (একত্রে	৮৪/-
৪০০-৪০১ চাই ঐশ্বর্য ১,২ (একত্রে)	৯৪/-
৪০২-৪০৩ স্বর্ণ বিপর্যয় ১,২ (একত্রে)	৭১/-
৪০৪-৪০৫ কিল-মাস্টার+মৃত্যুর টিকেট	৭৪/-

স্বর্ণ বিপর্যয়-১

প্রথম প্রকাশ: ২০১০

এক

তাইওয়ান।

হুয়া-লিয়েন এয়ারফোর্স বেইস। রাত এগারোটা দশ। একটু আগে অজস্র হলুদ বাতি রানওয়ের দু'পাশে জ্বলে উঠেছে।

মসৃণভাবে নেমে এল বোইং-এর ফায়ার এগজেকিউটিভ জেট। ওটার চাকাগুলো রানওয়ে ছুঁতেই ভুশ করে উঠল পোড়া রাবারের ধোঁয়া। আড়াইশো গজ ছুটে থামল প্লেনটা, তারপর ঘুরে টার্মিনাল বিল্ডিঙের দিকে এগোল।

মাথার উপর দিয়ে তীক্ষ্ণ কানফাটা আওয়াজে আকাশটা চিরে দিয়ে ছুটে চলে গেল দুটো টমক্যাট ফোরটিন ফাইটার-বম্বার। এগজেকিউটিভ জেট তাইওয়ানের আকাশ-সীমায় ঢুকতেই পিছু নিয়েছিল ওরা, এখন ফিরে চলল রাজধানী তাইপের দিকে।

ফায়ার এগজেকিউটিভ জেট টার্মিনাল ভবনের সামনে এসে থামল। ওটার দিকে এগিয়ে এল কুচকুচে কালো একটা ক্যাডিলাক। বিমানের পাশে থামল ওটা। তিনজন অফিসার ক্যাডিলাক ছেড়ে নামলেন। তাঁদের পিছু নিয়ে এসেছে দুটো ফোর্ড জিপ, ওগুলো প্লেনের বিশ ফুট কাছে গিয়ে ব্রেক কষল। আটজন সৈন্য লাফিয়ে নামল। সাব-মেশিনগান হাতে প্লেনটাকে ঘিরে পজিশন নিল তারা, ককপিটের দিকে অস্ত্র তাক করা।

এইমাত্র এগজেকিউটিভ জেট নিয়ে পৌঁচেছেন মধ্যপ্রাচ্যের একটি রাষ্ট্রের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তাঁরা তাইওয়ানে এসেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সরকারি কাজে।

প্লেনের ইঞ্জিন বন্ধ করা হয়েছে। যাত্রীদের দরজায় একটা চিড় দেখা গেল। সাদা কংক্রিটে হলুদ আলোর সরু রেখা পড়ল। দরজার দুপাশে অবস্থান নেওয়া দুই সেন্ট্রি সাব-মেশিনগান উঁচিয়ে তাকিয়ে থাকল—সবার আগে দেখতে চায় কী ঘটে।

ধীরে ধীরে নেমে এসে নীচের কংক্রিট স্পর্শ করল ডোর-লেডার। সিঁড়ির উপরের ধাপে এসে দাঁড়ালেন নিষ্ঠুর চেহারার এক দীর্ঘদেহী, পরনে জলপাই রঙা আর্মি ইউনিফর্ম, মাথায় ক্যাপ। ইনসিগনিয়া বলে দিল, তিনি একজন কর্নেল। দু'আঙুলে পুরু গোঁফে তা দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশটা দেখে নিলেন তিনি। মনে হলো সৈন্যদের দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে খুঁত পেয়েছেন। বিরক্ত চেহারায় নেমে এলেন সাবলীল ভঙ্গিতে।

তাঁর পিছু নিয়ে এলেন আরও দু'জন। এঁদের একজনের মাথায় মৌলভীদের গোল টুপি, গায়ে র‍্যাবাইদের জোব্বা। প্রকাণ্ড মানুষ তিনি, কুচকুচে কালো দাড়িগুলো বুক ছাড়িয়ে নাভির কাছে চলে এসেছে। তৃতীয় লোকটির পরনে দামি

কমপ্লিট সুট। সুদর্শন, ক্লিন শেভ্ড্।

আর্মির তিন অফিসার কর্ডনের মধ্য দিয়ে ডেলিগেটদের দিকে এগিয়ে এলেন। মুখোমুখি হয়ে উচ্চপদস্থ অফিসারটি তাইওয়ানিজ ভাষায় অতিথিদের উদ্দেশ্যে কিছু বললেন, তারপর বাঁ পাশের অফিসারের জন্য একটু অপেক্ষা করলেন।

দ্বিতীয় অফিসার দোভাষী, তিনি ইদ্দিশে তাঁর বসের বক্তব্য জানালেন: 'কর্নেল পেরন, আপনাদেরকে স্বাগত জানাতে পেরে জেনারেল হো পিয়েং অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি জানতে চান দীর্ঘ যাত্রায় শারীরিক কোনও অসুবিধা আপনাদের হয়েছে কি না।'

ইজরায়েলি স্ট্র্যাটেজিক মিসাইল ফোর্সেস-এর ডেপুটি ডিরেক্টর কর্নেল হাউয়াজি পেরন বললেন, 'জেনারেল পিয়েং নিজে কষ্ট করে এসেছেন বলে ধন্যবাদ। না, পথে কোনও সমস্যা হয়নি।'

জেনারেল হো পিয়েং দোভাষীর বক্তব্য শুনে মাথা দোলালেন। তাঁকে বড় একটা হাঁ করতে দেখে হাউয়াজি তাড়াতাড়ি করে জানালেন, 'আমাদের মাতৃভাষায় আপনাদের দখল আছে, সেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, তবে ইংরেজিতে আলাপ করলে বোধহয় দু'পক্ষেরই সুবিধে হবে। আমি শুনেছি জেনারেল পিয়েং চমৎকার ইংরেজি বলতে পারেন।'

দোভাষীর কথা শেষ হতেই বারকয়েক চোখ পিটপিট করলেন জেনারেল, তারপর অশুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজিতে বললেন, 'কর্নেল, আমি ইংরেজি ভাষা অনেক ইংরেজের চেয়ে ভাল জানি। ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন, স্প্যানিশ আর ইতালিয়ানোয়েও আমার দখল আছে।'

'অত্যন্ত আনন্দের কথা। অবশ্য ওগুলো আমিও জানি,' দ্রুত বললেন হাউয়াজি। বোঝা গেল ডেলিগেটদের নিয়ম অনুযায়ী কথায় হারতে রাজি নন তিনি। বিশেষ করে যখন কারও কাছে মাথা নত করতে হবে না।

জেনারেল পিয়েং হাসি হাসি চেহারা করলেন, তবে মুখ কালো হয়ে গেল। অন্য কেউ ওঁর সমান হয়ে যাবে তা মানতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। বললেন, 'নিশ্চয়ই আপনি সরকারি কাজে বিভিন্ন দেশে গেছেন?'

'বহুবার, জেনারেল।'

'আমিও,' বললেন জেনারেল। 'বিশেষ করে বারবার চায়নায় গেছি। ওরা আমাদের ভয় পায়। ওরা জানে বেশি বাড়াবাড়ি করলে ওদের কী সর্বনাশ হবে।'

'তা তো বটেই,' মুখে বললেন কর্নেল হাউয়াজি; মনে মনে বললেন: সারা দুনিয়া জানে, খুঁটির জোরে পাঁঠা কোঁদে, তোমরাও মাটিতে ক্ষুর দাপাও মার্কিন খুঁটির জোরে।

'আপনাদের জন্যে ট্র্যান্সপোর্টেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে,' বললেন পিয়েং। 'ইস্ট কোস্ট-এর নান-আও নেভাল বেইস-এ যাব আমরা। ...আপনাদের পাইলটরা হুয়া-লিয়েন এয়ারফোর্স বেইস-এই অফিসার্স মেসে থাকতে পারবে।'

'আমন্ত্রণের জন্যে ধন্যবাদ,' বললেন হাউয়াজি, গোঁফে আলতো করে তা দিলেন। 'পাইলটদের উপর ফিরে যাবার নির্দেশ আছে। আসার সময় তাদের

একজন ঘুমিয়েছে, এখন আপনারা রিফুয়েলিঙের ব্যবস্থা করলে উপকৃত হব।'

জেনারেল শ্রাগ করলেন। 'বেশ, আপনি যা বলেন।' ঘাড় ফিরিয়ে অধস্তন অফিসারকে নির্দেশ দিলেন। সে আবার নির্দেশ দিল সিকিউরিটি ডিটেইলের-এর হেডকে। লোকটা অকিটকি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ততক্ষণে কর্নেল পেরনের দাড়িওয়ালা সঙ্গী তাঁর ব্যাগেজ নামিয়ে ফেলেছেন। দূরে একটা ফিউল ট্যাঙ্কার দেখা গেল। ট্রাকটা প্লেনের পাশে এসে থামল। কর্মীরা হোস পাইপের রোল খুলতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

জেনারেলের চোখে অন্তহীন চোখ রাখলেন কর্নেল। 'আমাদের টেকনিক্যাল এক্সপার্ট আর্নেস্ট ফ্রয়েশম্যান জাহাজের সঙ্গে যাবেন না, ফিরবেন পাইলটদের সঙ্গে। তিনি রওনা হওয়ার আগে পিস-কিপারগুলো পরীক্ষা করবেন। লঞ্চারগুলোও দেখবেন।'

কমপ্লিট সুট আস্তে মাথা দোলালেন।

জেনারেল পিয়েঙের চেহারায় কোনও ছাপ পড়ল না, তবে বোঝা গেল তিনি চান না ইজরায়েলি জাহাজ নিয়ে ওখানে দেরি করা হোক। বললেন, 'আপনারা তো সাগরে গিয়ে যত খুশি পরীক্ষা করতে পারবেন।' আবারও বললেন, 'চিন্তা করবেন না, ওগুলো আপনাদের জাহাজে তুলে দেয়া হবে।'

হাউয়াজি মাথা নাড়লেন। 'ফ্রয়েশম্যান জাহাজে উঠলে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন কেবিন ছেড়ে বেরোতে পারে না। কাজেই ও বিমানে ফিরবে। মিসাইলগুলো এখনই দেখতে চায়।'

জেনারেল পিয়েং ঠাণ্ডা স্বরে বললেন, 'ভাবতে অবাক লাগছে যে সাগর-পথে মিসাইল যাবে, অথচ সঙ্গে এক্সপার্ট থাকবে না! জানতে ইচ্ছে করে এরকম এক অসুস্থ লোককে কেন পাঠানো হলো।'

কর্নেল পেরনের চোখের কোণ কুঁচকে গেল। ইজরায়েল দু'হাজার ছয়শো মিলিয়ন ডলার খরচ করছে, টাকাগুলো যাচ্ছে আমেরিকার পেটে। মিসাইল ও বোমাগুলো ইজরায়েল ঠিকমত বুঝে নেবে না? এই তাইওয়ানি জেনারেলের কোনও প্রশ্ন তোলার অধিকার নেই। আড়ষ্ট স্বরে বললেন পেরন, 'ও মিসাইল চেনে বলেই ওকে পাঠানো হয়েছে, জেনারেল। ওর ব্যাপারে আপনার চিন্তা না করলেও চলবে। মিসাইলগুলো পরীক্ষা করতে পাঠানো হয়েছে ওকে। ইজরায়েলি জাহাজ সকালে ছাড়া হবে।'

স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, ইজরায়েলি ডেলিগেশন বিদায় হওয়া পর্যন্ত তাঁকে ওদের সঙ্গে থাকতে হবে। জেনারেল ঠিক করলেন, তাঁর স্ত্রীকে ফোন করে বলে দেবেন, কাল বিকেলের আগে তাইপে-তে ফিরতে পারছেন না। আফসোস করে ভাবলেন, আজ রাতে নতুন রক্ষিতা ওঁকে পেল না। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, মাঝে মাঝে দেশের জন্য এমন ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়। বললেন, 'বেশ, কর্নেল, হার্বার মাস্টারকে জানিয়ে দেব আপনারা সকালে বন্দর ছাড়বেন। চলুন, মিস্টার ফ্রয়েশম্যান আপনাদের নতুন খেলনা দেখুন।'

জেনারেলের পিছু নিয়ে ক্যাডিলাকে উঠল তিন ইজরায়েলি। জেনারেলের সঙ্গীরা জিপে চড়ে চলে গেলেন।

ক্যাডিলাকের ভিতরে সিগারেটের কটু গন্ধ। জেনারেল পিয়েং আরাম করে বসলেন, সিগারেটের প্যাকেট বের করে কর্নেল পেরনকে একটা সিগারেট অফার করলেন।

মাথা নাড়লেন কর্নেল। 'থ্যাঙ্ক ইউ, খাই না।'

অন্য দু'জনের দিকে তাকালেন জেনারেল। 'আপনারা?'

'নো, থ্যাঙ্কস,' মাথা নাড়লেন তাঁরা।

জেনারেলের ভাব দেখে মনে হলো তাঁর যখন সমস্যা হচ্ছে না, তখন আর কারও সমস্যা হতেই পারে না—সিগারেট ধরিয়ে ভুসভুস করে ধোঁয়া ছাড়লেন। ড্রাইভারকে আদেশ দিলেন, 'নান-আও নেভাল বেইস।'

ক্যাডিলাক টার্মিনাল ছেড়ে বেরিয়ে হুয়া লিয়েন-পেইপি হাইওয়েতে পড়ল। পনেরো মিনিট পর গাড়িটা বামে তারোকো ন্যাশনাল পার্ক রেখে প্রশান্ত মহাসাগরের পাশ দিয়ে ছুটে চলল। আকাশে বড়সড় চাঁদ উঠেছে, কালো ঢেউগুলোর মাথায় আলোর ঝিলিমিলি।

জেনারেল পিয়েং কয়েকবার আলাপ জমাতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না। ভাবলেন, ব্যাটা গোমরামুখো বেরসিক, থাক প্রেমিকার চিন্তায় বিভোর হয়ে।

একঘণ্টা পর নান-আও নেভাল বেজের পেরিমিটার ফেন্স দেখা গেল। ক্যাডিলাক ডানপাশের মাঝারি একটা পথে এগোল। পাঁচ মিনিট পর থামতে হলো। গার্ডরা গাড়ির নক্ষত্র-ভরা পতাকা দেখে খটাস্ করে স্যালিউট জানাল, হুড়োহুড়ি করে গেট খুলে দিল। গাড়িটা বেইসে ঢুকল।

দু'পাশে বেশ কিছু বড় বড় মেইনটেনেন্স বিল্ডিং পড়ল, তারপর আধ কিলোমিটার পর্যন্ত একটার পর একটা জেটি। নোঙর ফেলেছে চারটে প্যাট্রল বোট আর একটা লঞ্চ। একটু দূরে একটা ডেস্ট্রয়ার—ওটার চিমনি দিয়ে সাদা ধোঁয়ার ফিতে উঠছে আকাশে।

জেনারেলের নির্দেশে বড় একটা ডেরিক পাশ কাটাল ড্রাইভার, চারশো ফুটি একটা কার্গো জাহাজের পাশে থামল।

ড্রাইভার দরজা খুলে সরে দাঁড়াল। জেনারেল পিছলে বেরিয়ে যাবেন, এমনি সময়ে কর্নেল পেরন তাঁর ইউনিফর্মের হাতায় টান দিলেন। ঘাড় ফেরালেন জেনারেল। পেরন নরম স্বরে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, জেনারেল।'

আন্তরিক হাসলেন জেনারেল পিয়েং। পরস্পরকে সন্দেহ করেন তাঁরা, কিন্তু এই মুহূর্তে কর্নেলকে খুব বেশি অপছন্দ হলো না তাঁর। তাঁরা এমন দুটো রাষ্ট্রের নাগরিক, যারা আমেরিকার সাহায্য না পেলে ধুলোয় মিশে যাবে। আমেরিকা এশিয়ায় নিজের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে তাদের ব্যবহার করছে। তাতে কী? জেনারেলের হাসিটা আরও চওড়া হলো। 'ইট ইজ নাথিং, কর্নেল।'

কর্নেল পেরন ঘড়ি দেখলেন। রাত সোয়া বারোটা। 'আমরা কখন আপনাদের জাহাজে উঠছি, জেনারেল?'

একটু দূরের জাহাজটা দেখিয়ে দিলেন জেনারেল পিয়েং। 'এটাই দি আফ্রিকান স্টার। জিনিস এটাতে এসেছে।'

'এদিকের জোয়ার-ভাটা কেমন?' জানতে চাইলেন কর্নেল।

শ্রাগ করলেন পিয়েং। 'নান-আওয়ে জোয়ার-ভাটা খুব মৃদু, আপনাদের জাহাজ এলেই মাল তুলে দেয়া হবে। নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন, আপনাদের জিনিস ঠিক আছে।'

পথ দেখালেন তিনি। চারজনের দলটি দি আফ্রিকান স্টার-এ গিয়ে উঠল।

ইজরায়েলি ডেলিগেটদেরকে তিনটে কেবিন দেখিয়ে দেয়া হলো। টয়লেট থেকে হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিলেন সবাই।

পাঁচ মিনিট পর তাঁরা কর্নেল পেরনের কেবিনে জড় হলেন। আর্নেস্ট ফ্রয়েশম্যান বাঙ্কে বসে ব্রিফকেসটা পাশে রাখলেন। কেবিনে একটা মাত্র পোর্টহোল, ওটার নীচে ছোট একটা ডেস্ক, কর্নেল পেরন ওখানে বসলেন। প্রফেসর সিমন কাউচ একটা বাল্কহেডে ঠেস দিয়ে বুকে হাত বাঁধলেন, ফুঁ দিলেন দাড়িতে। এবার কর্নেল অদ্ভুত একটা কাজ করলেন—দু'আঙুলে চোখ দুটো ছুঁয়ে মাথা নাড়লেন, তারপর কান ছুঁয়ে হ্যাঁ-সূচক ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন। কেবিনের ছাদে সস্তা ব্র্যাস-এর লাইট ফিক্সচার দেখালেন তিনি, ডেস্কের উপরে লাগানো ল্যাম্পটাও।

এবার জানতে চাইলেন, 'ইন্সপেকশন শেষ করতে কতক্ষণ লাগবে তোমার, ফ্রয়েশম্যান?'

সুট-জ্যাকেটের পকেট হাতড়ালেন ফ্রয়েশম্যান, খুদে টেপ-রেকর্ডারটা বের করে প্লে বাটন টিপলেন। একটা স্বর কথা বলে উঠল। গলার আওয়াজটা আসলে কর্নেল পেরনের, তবে ডিজিটালি বদলে নেওয়া হয়েছে। ইদ্দিশ ভাষায় বলে উঠলেন, 'বড় জোর দু'ঘণ্টা, কর্নেল, তার বেশি না। মিসাইলের কাভার খুলতে একটু সময় লাগে, তবে সার্কিট দেখতে সময় লাগে না।'

কর্নেল ইতিমধ্যে তাঁর মিনি রেকর্ডার বের করে ফেলেছেন। ফ্রয়েশম্যানের বক্তব্য শেষ হতেই প্লে বাটন টিপলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য শুরু হলো।

টেপ চলছে, চুপ করে অপেক্ষা করলেন তাঁরা। তারপর প্রফেসর সিমন কাউচ নিজের সময় আসতেই তাঁর টেপ-রেকর্ডার চালু করলেন। এই কথাগুলোও আসলে কর্নেলেরই। বুঝবার উপায় নেই যে তিনি নিজেই নাটকের একমাত্র চরিত্র।

মিসাইল নিয়ে তিনজনের আলাপ চলছে।

এবার ইজরায়েলিরা কেবিনের এক কোনায় চলে গেলেন।

বিসিআই-এর চিফ অ্যাডমিনিস্টেটর সোহেল আহমেদ ফিসফিস করে বলল, 'তুই ঠিকই বলেছিস, দুটো ছারপোকা। তাইওয়ানিজরা যথেষ্ট বিশ্বাস করছে আমাদের।'

রানা আলতো করে গোঁফটা খুলে ফেলল। ওটা একবার দেখে নিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'আরেকটু হলে ফিনিশ হয়ে গেছিলাম!' সোহেলকে তাকাতে দেখে বলল, 'মোফিজ বিল্লাহ্ বলেছিল দারুণ আঠা বানিয়েছে, ছোকরা এটা বলেনি যে হঠাৎ করে আমাদের গোঁফ খসে পড়বে!' গ্লু-র কৌটা বের করে গোঁফে আঠা লাগিয়ে নিল ও, সাবধানে আবার লাগাল ঠোঁটের উপর। 'আর কখনও ছোকরার গোঁফে বিশ্বাস করা যাবে না।'

সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট আতাসির ভ্রূ কুঁচকে গেল। 'অনেকক্ষণ ধরে থুতনি চুলকাচ্ছে, বস্! ভাল করেছি দাড়িটা টাচ না করে। ওগুলো খসে পড়লে তো মহা বিপদ ঘটে যেত!'

দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস অত্যাধুনিক জাহাজ, সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট আতাসিকে ওটার সিকিউরিটি ও সারভেইলান্স ডিরেক্টর পদ দেয়া হয়েছে।

পঁচিশ দিন আগে জাহাজটা হাতে পেয়েছে ওরা, তার পরদিনই বিরাট একটা অপারেশনে নেমেছে সবাই মিলে। বেশ কয়েকটা দেশের সেরা কমাণ্ডো ও স্পাই নিয়ে একটা দল গঠন করা হয়েছে। এসেছে চিনের লিউ ফু-চুং, ভারতের অনিল চ্যাটার্জি। আরও অনেকে। নেতৃত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশের মাসুদ রানা।

'জাহাজে ফিরে বিল্লাহ্‌কে কষে ধাতানি দেব,' বলল সোহেল। 'ছোকরা ওর জাদুর দোকানে এসব কী বানাচ্ছে!' সোহেল ক্রুদের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে। রানার দিকে তাকাল ও। 'তোর কি মনে হয়, আরও দেরি করা উচিত?'

বাংলাদেশ নেভির লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার আলতাফ নাদ্‌ভী কিছুক্ষণ পর প্লেন নিয়ে উড়ে যাবে। ও আন্দাজ দশ ঘণ্টা পর আফগানিস্তানের গারদিজে এক নির্জন উপত্যকায় নামবে, চটপট সরে পড়বে। আমেরিকানরা তাদের ইহুদি বন্ধুদের খুঁজে বের করুক।

রানা বলল, 'না। আলতাফ কিছুক্ষণ পর রওনা হবে। এদিকে উর্বশী চারদিন সময় পেয়েছে, এরমধ্যে যদি বন্দরে ঢুকতে না পারে, তা হলে ধরে নিতে হবে আর আসছে না ও।'

'তাইওয়ানিজ নেভি কখনও কোনও সাবমারসিবল ধরতে পেরেছে বলে জানি না আমরা,' বলল সোহেল। 'কাজেই ধরে নেয়া যায় ও আসবে।'

মনে হলো নিজের নকল দাড়িকে শোনাল আতাসি, 'আমরা এখন আর পিছাব না।' রানার দিকে তাকাল, 'চকলেট জায়গা মত রেখে দৌড়?'

মাথা দোলাল রানা, 'যত দ্রুত সম্ভব।'

উর্বশী দাশা ওদের সরিয়ে নিতে পনেরো মিনিট সময় পাবে। ও ইন্দোনেশিয়ান নেভাল ইন্টেলিজেন্সের লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার। ওদের নেভাল ইন্টেলিজেন্স ওকে দুটো অ্যাসাইনমেন্ট দান করেছে।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে থাকল ওরা, তারপর আতাসি বিড়বিড় করে বলল, 'আমেরিকা আর ইজরায়েল পোঁদে লাথি খেয়ে হজম করবে, মাঝখানে তাইওয়ান চ্যালামি করে ডুবল।'

ইজরায়েল সরকার মিসাইলগুলো অত্যন্ত জরুরি কাজে কিনেছে। ওগুলো সোমালিয়ার ব্যান্দারবেয়লায় নিয়ে যাবে। উপকূলে তাদের দুটো টিম অপেক্ষা করছে। তারা মিসাইলগুলো বুঝে নেবে। তেল-আবিব নির্দেশ দিলে ওখান থেকেই মিসাইল লঞ্চ করা হবে। মধ্যপ্রাচ্যের সকল সমস্যা একদিনে সমাধান করতে চলেছে ওরা: মক্কা, মদিনা, রিয়াদ, কায়রো, ত্রিপোলি, দামাস্কাস, বাগদাদ, তেহরান, দুবাই-এ একইসঙ্গে পারমাণবিক বোমার হামলা চালানো হবে।

ইজরায়েলিরা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে শত্রুর শেষ রাখতে নেই, এইভাবেই বৈরী মুসলিম দেশগুলোর সমস্ত বিরোধিতার সমাপ্তি টানা সম্ভব। আমেরিকান

সরকার মোসাদ-এর পরিকল্পনায় সায় জানিয়েছে, তাদের শুধু ছোট্ট একটু আবদার আছে—শেষ বোমাটা খরচ করতে হবে মোগাদিশুতে। ওরা ভুলে যায়নি, সোমালিয়ায় বেমক্কা মার হজম করতে হয়েছে ওদের। মিসাইলের দামটা অবশ্য যাবে ইজরায়েলের পকেট থেকে। আমেরিকার ভূমিকা হবে ধোয়া তুলসিপাতা। আসলে সিআইএ মোসাদ-এর এই পরিকল্পনা নিখুঁত না করে দিলে তারা এতবড় কাজে নামতে পারত না।

এই ঘটনা প্রথমে টের পায় লেবানন সিক্রেট সার্ভিস। তারা জানায় অন্যদের। এরফলে মিড্ল্ ইস্টের সিক্রেট সার্ভিসগুলো ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পরদিনই লেবানন সিক্রেট সার্ভিসের জেনারেল আরাবী মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানকে রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণ পাঠান।

সিক্রেট সার্ভিস-এর চিফরা এককথায় স্বীকার করেন, মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান তাঁদের সত্যিকার বন্ধু। তাঁরা জানেন, এখন আর তাঁর মত সামরিক বিশেষজ্ঞ পাওয়া যায় না। যুদ্ধ পরিকল্পনায় তাঁর ক্রিয়েটিভ ব্রেনের তুলনা হয় না। মিটিঙে সবার অনুরোধে রাহাত খান প্রতি-আক্রমণ পরিকল্পনাটা তৈরি করেন। এরপর জেনারেল আরাবী সবার পক্ষ হয়ে মাসুদ রানাকে চেয়ে বসেন। বিসিআই-এর চিফ এই অনুরোধ ফেলতে পারেননি।

রাহাত খানের উর্বর মস্তিষ্ক তৈরি করেছে এই 'দ্য ট্রায়ো অপারেশন্স'। এতে তিনি তিনটে পর্যায় রেখেছেন।

প্রথম কাজ ছিল কাবুল ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ঢুকে ইজরায়েলিদের বন্দি করে প্লেন নিয়ে উড়ে যাওয়া। কাজটা সহজেই করা গেছে। এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ কোনও সন্দেহ করেনি। পারমিশান চাইতেই বলে দিয়েছে রানওয়ে ক্লিয়ার করা হচ্ছে।

অপারেশনের দ্বিতীয় কাজ ছিল তাইওয়ানের নান-আও নেভাল বেইস-এ ঢুকে দি আফ্রিকান স্টার-এ ওঠা।

এখন তৃতীয় কাজ পারমাণবিক মিসাইলগুলো ধ্বংস করে বন্দর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া।

উর্বশী দাশা নিশ্চয়ই সাবমারসিবল নিয়ে বন্দরে ঢুকেছে। মাত্র একবার ভেসে উঠবে ও—রানা, সোহেল ও আতাসিকে তুলে নেবে, তারপর খোলা সাগরে বেরিয়ে যাবে।

দেশগুলো নিজেদের জন্য আন্তর্জাতিক পানি-সীমা ঠিক করেছে বারো মাইল। কিন্তু ঝুঁকি নেয়নি রানা, দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস ওদের জন্য বিশ মাইল দূরে অপেক্ষা করছে।

টেপ রেকর্ডারের কথা শেষ হয়ে আসছে। যে-কোনও মুহূর্তে তাইওয়ানিজ সিকিউরিটি অ্যাণ্ড সিক্রেট সার্ভিস এজেন্সির লোকজন চলে আসবে। ওরা যার যার জায়গায় ফিরে এল। সোহেল ডানহাতে ব্রিফকেস খুলল। খুদে দুটো তাওরাত বের করে রানা ও আতাসিকে দিল। নিজে ডুবে গেল পিস-কিপার মিসাইলের স্পেক শিট-এ।

দুই

তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকারটা জুডি স্টিভেনসনের ঘুম ভাঙিয়ে দিল। এবং, বাঁচিয়ে দিল ওকে।

রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির রিসার্চ ভেসেল অ্যাভালাঞ্চ-এ জুডি ছাড়া আর কোনও মেয়ে নেই। গতকাল ওর একমাত্র সঙ্গিনীর অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের ব্যথা উঠেছিল। তাকে জাপানের একটা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। জুডির বেঁচে যাওয়ার আরেকটা বড় কারণ, কেবিনে ও ছাড়া আর কেউ নেই।

সঙ্গিনীর মত জুডি একগাদা পোশাক ও মেকআপ কিট নিয়ে আসেনি, টুকটাক দরকারি মেয়েলি জিনিস এনেছে—আর আছে বেডিং, সাতদিন চলার মতো জিন্স ও রাগবি শার্ট। কেবিনটা প্রায় খালিই বলা চলে।

কেবিনের সামনের প্যাসেজে পুরুষ কণ্ঠ শুনতে পেল জুডি, অদ্ভুত শব্দে কাতরাচ্ছে; যেন মৃত্যু যন্ত্রণার আক্ষেপ। গোঙানির আওয়াজটা পুরোপুরি জাগিয়ে দিল ওকে। চট করে বুঝে ফেলল ওটা কীসের শব্দ, এবং কী করতে হবে ওকে। বাইরে চেঁচামেচি হচ্ছে—মানুষ মরছে, গোলাগুলি চলছে। কানে এলো আরও কয়েকজনের অন্তিম-চিৎকার।

একমাস হলো এমভি অ্যাভালাঞ্চ জাপান সাগরে ঘুরছে। রিসার্চাররা অনেকদিন ধরে এ-সাগরের রহস্যময় স্রোতগুলোকে বুঝতে চাইছেন।

রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটি জাহাজের সবাইকে সাবধান করেছে, জাপান সাগরে জলদস্যুদের অত্যাচার বেড়ে গেছে। গত পাঁচ সপ্তাহে চারটে জাহাজকে আক্রমণ করা হয়েছে। আন্দাজ করা হচ্ছে, জলদস্যুরা লুটপাটের পর জাহাজগুলো ডুবিয়ে দিচ্ছে। অনেক সার্চ করেও কোনও লাইফবোট পাওয়া যায়নি। বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়েছে, দস্যুরা কাউকে বাঁচতে দেয়নি। এরপর গতকাল খবর এসেছে, কাছাকাছি এলাকায় একটা কণ্টেইনার জাহাজ উবে গেছে। আক্রমণ আসতে পারে ভেবে নাবিকরা ব্রিজের আর্মস লকারে দুটো শটগান আর একটা পিস্তল রেখেছে। অস্ত্র মানে এ-ই! কিন্তু জানা কথা, নাবিকরা অ্যাসল্ট রাইফেল আর সাব-মেশিনগানের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না। রিসার্চাররা অকাতরে মারা পড়বেন, কোনও কাজে আসবেন না।

একমুহূর্ত দ্বিধায় ভুগল জুডি। লড়ব, না পালাব? সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলো না, চট্ করে বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল। বেরিয়ে কোথায় যাবে ও? কী করবে? দস্যুরা প্যাসেজে। আওয়াজ বলে দিল, একটার পর একটা কেবিনে ঢুকছে তারা, কাউকে পেলে নির্দ্বিধায় গুলি করছে। দরজাটা খুললে মরতে হবে। পালানোর পথ নেই। কেবিনে এমন কিছু নেই যেটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

পোর্টহোল দিয়ে পূর্ণিমার স্নিগ্ধ আলো আসছে। পাশের খালি বিছানাটা দেখল জুডি, হঠাৎ করেই একটা বুদ্ধি খেলল—একটানে বিছানার চাদর-কম্বল তুলে নিল

ও, ওগুলো কটের নীচে ভরে রাখল। এরপর লকার খুলে জামা-কাপড়গুলো কটের তলায় রেখে আস্তে করে কেবিনের দরজা খুলে দিল। মনে মনে বলল, প্লিজ, তোমরা ধরে নাও আমি এখানে নেই! কোথাও নেই!

এখন আর বাথরুমে গিয়ে টয়েলেট্রিজ সরানোর সময় নেই। হামাগুড়ি দিয়ে কটের নীচে ঢুকে পড়ল জুডি, এককোনায় সরে গিয়ে কম্বল-চাদর-জামাকাপড় দিয়ে নিজেকে আড়াল করল।

এবার টের পেল, ভয়ে থরথর করে কাঁপছে ও। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল। ডাগর নীল চোখে অশ্রু জমল। ফুঁপিয়ে উঠতে গিয়ে পাথর হয়ে গেল। লাথি দিয়ে খোলা হলো দরজাটা। কেউ একজন কেবিনের ভিতরে ফ্ল্যাশ লাইট তাক করল। ক্যাথির ম্যাট্রেসে গিয়ে পড়ল আলো, তারপর দেখা হলো জুডির কট। এবার খালি লকার দুটোও দেখল সে।

জলদস্যুর পা দুটো দেখা গেল। কালো কমব্যাট বুট, কালো প্যান্ট। বুটের মধ্যে প্যান্টের নীচটা গুঁজে রেখেছে। ঘরে ঢুকল লোকটা, লাথি দিয়ে বাথরুমের দরজা খুলল, কেউ আছে কি না দেখার জন্যে শাওয়ার কার্টেন সরাল। জুডির সাবান-শ্যাম্পু-কণ্ডিশনার খেয়াল করেনি, অথবা ব্যাপারটায় গুরুত্ব দেয়নি। লোকটা চারপাশ আরেকবার দেখে নিয়ে নিশ্চিত হলো কেবিনে কেউ নেই। যাওয়ার পথে দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে গেল।

চুপচাপ পড়ে থাকল জুডি। কাতর স্বরগুলো মিইয়ে গেল, তারপর ধীরে ধীরে থেমে গেল। কয়েকজনের উচ্চ কণ্ঠ দূরে চলে গেল। নীরবে কাঁদল জুডি। জাহাজে ওরা মাত্র তিরিশজন ছিল। তাদের বেশিরভাগই ঘুমাচ্ছিল। এত গভীর রাতে ইঞ্জিনটা অটোমেটিক মোড-এ রাখা হয়। ব্রিজে মাত্র দু'জন নাবিক ছিল। ওর কেবিনটা করিডোরের প্রায় শেষ মাথায়—জুডির মন বলল, এরা সবাইকে মেরে ফেলেছে!

ফুঁপিয়ে উঠল জুডি। অ্যাভালাঞ্চের সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, বন্ধুত্ব হয়েছিল। নিজেকে সাবধান করল ও, এ-নিয়ে আর চিন্তা করবে না, নইলে পাগল হয়ে যাবে। ওকে বাঁচতে হবে। এরা জাহাজ লুট করতে কতক্ষণ লাগাবে? অ্যাভালাঞ্চে তেমন কিছু নেই যে ডাকাতি করবে। দামি ইকুইপমেন্ট আর সায়েন্টিফিক গিয়ারগুলো সবই বড়সড়, চট্ করে চুরি করার জিনিস নয়। আণ্ডার-ওয়াটার প্রোবগুলো দামি, কিন্তু ওগুলো শুধু সায়েন্টিফিক কমিউনিটি ব্যবহার করে। ...কয়েকটা টেলিভিশন আর কম্পিউটার ছাড়া নেয়ার মত আর কিছুই নেই।

চলে যাওয়ার আগে জাহাজটা ভাল করে খুঁজে দেখবে। তাতে অন্তত আধঘণ্টা লাগবে। তারপর? এরা কি অ্যাভালাঞ্চের সি-কক খুলে দেবে? জাহাজ ডুবিয়ে দিলে আর কোনও প্রমাণ থাকবে না। ঘড়ি দেখল জুডি। বারবার করে বলল, আমি ভয় পাব না... ভয় পাব না। রোলেক্স-এর লিউমিনিয়াস কাঁটা আর ফসফোরেসেন্ট বিন্দুগুলোর আলোয় সম্মোহিত হয়ে থাকল ও।

পনেরো মিনিট পর টের পেল, জাহাজের দুলুনি বদলে গেছে। সাগর কি আরও শান্ত হয়ে গেল? অ্যাভালাঞ্চ আগের মত নড়ছে না। যেন ভারী হয়ে গেছে।

ওরা কি সি-কক খুলে দিয়েছে? জাহাজ ডুবিয়ে দেবে? যুক্তি খুঁজল জুডি। এত তাড়াতাড়ি পুরো জাহাজ দেখা হয়ে গেল? সব লুট করা শেষ? ওর অন্তর বলল, এরা ডাকাতি না করেই অ্যাভালাঞ্চকে ডুবিয়ে দেবে!

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে কটের তলা ছেড়ে বেরিয়ে এল ও, দৌড়ে গিয়ে পোর্টহোলে দাঁড়াল। প্রথমে ওর মনে হলো নিচু একটা দ্বীপ দেখেছে, তারপর বুঝতে পারল দূরে ওটা অদ্ভুত একটা প্রকাণ্ড জাহাজ। ওটার সামনে আরেকটা জাহাজ। দুই জাহাজে সংঘর্ষ হবে? না, চাঁদের আলোয় ওরকম লাগছে। অ্যাভালাঞ্চের পিছন দিকে বড়সড় একটা ইনফ্লেটেবল ক্রাফ্‌ট্‌ দেখতে পেল ও। ওটার আউটবোর্ড ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। যান্ত্রিক ভেলাটা সরে গেল জাহাজের গা থেকে, তারপর গতি তুলে মিলিয়ে গেল দূরে। পিশাচগুলো স্বচ্ছন্দে হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছে ভাবতেই রাগে কাঁপতে শুরু করল জুডি।

পোর্টহোলে আর তাকাল না, এক দৌড়ে কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে এল। প্যাসেজওয়ে খালি, কোনও লাশ নেই। ডেকে অজস্র গুলির খোসা। বদ্ধ বাতাসে কী যেন একটা কেমিকেলের জোরাল গন্ধ। দু'পাশের দেয়ালে রক্ত। জোর করে চোখ সরিয়ে নিল জুডি, কেবিনে না ফিরে এগিয়ে চলল। একটা টি-শার্ট ছাড়া শরীরে আর কিছু নেই ওর। খালি পায়ে ধাতব ডেকের শীতল স্পর্শ। একহাতে স্তনগুলো সামলে দৌড়াতে শুরু করল জুডি। প্রথমদিন এসে জাহাজ ঘুরে দেখেছে ও, অ্যাভালাঞ্চের বো-র কাছে যোডিয়াক লাইফ রাফ্‌ট্‌ আছে। ওই রাফটে সারভাইভাল সুট পাওয়া যাবে।

স্টিলের সিঁড়ি বেয়ে মেইন ডেকে উঠে এল ও। সামনে সরু করিডোর। শেষমাথায় দরজা, ওটা পেরলেই বাইরে যাওয়া যাবে। একটা লাশ হ্যাচের সামনে পড়ে আছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল জুডি, ফোঁপাতে ফোঁপাতে এগোল আবার। লাশটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কালচে শার্টে রক্ত আরও গাঢ় দেখাচ্ছে। ডেকে এখনও সচল, তাজা রক্ত।

মানুষটার আকৃতি বলে দিল, সে সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ার। জর্জি হাসিখুশি মানুষ ছিল, মিষ্টি মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে দিয়েছিল, ও রাজি হলে ব্যাপারটা বিয়েতে গড়াবে। ...এত রক্ত! বেঁচে নেই ও! লাশটা স্পর্শ করবার সাহস পেল না জুডি। করিডোরের ঠাণ্ডা দেয়ালে সেঁটে গেল ও, তারপর পায়ে পায়ে এগোল।

হলওয়ের শেষে ছোট্ট পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকাল ও। প্রায়ান্ধকার ফোরডেক-এ কেউ নেই। হ্যাচের হ্যাণ্ডেলে চাপ দিল, লেভারটা নড়ল না। গায়ের জোরে দু'হাতে চাপ দিল। আবারও! বোধহয় হ্যাণ্ডেলের মেকানিজম জ্যাম হয়ে গেছে। হ্যাচ খুলছে না!

কয়েকবার শ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত করল জুডি। ভয়ের কিছ নেই। বেরোনোর চারটে পথ আছে। উইঙের দরজাগুলো যদি বন্ধ থাকে? সমস্যা নেই। ব্রিজের জানালার কাঁচ ভেঙে বেরোনো যাবে।

মেইন ডেকের দরজাগুলো খুলবার চেষ্টা করল জুডি। সব বন্ধ। সিঁড়ি ভেঙে ব্রিজের কাছে উঠে এল ও। জানালা ভেঙে বেরোতে হবে। কমাণ্ড ডেকে পৌঁছে হঠাৎ ভয় লাগল ওর। দস্যুরা সবাইকে খুন করেছে, তারপর সি-কক খুলেছে।

কেন? ওরা কি চেয়েছে জাহাজটা সবার জন্য কফিন হোক? সব হ্যাচ বন্ধ কেন? ব্রিজে যাওয়ার হ্যাচও আটকে দিয়েছে?

আস্তে করে ব্রিজের দরজার নবটা ধরল জুডি। ওর দীর্ঘ আঙুলগুলো কাঁপতে শুরু করল। আস্তে করে নব ঘোরাল। ঘুরছে!

নব ঘুরিয়ে এগোতে চাইল ও, নিরেট ইস্পাতের দরজাটা নড়ল না। সুপারস্ট্রাকচারে এমন কোনও বড় পোর্টহোল নেই যেখান দিয়ে বেরোনো যায়। জুডি মরণ-ফাঁদে আটকে ডুকরে কেঁদে উঠল। পাগলের মত দরজায় থাবা দিল, বারংবার চেঁচিয়ে সাহায্য চাইল।

অনেকক্ষণ পর ব্যথা পেয়ে থামল, ওর দু'হাতে কালসিটে পড়ে গেছে। দরজার সামনে বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে শুরু করল।

হঠাৎ অ্যাভালাঞ্চ দুলে উঠল। বাতিগুলো নিভু নিভু হয়ে আবারও দপ করে জ্বলল। নীচের কোনও কম্পার্টমেন্টে পানি ঢুকেছে। জাহাজটা আরেকবার নড়ে উঠতেই আঁৎকে উঠল জুডি, বিড়বিড় করে বলল, 'ঈশ্বর!'

অ্যাভালাঞ্চের সি-কক আটকাতে পারলে হাতে সময় পাবে ও। চিন্তা-ভাবনা করলে নিশ্চয়ই কোনও না কোনও পথ বেরিয়ে যাবে। মনে পড়ল, ওয়ার্কশপে কাটিং টর্চ থাকবে। ওটা খুঁজে পেলেই... হ্যাচের লক কাটতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

ফিরতি পথে দৌড়াতে শুরু করল জুডি। মেইন ডেকে নেমে এসে ক্রু কোয়ার্টার্স পেরোল, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ইঞ্জিনিয়ার্স স্পেসে। মুখে শীতল বাতাসের স্পর্শ পেল। ওকে কাঁপিয়ে দিল প্লাবনের আওয়াজ। জাহাজে হড়-হড় করে পানি ঢুকছে!

জুডি ছোট একটা অ্যান্টিচেম্বারে আছে, সামনেই সিঙ্গেল ওয়াটার টাইট ডোর। ধাতব দরজাটা খুললেই ইঞ্জিন-রুম। লেভারে হাত রাখল। ডিজেল ইঞ্জিনের গরমে হ্যাণ্ডেলটা এখনও তপ্ত। দরজার নীচের দিকে হাত রাখল। বরফের মত ঠাণ্ডা। আগে কখনও ইঞ্জিন-রুমে আসেনি জুডি, লেআউট দেখেনি, কিন্তু আজ ঢুকতে হবে। যদি সি-কক বন্ধ করা যায়...

বিড়বিড় করে বলল জুডি, 'আর দেরি করব না আমি।' ল্যাচে মোচড় দিল ও। দরজাটা খুলতেই গোড়ালি-সমান পানির স্রোত ঢুকল অ্যান্টিচেম্বারে। বরফের মত ঠাণ্ডা! কয়েক সেকেণ্ডেই জুডির হাঁটু ডুবে গেল। দ্রুত বাড়ছে পানি। ইঞ্জিন-রুম এখনও আলোকিত। ইঞ্জিনগুলো অর্ধেক ডুবে গেছে। সাগরের পানি জেনারেটারের গায়ে আলতো চাপড় মারছে।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল জুডি, পাঁচ ধাপ নামবার পর মেঝে পেল। বুক পানিতে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখে নিল। তাপমাত্রা পঁয়ষট্টি ডিগ্রির নীচে হবে না, কিন্তু শীতে থরথর করে কাঁপল। ইঞ্জিন-রুমটা প্রকাণ্ড একটা গুহার মত। জুডি অর্ধেক হাঁটা আর অর্ধেক সাঁতারের ভঙ্গিতে এগোল। কী করবে ভেবে বের করেনি এখনও, তবে জাহাজের সি-কক বন্ধ করতে হবে।

পানির গভীরতা বাড়ছে। স্রোতের টানে দাঁড়ানো গেল না। এক ঢোক পানি গিলে ফেলল ও, তাড়াতাড়ি সাঁতরে ভেসে উঠল। বুঝে গেল, এখানে ওর কিছু

করবার নেই। সি-ককগুলো কীভাবে অপারেট করে? জানে না ও। এখন আর জানবার উপায় নেই।

বাতিগুলো নিভে গেল। বুকের ভিতরে ধক্ করে উঠল জুডির। তারপর বাতি আবারও জ্বলে উঠল, তবে আগের চেয়ে অনেক অনুজ্জ্বল। ওটা যেন কোনও সঙ্কেত, ওকে বলে দিল, এবার তুমি চলে যাও!

বাতি নিভে গেলে এই গুহা ছেড়ে বেরোতে পারবে না ও। ফিরতি পথে সাঁতার কাটতে শুরু করল জুডি, দু'মিনিট পর সিঁড়ির রেলিঙের কাছে পৌঁছে গেল। রেইলিং ডুবে গেছে। সাঁতার কেটে অ্যাণ্টিচেম্বারে চলে এল। এখানেও কোমর পানি!

দরজাটা বন্ধ করতে সমস্ত শক্তি ব্যয় করল ও। মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল, অ্যাভালাঞ্চ যেন না ডোবে। ঈশ্বর, আর কোনও জাহাজ যেন দেখতে পায় ওদের ডুবন্ত জাহাজটা!

ওয়ার্কশপে আর যাওয়া হলো না। পানিতে ডুবে গেছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে সেকেণ্ড ডেকে উঠে এল ও, প্রায় দৌড়ে ঢুকে পড়ল ওর কেবিনে। তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছে পোশাক পাল্টে নিল। আবহাওয়া হঠাৎ করেই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ভারী সোয়েটার পরল। বাথরুমের আয়নায় দেখল ঠোঁটের কোণে রক্ত গড়াচ্ছে। ইঞ্জিন-রুমে ঠোঁট কেটেছে। নিজেকে দেখল। সাগর-নীল চোখে ফাঁকা চাহনি। ফ্যাকাসে চেহারাটা দেখে মনে হচ্ছে একটু পরেই ওকে ফাঁসি দেয়া হবে। বিড়বিড় করে বলল, 'কিছুতেই সাহস হারাবো না আমি! কিছুতেই না!'

আয়না ছেড়ে পোর্টহোলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। পূর্ণিমার চাঁদটা আর দেখা গেল না। আকাশটা মনে হচ্ছে গাঢ় অন্ধকার। পাইরেটদের বোটটা দেখা যাচ্ছে না আর। অনেক দূরে যে বিশাল জাহাজটা দেখেছিল, সেটাও চলে গেছে। চুপ করে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল জুডি। সরতে পারছে না পোর্টহোলের সামনে থেকে।

গ্রিজ বা তেল মাখলে পোর্টহোলের ভিতর দিয়ে গলে যাওয়া যাবে? মেস হলের পোর্টহোলগুলো আরেকটু বড়। চেষ্টা করলে তো দোষ নেই। ঘুরে দাঁড়াতে গেল জুডি, কিন্তু বাইরে কালো কী যেন দেখতে পেল। মনোযোগ দিয়ে দেখতে চেষ্টা করল।

অ্যাভালাঞ্চের দশ ফুট দূরে ওটা কী? কোনও নৌকা? কোনও পাখি? পরিষ্কার বোঝা গেল না, কিন্তু মনে হলো ওটা কোনও উড়ন্ত পাখি!

জিনিসটা দ্রুত ভেসে এল, তারপর পুরো পোর্টহোল দখল করে নিল। জুডি আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে পিছাল—ওটা একটা বিরাট ধূসর মাছ! হলুদ চোখ দিয়ে দেখছে ওকে, বার বার মস্ত হাঁ করে আবার মুখ বন্ধ করছে! কেবিনের আলো ওকে আকর্ষণ করছে। দেখা শেষ, ওটা পাখনা নেড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

জুডি দেখতে পেল না এমভি অ্যাভালাঞ্চের ডেক ভেসে গেছে। বো'র কার্গো হ্যাচে সাগরের ঢেউ খেলছে। কিছুক্ষণ পর ব্রিজটা ডুবে যাবে, ক্রেনও। তারও একটু পরে, শান্ত সাগর অ্যাভালাঞ্চের ফানেল গিলে নেবে, থাকবে না কিছুই!

অ্যাভালাঞ্চ যেখানে রয়েছে, সেখানে জাপান সাগরের গভীরতা প্রায় দুই মাইল। একসময় এমভি অ্যাভালাঞ্চ সাগরের মেঝে স্পর্শ করবে।

তিন

তাইওয়ানিজ সিক্রেট সার্ভিসের দুই এজেন্ট দরজায় টোকা দিয়ে ভিতরে ঢুকল। সামনের লোকটা হাতের ইশারা করল, 'আসুন।'

দ্বিতীয়জন কোটের বোতাম ঠিক করবার ছলে তার ডানহাতটা শোল্ডার হোলস্টারের কাছে রেখেছে।

রানা আর আতাসি পকেটে রেখে দিল তাওরাত। সোহেল পিস-কিপারের স্পেক শিট ব্রিফকেসে রেখে সঙ্গীদের পিছু নিল।

দি আফ্রিকান স্টার একসময় যাত্রীবাহী জাহাজ ছিল, এখন ওটা কন্টেইনার শিপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জাহাজের ভিতরে নতুন রং করা হয়েছে। এ-গলি ও-গলি ঘুরে এগোল ডেলিগেশন। দুই এজেন্ট ছাড়া আর কাউকে দেখা গেল না।

ওরা মেইন ডেকে চলে এল। সামনে হ্যাচওয়ে। প্রথম এজেন্ট একটা হ্যাচ খুলল। ভিতরটা ছোটখাটো একটা ইনডোর স্টেডিয়ামের মত। অন্ধকার। নাকে এল ময়লা পানির দুর্গন্ধ আর পুরনো ধাতুর ঘ্রাণ। সামনের তাইওয়ানি পটাপট সুইচ টিপতে ওভারহেড লাইটগুলো জ্বলে উঠল। ফ্লুওরোসেন্ট আলোয় মোটা প্লাস্টিক শিট মোড়ানো মিসাইলগুলো দেখা গেল। ওগুলো এখন দশটা শহরের মৃত্যু মাথায় নিয়ে যার যার ক্রেডলে শুয়ে আরাম করছে।

ওগুলো মিডিয়াম রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল। মিডল ইস্টের জন্যে এর বেশি কিছু লাগবে না। পিস-কিপার মিসাইল বোইং মার্টিন ম্যারিয়েটার টিআরডাব্লিউ অ্যাণ্ড ডেনভার অ্যায়ারোস্পেসের তৈরি। একেকটার দাম সত্তর মিলিয়ন। দৈর্ঘ্য একাত্তর ফুট ছয় ইঞ্চি। ডায়ামিটার সাত ফুট সাত ইঞ্চি। ওজন পৌনে সাতানব্বই টন। পারমাণবিক বোমা থাকায় ওজন খানিকটা বেড়েছে।

ধাতব সিঁড়ি বেয়ে কার্গো হোল্ডে নেমে এল রানা, সোহেল ও আতাসি। তিনজনের এই ছোট্ট দলে সোহেল মিসাইল এক্সপার্ট হিসেবে ভান করছে, কাজেই গট-গট করে প্রথম মিসাইলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। তাইওয়ানিজ সিক্রেট সার্ভিসের দু'জন হ্যাচওয়ের কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছে, হাতের ইশারায় তাদের ডাকল সোহেল, পরমুহূর্তে ওর গলা দিয়ে বাঘের মত ধমক বেরল: 'অ্যাই যে, ওখানে দাঁড়িয়ে কী হচ্ছে! প্লাস্টিকের শিট সরান!'

লোকগুলো বিরক্ত চেহারায় সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে কাজে লেগে পড়ল।

পাঁচ মিনিট পর জেনারেল পিয়েং এলেন। সোহেল ততক্ষণে সামনের মিসাইলের অ্যাক্সেস প্যানেল খুলে ফেলেছে, সার্কিট টেস্টার দিয়ে সব পরীক্ষা করছে!

রানা আর আতাসির পাশে এসে দাঁড়াল পিয়েং, 'আপনাদের নতুন খেলনা

পছন্দ হয়েছে?'

'চলে,' অনাগ্রহ নিয়ে বলল রানা। 'এই জিনিস আপনারাও একদিন পাবেন।'

আতাসি মনে মনে বলল, আজকেই পাবেন, একটু পরেই!

সোহেল নিজের কাজে ব্যস্ত, প্রফেসর সিমন কাউচ ওরফে আতাসিকে ডাক দিল ও, কী যেন দেখাবে।

আতাসির মত রানাও ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারের জঙ্গল দেখাল সোহেল, কী যেন বলল। ঝুঁকে মনোযোগ দিল ওরা। তারগুলো দেখে নিয়ে নিচু স্বরে আলাপ শুরু হলো। দশ মিনিট পেরিয়ে গেল।

লোকগুলো কথা শেষ করছে না, জেনারেল পিয়েং অস্বস্তিতে পা বদলালেন। আরও কিছুক্ষণ পর বললেন, 'কোনও সমস্যা?'

ঘাড় ফেরাল না রানা, 'না, মনে হচ্ছে ঠিকই আছে।'

তারের জট আর সার্কিট দেখা চলতে থাকল। দেখতে দেখতে আরও পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেল। সোহেল মাঝে মাঝে মিসাইলের প্ল্যানগুলো দেখছে। বাকি দু'জন মূর্তি হয়ে গেছে।

বিরক্তির শেষপ্রান্তে পৌঁছে জেনারেল জানতে চাইল, 'পরীক্ষা করা কী খুবই জরুরি, কর্নেল পেরন?'

ঘুরে দাঁড়ানোর আগে একবার বিপজ্জনক গোঁফজোড়া স্পর্শ করে দেখে নিল রানা, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'দুঃখিত, জেনারেল। ফ্রয়েশম্যান সব দেখে নেবে। তবে মনে হয় প্রথমটা দেখা শেষ হলে অন্যগুলোর দিকে কম মনোযোগ দিলেও চলবে।'

পিয়েং কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলেন। 'আমি কিছু পেপার-ওয়ার্ক সারতে ক্যাপ্টেনের কেবিনে যাচ্ছি, আপনাদের ইন্সপেকশন শেষ হলে আমাকে ওখানেই পাবেন। আমাদের লোক থাকল, দরকার হলে যে-কোনও সাহায্য করবে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, জেনারেল।' মিসাইলের দিকে ফিরল রানা।

জেনারেল চলে গেলেন।

দশ মিনিট পর রানা-সোহেল-আতাসি দ্বিতীয় মিসাইলের পাশে গিয়ে থামল। দুই এজেন্ট সিঁড়ির উপর বসে পড়েছে। তাদের একজন একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করছে। অন্যজন নিষ্পলক চোখে মিসাইল এক্সপার্টদের দেখছে। সুট-জ্যাকেটের বোতাম খুলে রেখেছে ওরা, দরকার পড়লে একটানে পিস্তল বের করবে।

জেনারেল পিয়েং বিরক্ত হয়ে চলে গেলেও এতক্ষণে পরিষ্কার বোঝা গেছে, এরা নড়ার বান্দা নয়।

উর্বশীর সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ে দেখা না হলেও চলবে। সব ঠিক চললে উর্বশী মিনি-সাব নিয়ে জাহাজের স্টার্নের কাছে আসবে, প্যাসিভ সোনার চালু রেখে অপেক্ষা করবে। ওরা পানিতে পড়লেই আওয়াজটা পেয়ে যাবে।

ভোর হতে এখনও আড়াই ঘণ্টা বাকি। মনে মনে আরেকবার হিসাব কষল রানা। হোল্ড ছেড়ে বেরিয়ে মিনিসাব-এ ওঠা, নান-আও নেভাল বেইস ত্যাগ করা... তারপর দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসে গিয়ে ওঠা, এবং ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন।

জাহাজটার ম্যাগনেটো-হাইড্রোডাইনামিক ইঞ্জিনের উপর বিশ্বাস রাখা যায়। রানা মৃদু হেসে ফেলল, বিড়বিড় করে বলল, 'কপাল ভাল যে ইঞ্জিনের নামটা মুখে বলতে হচ্ছে না, নইলে দু'চারটা দাঁত খসে পড়ত!'

ইঞ্জিনটা সাগরের পানি থেকে অবমুক্ত করা ফ্রি ইলেকট্রন ব্যবহার করে চলে। এখনও এক্সপেরিমেন্টাল পর্যায়ে আছে। ওটার ক্রাইও-কুল্ড্ ম্যাগনেট পাম্পগুলো প্রচণ্ড শক্তি যোগান দেয় জাহাজের চারটে পাল্‌স্ অ্যাকুয়া জেটকে। বলা উচিত, জলে চলে না, প্রায় আকাশে উঠে পড়ে ওটা।

আতাসি ফিসফিস করে বলল, 'বিড়বিড় করে কী সব বলছেন, বস্?'

'না। কিছু না।' রানা চট্ করে দুই তাইওয়ানিজকে দেখে নিল। টের পেল শিরদাঁড়ায় শীতল অনুভূতি। ওর প্রতিটি কাজে ভয়-বিপদ-শিহরন আর মৃত্যুর হাতছানি আছে বলেই বেঁচে আছে ও! সোহেল আর আতাসিও একই কথা বলবে, বলবে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসের প্রত্যেকে।

ঘড়িতে কয়েকটা টোকা দিল ও। ওটাই সিগনাল। সোহেল আর আতাসি এখন জানে কাজে নামতে হবে।

সোহেলকে একটু আড়াল দিল আতাসি, সেই সুযোগে সোহেল ব্রিফকেসের ভিতরের এক সেট লক খুলল। সিগারেট-খোর এজেন্টের দিকে তাকাল রানা, হাতের ইশারায় একটা সিগারেট চাইল।

লোকটা হাসিহাসি ভাব করে কোটের পকেটে হাত ভরল, তুবড়ে যাওয়া সিগারেটের প্যাকেট বের করল।

তার দিকে এগোল রানা।

দুই এজেন্ট রানার দিকে মনোযোগ দিয়েছে, সুযোগটা নিল সোহেল, ব্রিফকেস খুলে বোমাটা বের করে নিল। জিনিসটা দেখতে ত্রিশ টাকার কিট-ক্যাট চকলেটের মত। শক্তি প্রায় ক্লেমোর মাইনের সমান। ওটার ভিতরে ডেটোনেটারও আছে।

সিঁড়ির পাঁচ ফুটের মধ্যে চলে গেছে রানা, ধূমপায়ী এজেন্ট নেমে এল ডেক-এ। বিরক্ত হলো রানা, লোকটা আগের জায়গায় বসে থাকলে ভাল হতো। ও নিজে ল্যাণ্ডিঙে উঠতে পারলে ওদের একইসঙ্গে বাগে পেত। এখন আর সেই সুযোগ নেই। লোকটা সিগারেট বাড়িয়ে দেয়ায় নিল। ব্যাটা লাইটার জ্বেলে নাকের কাছে ধরল।

নাক বাঁচিয়ে শলাটা ধরিয়ে নিয়ে জোরেসোরে একটা টান দিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে বেদম কেশে উঠল। মনে হলো কড়া তামাকের ধাক্কায় চমকে গেছে। লোকটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গীকে কী যেন বলতে গেল, কিন্তু শুরু করতে পারল না—চোয়ালে রানার প্রচণ্ড ঘুসি খেল সে। বদ্ধ হোল্ডে হাড় ভাঙবার কড়াৎ! শব্দ হলো। পরমুহূর্তে মেঝেতে শুয়ে পড়ল সে। অজ্ঞান!

রানা ভাবতেও পারেনি দ্বিতীয় এজেন্ট এত দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখাবে। আরে ব্যাটা, দুটো সেকেণ্ড তো দিবি! না। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়েই সিঁড়ি বাইতে শুরু করল সে, উঠে যাচ্ছে উপরে, সেই সঙ্গে হাত ভরে দিয়েছে কোটের ভিতর। একেক বারে তিন-চার ধাপ টপকে ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছল রানা, ততক্ষণে হোলস্টার

থেকে একটা কোল্ট অটোমেটিক বের করে ফেলেছে এজেন্ট। ওখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে লোকটার গোড়ালি ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানা। লোকটা সিঁড়ির ধাপে পিছলে গড়িয়ে নীচের ল্যাণ্ডিঙে এসে থামল। পিস্তলটা হাত থেকে খসে রয়ে গেল উপরের ল্যাণ্ডিঙেই।

পিছলে গেছে রানাও। ল্যাণ্ডিঙে থুতনি দিয়ে পড়ল ও, ব্যথায় চোখে আঁধার দেখল। দেরি করবার সময় নেই, লোকটা পিস্তল পেলে সর্বনাশ! তার তাক করতে হবে না, গুলি করলেই জেনারেল পিয়েং সাবধান হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গার্ড ছুটে আসবে। বামহাতে থুতনির রক্ত মুছে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা।

এদিকে ক্ষিপ্র তাইওয়ানি রানার আগে উঠে পড়েছে, আবার দ্রুত সিঁড়ি ভাঙছে। এক লাফে তার পাশে পৌঁছে গেল রানা, বাম কনুই দিয়ে ওর পাঁজরে জোরে গুঁতো মারতে চাইল।

লোকটা অসম্ভব চালু, শরীর মুচড়ে সরে গেল। পাঁজরের বদলে রানার কনুই গিয়ে পড়ল রেইলিঙের প্লেটে। সঙ্গে সঙ্গে হাত অবশ হয়ে গেল। উপরের প্ল্যাটফর্মে প্রায় একইসঙ্গে পৌঁছল দু'জন। তাইওয়ানি উবু হয়ে পিস্তল তুলে নেবে—তার হাতটা ধরতে চাইল রানা। সরু সিঁড়িতে ধাক্কাধাক্কি শুরু হলো। হাতে সাড় নেই বলে একহাতে সুবিধা করতে পারল না রানা। লোকটার আঙুল এখন পিস্তলের গ্রিপের দু'ইঞ্চি দূরে!

ওদিকে সোহেল ব্যস্ত হয়ে বোমাটা মিসাইলের ওয়ারহেডে বসিয়ে দিয়েছে। আতাসি জোব্বার ভাঁজে স্টিলেটো রেখেছে, ওটা বের করে সিঁড়ির দিকে দৌড়ে এল। স্পষ্ট বুঝল, ঠিকসময় পৌঁছাতে পারবে না।

তাইওয়ানি এজেন্ট ডানহাতে রানাকে ধাক্কা দিয়ে সরাল, বামহাতে ধরতে চাইল পিস্তল। রানার বামহাত একেবারেই অসাড়, ডানহাতে লোকটাকে বাধা দিতে চাইল—শরীর মুচড়ে বামহাত তুলল, লোকটার মাথায় ধাক্কা দিল। মুহূর্তের জন্য থামল সে, চট্ করে ল্যাং মারল। পড়তে পড়তে সামলে নিল রানা।

লোকটা পিস্তল তুলে নিল, চরকির মত পাশ ফিরল। কিন্তু গুলি করবার সুযোগটা পেল না, ডানহাতে খপ করে তার কব্জি ধরে ফেলল রানা, মোচড় দিয়ে রেইলিঙে দমাদম বাড়ি দিতে শুরু করল—ছেঁচে দিতে চাইছে আঙুলগুলো। লোকটা তীব্র ব্যথায় ছেড়ে দিল পিস্তল।

সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেছে আতাসি, নীচে গিয়ে পড়বার আগেই পিস্তলটা লুফে নিল সে, কয়েক লাফে উঠে এসে প্রচণ্ড বেগে লোকটার মাথায় পিস্তল নামিয়ে আনল। একবার, দুইবার, তিনবার। এতক্ষণে লোকটার চোখ উল্টে গেল, জ্ঞান হারিয়ে ল্যাণ্ডিঙে গিয়ে পড়ল।

মুখ কুঁচকিয়ে ব্যথা সামলাতে চাইল রানা, সোজা হয়ে দাঁড়াল। আতাসি বলল, 'ঠিক আছেন তো, বস্?'

মিসাইল ফেলে দৌড়ে এল সোহেল, দ্বিতীয় ল্যাণ্ডিঙে উঠে বলল, 'চল্, হাতে সময় নেই! যে-কোনও সময় এখন হাজির হবে ইজরায়েলি জাহাজ!'

বোমার রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইসটা রানার হাতে দিল সোহেল। হোল্ডের হ্যাচ

খুলে বেরিয়ে এল ওরা, তাড়াহুড়ো না করে চলে এল মেইন ডেকে।

অন্তত দশজন লোক ডেকের রেলিং ধরে উপসাগরের দিকে চেয়ে আছে। বিশাল এক জাহাজ তরতর করে ঢুকছে বন্দরে! দু'পাশে ঢেউয়ের মাথায় ফেনা। ইজরায়েলিদের ট্র্যান্সপোর্টেশন। পিছন থেকে লোকগুলোকে দেখল রানা, তাদের মধ্যে জেনারেল নেই। ইজরায়েলি জাহাজের ক্যাপ্টেন নোঙর ফেলার পর বেরিয়ে আসবে বোধহয়।

হাতের ইশারা করল রানা। ওরা স্টার্নের দিকে চলেছে। একবার থামল, চারপাশ দেখে নিল। এদিকে কোনও প্রহরী নেই। সব সুনসান। বন্দরের মুখে দূরে ডেস্ট্রয়ারটা ভাসছে। ওটার ডেকে কেউ নেই। একশো এমএম কামানগুলো উপসাগরের দিকে তাকিয়ে।

ওরা পিছনের ডেক পেরিয়ে রেলিঙের পাশে থামল। একবার ঘড়ি দেখল রানা, তারপর রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইসের লাল বাটন টিপেই ফেলে দিল ওটা সাগরে।

এবার ওরা নিজেরাও রেলিং টপকে খসে পড়ল সাগরে।

পানি বেশ ঠাণ্ডা, কুলকুচি করে বিরক্ত হলো আতাসি, থুহ্-থুহ্ করে ফেলে দিল। পানিতে কেরোসিনের গন্ধ। জোব্বা খুলে ফেলল, সাঁতার কাটতে শুরু করল। বুট খুলে ওর পিছু নিল রানা ও সোহেল। জাহাজের খোলের ভাঁজে গিয়ে থামল ওরা। ডেক-এ এখন কেউ এলেও দেখতে পাবে না ওদের।

উর্বশী নিশ্চয়ই বত্রিশ ফুটি সাব-মারসিবলটা নিয়ে অপেক্ষা করছে। নাকি আসেনি ও? সেক্ষেত্রে মারা পড়বে ওরা! ভাল হতো উর্বশী পানির নীচে অপেক্ষা করলে। ওরা ডুব-সাঁতার দিয়ে এয়ার-লক পেরিয়ে সাব-মারসিবলে ঢুকতে পারত। কিন্তু ওতে অনেক সময় নষ্ট হবে। এখন দ্রুত সরে যেতে হবে। উর্বশী ভেসে উঠলে সাব-মারসিবলের পিঠের হ্যাচ খুলে নেমে পড়বে ওরা। এতে বড়জোর তিরিশ সেকেণ্ড লাগবে। কেউ যদি দেখেও ফেলে, কিছু করবার নেই। দি আফ্রিকান স্টারের প্রপেলার আর খোলে ঢেউয়ের চাপড় লেগে যে শব্দ হচ্ছে, সাব-মারসিবল তারচেয়ে অনেক কম আওয়াজ করবে। তাইওয়ানিজ ডিটেকশন গিয়ার তারপরেও যদি ওটাকে ধরে ফেলে, তা হলে ওদের কপাল খুবই মন্দ।

পুরো একমিনিট পার হলো না, ওরা জাহাজের স্টার্নে একগাদা বুদ্বুদ দেখল। মিনি-সাবের চুরুট সদৃশ কাঠামো দেখবার আগেই রওনা হয়ে গেল ওরা। ঢেউ ভেঙে উঠে এল ওটা। ঝরঝর করে ঝরে গেল পানি। কালো তিমির পিঠে আগে উঠল আতাসি, দ্রুত হ্যাচ কাভার ঘোরালো। হ্যাচ সিল খুলে যাওয়ায় ভুস্ করে বাতাস বেরিয়ে গেল। সিঁড়ি বেয়ে অন্ধকারে নেমে গেল আতাসি। ওর পর সোহেল ও রানা। হ্যাচটা আবার সিল করে দিল রানা। মিনি-সাব ডিসকভারি-৯৯৯-এর ভিতরে ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেট ম্লান আলো ফেলছে, সেই আলোয় ওরা যার-যার সিটের দিকে এগোল।

উর্বশী বাল্কহেডের একটা সুইচ টিপল, জ্বলে উঠল ব্ল্যাকআউট লাল বাল্‌ব্। ডিসকভারি-৯৯৯ সাধারণত বড়জোর একশো ফুট গভীরে নামে। চব্বিশ ঘণ্টা পর ব্যাটারিগুলো রিচার্জ করতে হয়, বদলাতে হয় CO_2 ফিল্টার। যাত্রীদের জন্য

আটটা সিট থাকে, কিন্তু এই অপারেশনে চারটে সিট সরিয়ে নেয়া হয়েছে। সেই জায়গা নিয়েছে র‍্যাক ভরা ব্যাটারি, ফিল্টার, উর্বশীর খাবারের কার্টন, আর একটা কেমিকেল টয়লেট। ফ্লোরে পড়ে আছে খাবারের খালি প্যাকেট। সাব-মারসিবলের ভিতর বাতাস ভারী ও গুমোট।

চারদিন আগে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস ছেড়েছে উর্বশী, নান-আও বন্দরে এসে ঢুকেছে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন। তাইওয়ানিজ নেভি নিয়মিত পানির নীচে কান পেতেছে, অ্যাক্টিভ সোনার দিয়ে ঝাড়ু মেরেছে। এরা আমেরিকার দোসর ইজরায়েলের জন্য নান-আও বন্দর দুর্গ বানিয়ে ছেড়েছে। ভাটার সময় স্রোত উর্বশীকে আস্তে আস্তে সাগরে টেনে নিয়েছে, আবার জোয়ারে পৌঁছে দিয়েছে বন্দরে। ইলেকট্রিক মোটর ইচ্ছা মত চালু করবার পথ ছিল না। কোনও জাহাজ বা প্যাট্রল বোট সাগরে বেরিয়ে গেলে, উর্বশী সেই সুযোগে আগের জায়গায় ফিরেছে।

উর্বশীর ডানপাশের সিটে বসল রানা। ওটা কো-পাইলটের সিট।

গ্রীবা ফেরাল অপরূপা উর্বশী। সুন্দর মুখটা একটু ম্লান। পুরো চারদিন এই কফিনে আটকে আছে ও। 'সব ঠিক আছে, রানা?'

'এখন পর্যন্ত,' ঘড়ি দেখল রানা। 'এগারো মিনিট পর জিরো টাইম।'

সাব-মারসিবল নীচে নামছে। ডিসকভারি ৯৯৯-এর একমাত্র প্রপেলারটা পানিতে কামড় দিল। এখন আর শব্দ নিয়ে চিন্তা করছে না ওরা। বোমার শক-ওয়েভ পানিতে দ্বিগুণ জোরে আছড়ে পড়বে, আওতার মধ্যে সাবটাকে পেলে চুরমার করে দেবে। জাহাজটা পিছনে ফেলে দ্রুত সরে যেতে হবে এখন। ওদের মাথার উপর দিয়ে যাবে ইজরায়েলি জাহাজটা। অথবা, যাবে না কোথাও!

সোনারের দিকে চোখ রাখল রানা। আধ মিনিটও পার হলো না, যা ভেবেছে, তা-ই—তাইওয়ানিজ নেভি টের পেয়ে গেছে। গম্ভীর হয়ে গেল রানা।

ওর ঘাড়ের কাছে মুখ নিয়ে জানতে চাইল সোহেল, 'অবস্থা কী?'

'শব্দের সিগনাল অ্যানালাইজ করছে কম্পিউটার।'

'আগেই দেখেছি আমি,' বলল উর্বশী। 'দক্ষিণ কোরিয়ার সিনপো-ক্লাস প্যাট্রল বোট। ক্রু বারোজন। ওদের দুটো থারটি-সেভেন এমএম অটোক্যানন আছে। র‍্যাকে ডেপ্‌থ্ চার্জ। ইচ্ছে করলে স্পিড চল্লিশ নট পর্যন্ত তুলতে পারবে, কিন্তু এখন বিশ নট-এ আসছে।'

সোহেল বিড়বিড় করল, 'আহা, কী মধুর সংবাদ যে শোনালেন আপনি, উর্বশী! আমার মন ভাল হয়ে গেল!'

'এটাই এদের রুটিন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা দোলাল উর্বশী। 'হ্যাঁ, আমার অভিজ্ঞতা তা-ই বলে। আন্দাজ দুই ঘণ্টা পরপর পুরো বন্দর টহল দেয়। ওরা কোর্স না পাল্টালে আমাদের মাথার উপর দিয়ে যাবে।'

'ওদের সোনার আছে?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'জানি না।' রানার দিকে তাকাল উর্বশী, গলায় কোনও কম্পন নেই, জিজ্ঞেস করল, 'কী করতে চাও? আমরা আরও নীচে গিয়ে থামতে পারি। ওরা চলে গেলে

আবার এগোব?'

চট্ করে ঘড়ি দেখল রানা। ওরা মাত্র সিকি মাইল পেরিয়েছে। আরও অনেক দূরে সরে যেতে হবে। মাথা নাড়ল ও, 'থেমো না। ওরা আমাদের ডিটেক্ট করলে গতি কমিয়ে ঘুরে আসবে, ততক্ষণে আমরা বেশ অনেকটা সরে যেতে পারব। যদি পারে তো আমাদের খুঁজে বের করুক। হাতে ছয় মিনিট পেলেই চলবে।'

ইঞ্জিন আর প্রপেলারের আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। পানি খলবল করছে। প্যাট্রল বোট দ্রুত আসছে। শব্দ আরও বাড়ল, তারপর ওদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। টানটান উত্তেজনায় অপেক্ষা করল ওরা, আশা করল বোট আর আসবে না। ওটা দূরে চলে গেল।

আতাসি ফোঁস করে আটকানো শ্বাস ফেলল।

রানার চোখ স্ক্রিনে আঠার মত আটকে গেছে। দশ সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল ও, তারপর নিচু স্বরে বলল, 'ওরা ঘুরছে। মনে হয় আরেকবার দেখবে। আতাসি, রেডিয়ো চেক করো। ওরা ট্র্যান্সমিট করতে পারে।'

দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসের কমিউনিকেন্স ডিভিশন চালায় আতাসি, রেডিয়োর ব্যাপারে সত্যিই জাদু দেখাতে পারে।

দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসের কম্পিউটারগুলো প্রতি সেকেণ্ডে এক হাজার ফ্রিকোয়েন্সি অ্যানালাইজ করে। যে প্রোগ্রামগুলো আছে, তাতে সুপার কম্পিউটার একশো বিশটা ভাষায় আলাপ চালাতে পারে। যে-কোনও শ্রোতা বোকা বনে যাবে, বুঝতেই পারবে না কম্পিউটারের সঙ্গে আলাপ করছে। কিন্তু ডিসকভারি ৯৯৯-এ ইলেট্রনিক্স অনেক কর্মী। এই মুহূর্তে আতাসির জন্য যে-কোনও ব্রডকাস্ট ধরা প্রায় অসম্ভব। তাইওয়ানিজ ভাষ্যকার হয়তো ডেপ্থ্ চার্জ ফেলতে চায়, কিন্তু ভাষার কারণে কিছুই বোঝা যাবে না।

একমিনিট চুপ করে শুনল আতাসি, তারপর বলল, 'রেডিয়ো কোনও আওয়াজ করছে না।'

প্যাট্রল বোট আবার চলে এল। ওটার ইঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল। মনে হলো থেমে দাঁড়িয়েছে।

'আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে,' বলল উর্বশী।

সাব-এর শক্তিশালী সোনার পানিতে ছোট দুটো আওয়াজ ধরল। ডেপ্থ্ চার্জ হতে পারে না। রানা হঠাৎ বুঝে ফেলল ওটা কী। দেরি না করে বলল, 'শক্ত করে কিছু ধরো! গ্রেনেড!'

সম্ভবত আমেরিকার দেওয়া কোনও হাই-এক্সপ্লোসিভ গ্রেনেড। ওগুলো সাধারণত চার আউন্স হয়। এসব বিস্ফোরক পানির নীচে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। গ্রেনেড দুটো ডিসকভারি ৯৯৯-এর পিছনে পড়ে বিস্ফোরিত হলো। ধাক্কা খেয়ে সাব লেজ উপরে তুলল। আতাসি ছিটকে গিয়ে র‍্যাক-ভরা ব্যাটারির সঙ্গে ধাক্কা খেল। উর্বশী সাব-এর নাক তুলতে ব্যস্ত হলো। অ্যাক্রিলিক ভিউ পোর্টে বাইরে দেখা গেল—বিস্ফোরণের ফলে পানি ঘোলাটে হয়ে গেছে।

কানের ভিতর ঝনঝন করছে বলে শুনতে পেল না ওরা, প্যাট্রল বোট দ্বিতীয়বারের মত গ্রেনেড ফেলেছে। ওগুলো সাব-এর মাথার বেশ কিছুটা উপরে

ফাটল। উর্বশী বহুকষ্টে সমতল প্ল্যাটফর্মে ফিরেছিল, আচমকা বিস্ফোরণে সাবটা নীচের কাদায় গেঁথে গেল। পোর্টহোলে শুধু কালি-গোলা অন্ধকার! পরমুহূর্তে অত্যুজ্জ্বল আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিল! একদম হতভম্ব হয়ে গেল ওরা। দু'সেকেণ্ড পর বুঝল, কোনও কিছু বিস্ফোরিত হয়নি। ওটা ছিল একটা স্ফুলিঙ্গ। ঝাঁকিতে ভিতরের কোথাও বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়েছে। সাব-এর ভিতর গাঢ় অন্ধকার!

গতি পাওয়ার জন্য থ্রটল খুলল উর্বশী। নড়ল না সাব। একটা বাতিও জ্বলল না। এখানে থাকলে পরেরবার মাথায় গ্রেনেড পড়বে!

ওদিকে আতাসি অন্ধকার হাতড়াচ্ছে, নিজের সিটে ফিরতে পারলে রেডিয়োতে কান পাতবে।

ডানপাশের কেবিনেট ঘাঁটল রানা, খুদে টর্চটা খুঁজে পেয়ে জ্বালল। চেয়ার ছেড়ে ব্যাটারির র‍্যাকের পাশে চলে এল, টর্চ ঘুরিয়ে চারপাশ দেখল। কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে। পোর্টহোলের ভিতর দিয়ে নীলচে আলো উপরে গেছে! রাতের আঁধারে গভীরের ওই বিদঘুটে আলো প্যাট্রল বোটের যে-কেউ চিনবে!

এইমাত্র নিজের সিটে ফিরেছে আতাসি, ধরা স্বরে বলল, 'আমাদের ধরে ফেলেছে! ওরা কী যেন বলছে! সংক্ষিপ্ত মেসেজ। বস্, এবার লুকোচুরি শেষ!'

সোহেল জিজ্ঞেস করল, 'পারবি তুই, রানা?' ওর কণ্ঠ শুনে মনে হলো পুরোপুরি নিরুদ্বিগ্ন।

চাপা স্বরে বলল রানা, 'পারতে হবে।' আতাসিকে বলল, 'তীরের ওরা কিছু বলে?'

'না। মনে হয় প্যাট্রল বোটের কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে!'

আধমিনিট পর মূল সমস্যাটা ধরতে পারল রানা। দ্রুত হাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাটারিগুলো বাইপাস করল। 'ঠিক আছে, উর্বশী, স্টার্ট দাও।'

কন্ট্রোল প্যানেলের সবচেয়ে বড় বাটনটা টিপল উর্বশী, সঙ্গে সঙ্গে ডিসপ্লে-স্ক্রিন জীবন ফিরে পেল।

কো-পাইলটের সিটে বসে পড়ল রানা। 'তিমিটা ওপরে তোলো।'

আপত্তি জানাল উর্বশী, 'ওরা অপেক্ষা করছে!'

তিক্ত হাসল রানা। 'জানি।'

বিড়বিড় করে বলল উর্বশী, 'রানা, গেল স্যাব-এর ওয়ারেন্টি! তোমার বসের দোস্ত কাঁদবে!' ব্যালাস্ট বাটন টিপল ও, সাব-এর ট্যাঙ্কে কম্প্রেস্‌ড্ এয়ার ঢুকছে, বদলে পানি বেরিয়ে যাচ্ছে। মনে হলো কেউ ওদের টান দিয়ে তুলে নিচ্ছে। দ্রুত উঠছে ওরা। ডেপ্‌থ্ গেজ দেখছে উর্বশী, সারফেসের বিশ ফুট বাকি থাকতে কাউন্ট ডাউন শুরু করল, '...পনেরো ফুট... বারো... আট... ছয় ফুট!'

ডিসকভারি আর পাঁচ ফুট উঠলে ভেসে উঠবে উপরে। ওরা চেয়ারের হাতল ধরে শক্ত হয়ে বসল।

মিনি-সাবের পিঠ লাগল প্যাট্রল বোটের তলায়। সাব অতিদ্রুত উঠে এসেছে, ফলে প্রচণ্ড গুঁতো মারল। দুই জলযান বিকট আওয়াজ তুলল। সংঘর্ষের আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল। তুলনায় প্যাট্রল বোটের ওজন খানিকটা বেশি, তবে ওটা স্টার-বোর্ডে পুরোপুরি কাত হয়ে গেছে। মুহূর্তে বোটের রেইলিং পানির নীচে ডুবে

গেল। ডেকে গড়াল ডিজেলের ড্রাম। ওগুলোর একটা এক ক্রুর ডান পা চুরমার করে দিল।

উর্বশীর দিকে ঝুঁকল রানা, সোহেল ও আতাসি মুহূর্তের জন্য ভাবল, মেয়েটাকে চুমু দেবে ও। কিন্তু এক সেকেণ্ড পর বোঝা গেল ওর অন্য মতলব আছে—সাব-এর আপার ডেক ভেসে উঠবার আগেই কন্ট্রোল প্যানেলে পটাপট কয়েকটা বাটন টিপল রানা।

সবাইকে ডোবাতে চায় ও!

ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কগুলো মাত্র পনেরো সেকেণ্ডে ভরে গেল। ডিসকভারির ক্র্যাশ ডাইভ শুরু হলো। জলযানটা ভারী পাথরের মত নামছে!

'আপাতত ওরা অন্যদিকে তাকাবে না,' বলল সোহেল।

আতাসি আরও নিশ্চিত হতে চাইল, 'আর সেই সুযোগে চম্পট দেব আমরা?'

'হাতে আড়াই মিনিট পেলে টিকে যাব,' বলল রানা। 'ঠিক আছে, সবাই ইয়ারফোন পরে সিট-বেল্ট বেঁধে নাও।'

ওরা সবাই ভারী ইয়ারফোন পরে নিল, প্লাগ লাগাল একটা ইলেক্ট্রনিক্স গ্যাজেটে। বিসিআই-এর টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ডক্টর শামশের আলী বানিয়েছেন। এ দিয়ে যে-ফ্রিকোয়েন্সির আওয়াজ আসবে, সেটাকে অ্যামপ্লিফাই করে আবার ফেরত পাঠানো হবে। এর ফলে দুটো আওয়াজ একে অন্যকে থামিয়ে দেবে—কানে কোনও চাপ পড়বে না। পাগলা ডক্টর আফসোস করে বলেছেন, তিনি এখনও পুরোপুরি সফল হননি, মাত্র নিরানব্বুই পার্সেন্ট ডেসিবেল ঠেকাতে পারছেন। আশা করছেন, কিছুদিন পরেই পাওয়া যাবে নিঃশব্দ ভ্যাকিউম ক্লিনার, ডেন্টিস্টদের ড্রিল ইত্যাদি!

দুই তাইওয়ানিজ স্পাই দি আফ্রিকান স্টারের হোল্ডে পড়ে আছে। তাদের একজন হঠাৎ চোখ খুলল। একপলকে তার সব মনে পড়ে গেল। ভাঙা চোয়ালের ব্যথা সহ্য করে সঙ্গীকে পরীক্ষা করল।

গাধাটার মাথা ফেটে গেছে। কতবড় সাহস, এখনও অজ্ঞান!

লোকটা দেরি না করে হোল্ড ছেড়ে বেরিয়ে এল। ড্যিউটি তো ডিউটিই! চোয়ালের ব্যথা ভুলে প্রাণপণে চেঁচাতে শুরু করল সে, দৌড়ে মেইন ডেকে উঠে এল, ব্রিজের পিছনের করিডোরে এসে একটার পর একটা দরজা খুলল—দেড় মিনিট পরে ক্যাপ্টেনের কেবিন খুঁজে পেল। এক সেকেণ্ড ভাবল দরজায় নক করবে কি না, কিন্তু সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলল—নাটকীয় ভঙ্গিতে হুড়মুড় করে কেবিনে ঢোকাই ভাল!

জেনারেল হো পিয়েং টেলিফোনে কথা বলছেন: 'আর তারপর? আমার আরও কী কী করবে তুমি, শ্বেতপদ্ম? আমি কিন্তু গরম হয়ে উঠছি!' রোমান্টিক ভঙ্গি নিয়ে বুকে বামহাত রেখে রক্ষিতাকে আরও কিছু বলতে যাবেন, কিন্তু এমনসময় দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। জেনারেল চমকে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে মেঝেতে পড়তে পড়তে সামলে নিলেন, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে উঠলেন: 'অ্যাই! কী হচ্ছে!'

ধূমপায়ী এজেন্ট হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'জেনারেল! ইজরায়েলিরা হামলা করেছে! আমাদের অজ্ঞান করে... ওরা এখন হোল্ডে নেই! আমার মনে হয় পালাচ্ছে!'

'পালাচ্ছে? পালাবে? কোথায়? কেন?' প্রশ্ন ছুঁড়বার এক সেকেণ্ড পর পিয়েং বুঝে গেলেন জবাবটা কী হবে। কোনও কথা না বলে ফোনের লাইন কেটে দিলেন তিনি, তীরের অপারেটরের সঙ্গে কথা বলতে রিসেট লিভার টিপলেন। জবাব দিল না কেউ। জেনারেলের মুখ দিয়ে গালি বেরুল, 'হারামজাদা ধর্! ...রানির পোলা! কই তুই!' চোয়াল ভাঙা গুপ্তচরকে বলল, 'আরে শালা, ওরা ইজরায়েলি না! হোল্ড সার্চ করো! ওখানে বোমা আছে!'

এবার টেলিফোনে ঘুম-ভরা একটা কণ্ঠস্বর 'হ্যালো' বলল।

পিয়েং অঙ্কের হিসাব কষে ফেলেছেন—তিনি হয়তো বাঁচবেন না, কিন্তু নকল ইজরায়েলিদের ধরতে পারলে তাঁর দেশ উপকৃত হবে। হয়তো আমেরিকার চড় খেতে হবে না। 'রেড অ্যালার্ট! সবাইকে অ্যালার্ট করো! আমি দি আফ্রিকান স্টার-এ জেনারেল পিয়েং...'

সোহেলের বসানো বোমাটা আর দেড় সেকেণ্ড পর ফাটবে।

'আমি চাই...'

মিসাইলের ভিতর সোহেলের পাতা বোমাটা ফাটল। এক মিলি-সেকেণ্ড পরে সেকেণ্ডারি এক্সপ্লোশন ঘটল ওয়ারহেড-এ! হোল্ডের ভিতরে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হলো। চার টন ওজনের হ্যাচগুলো কামানের গোলার মত ছিটকে উড়ে গেল অন্ধকার রাতে। কমলা-লেবুর খোসার মত জাহাজের খোলের প্লেটিংগুলো ছিঁড়ে গেল। হোল্ডের সামনে রাখা মিসাইল ফিউল এবার বিস্ফোরিত হলো।

দি আফ্রিকান স্টার স্রেফ উবে গেল। সেইসঙ্গে গেল আশপাশে নোঙর ফেলা চারটে প্যাট্রল বোট ও লঞ্চ।

সাতশো ফুট কংক্রিট ডকের ওয়েজ চুরমার হলো, বিরাট খণ্ডগুলো চারদিকে ছুটল। প্রকাণ্ড লোডিং ক্রেন দুটো কাত হয়ে পানিতে পড়ল। বন্দরের সামনের সমস্ত কাঁচের জানালা ঝন-ঝন করে ভেঙে পড়ল চৌচির হয়ে। এইবার শুরু হলো শক-ওয়েভের প্রতিক্রিয়া। আট শ' ফুটের মধ্যে যত ওয়্যারহাউস ছিল, সব তাসের ঘরের মত শুয়ে পড়ল মাটিতে। আরও দূরেরগুলোর দেওয়াল খসে গিয়ে খাড়া থাকল কঙ্কালের মত, শুধু স্টিলের ফ্রেম। দূরের স্টাফ কোয়ার্টারগুলোর জানালার কাঁচ চুরচুর হয়ে ভাঙল। অফিসার ও নাবিকদের পরিবার-পরিজন মেঝেতে শুয়ে ভাবল, প্রলয় শুরু হয়েছে! উপকূলের প্রথম ছয় ফুট পানি সরে গিয়ে একটা দেয়াল তৈরি করল, তারপর বিশাল ঢেউ হয়ে ছুটল জলোচ্ছ্বাস। নোঙর করা ডেস্ট্রয়ারকে প্রবল এক ধাক্কা দিয়ে প্রথমে ওটার কীল ভাঙল, তারপর ফেলে দিল কাত করে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ডুবে গেল জাহাজটা। এক পলক পর ইজরায়েলি বিশাল জাহাজে জলোচ্ছ্বাসের ধাক্কা লাগল। লাফিয়ে উঠল ওটা, পরমুহূর্তে নাক সোজা হলো সাগর-তলের দিকে, রওনা হয়ে গেল কবরস্থানে। অতবড় জাহাজটার চিহ্নমাত্র রইল না!

গভীর রাত মুহূর্তে ফকফকা দিনে পরিণত হয়েছে। আগুনের বিশাল একটা

ছাতা এগারোশো ফুট উপরে উঠল। জ্বলন্ত মিসাইল-ফিউল বৃষ্টির মত ঝরল চারপাশে, নেভি ইয়ার্ডে নতুন করে আগুন ধরল। দি আফ্রিকান স্টার টুকরো টুকরো হয়ে শ্র্যাপনেলের মত ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে, আশপাশের গাড়িগুলো সব ধ্বংস হয়ে গেল। শ্র্যাপনেলগুলো দূরের কয়েকটা দালান ধসিয়ে দিল।

পেট্রল বোট ডিসকভারির গুঁতো খেয়ে টলমল করছে, এমনি সময়ে শক-ওয়েভ ওটাকে খপ্ করে ধরল। উঁচু পাহাড়ি ঢালে গাছ কেটে ছেড়ে দিলে কাণ্ডটা যেমন ভাবে গড়িয়ে নেমে আসে, বোটটা সেইভাবে গড়াল সাগরের উপর। পাঁচ সেকেণ্ডে ওটার সামনের কামান উধাও হলো, গেল পিছনের .৫০ ক্যালিবারের মেশিনগান। ছোট্ট কেবিনটা ছিঁড়ে আলাদা হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত থাকল কেবল বোটের খোলটা—সাগরের অশান্ত ঢেউয়ে দুলছে।

এয়ারপ্লাগ থাকা সত্ত্বেও সাগরতলে ওদের মনে হলো, ডিসকভারি-৯৯৯ চার্চের ঘণ্টার মত কাঁপছে। শক-ওয়েভ যেন আপনমনে ওটাকে নিয়ে খেলছে—সাব-মারসিবল লাফ দিয়ে সামনে ছুটছে, পরমুহূর্তে পাকা রাস্তায় যেন হার্ড ব্রেক করে থেমে দাঁড়াচ্ছে। চার যাত্রী সিট-বেল্ট না বাঁধলে ছিটকে পড়ে মরত। স্ট্র্যাপগুলো বারবার ছিঁড়তে গিয়েও ছিঁড়ল না। স্টোরেজ বিনের ইকুইপমেন্টগুলো চারপাশে গিয়ে পড়ল। ডক্টর শামশের আলীর কাউন্টারফ্রিকোয়েন্সি গ্যাজেট না থাকলে ইয়ারফোন কোনও কাজে আসত না, চিরদিনের জন্যে কালা হয়ে যেত ওরা শব্দের ধাক্কায়।

শক-ওয়েভ চলে যাওয়ার পর ইয়ারফোন খুলল ওরা। কে কেমন আছে জানবার জন্য কথা বলতে শুরু করে টের পেল রানা, রীতিমত চেঁচাতে হচ্ছে ওকে। উর্বশী আর সোহেল ঠিক আছে, একটা ব্যাটারি আতাসির মাথায় পড়েছে। চাঁদি ফুলে গেছে—আর কিছু না।

স্বস্তির শ্বাস ফেলে রানা বলল, 'উর্বশী, এবার বাড়ি চলো।'

ওরা বন্দর থেকে দুই মাইল সরে যাওয়ার পর হেলিকপ্টারের আওয়াজ পেল। ওগুলোর গতি ও উচ্চতাই বলে দিল এএসডাব্লিউ কপ্টার নয়—অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ারের জন্য তৈরি নয়। অতি দ্রুত চলেছে। সম্ভবত নান-আও নেভাল বেজে মেডিকেল সাপ্লাই আর ডাক্তার পৌঁছে দিতে চলেছে।

দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস আঠারো মাইল দূরে অপেক্ষা করছে। ওখানে পৌঁছাতে আন্দাজ আড়াই ঘণ্টামত লাগবে। সূর্য তার অনেক আগেই উঠবে, তাইওয়ানিজ নেভি-এয়ারফোর্স ওদের খুঁজতে পারে, তাই সে-সুযোগ দেবে না—দেরি হয় হোক, পানির অনেক নীচ দিয়ে যাবে ওরা।

পৌনে তিন ঘণ্টা পর সাগরের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছল ওরা। উর্বশী আশি ফুট উঠে এল। দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসের তলায় রেড অ্যান্টিফাউলিং পেইন্ট আছে, মিনি-সাব ওটার নীচে পৌঁছে গেল। উর্বশী রিমোট কন্ট্রোল তুলে নিল, জাহাজের তলা তাক করে বাটন টিপল।

কীল-এর তলায় চওড়া দরজা খুলছে—ওটার দৈর্ঘ্য আশি ফুট, প্রস্থ পঞ্চান্ন ফুট। দরজার দু'কপাট নীচে ঝুলে গেল। জাহাজের উজ্জ্বল আলো নীচে নেমে এল। সাগরের অনেকখানি জায়গা ফরসা হলো। উর্বশী ডিসকভারির থ্রাস্টার

নাড়ল, একইসঙ্গে ব্যালাস্ট নিয়ন্ত্রণ করল। জাহাজের খোলা দরজায় থামল। দু'জন স্কুবা ডাইভার আসমান ছেড়ে নেমে এল। এরা সঙ্গে দুটো মোটা কেবল এনেছে, ওগুলো সাব-এর সামনে-পিছনে আটকাল।

উর্বশী সাব নিয়ে নিজেই মুন পুল-এ উঠতে পারত, কিন্তু সেটা সাব-এর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

বিসিআই চিফের বন্ধু অবশ্য বারবার করে বলেছেন, সাব-মারসিবল নিয়ে চিন্তা নেই। বিলিয়নেয়ার চ্যাঞ্জো পাপাগোপালা আরও বলেছেন, কিছু লাগলে রানা যেন চাইতে দ্বিধা না করে।

এক স্কুবা ডাইভার সাব-এর পোর্টহোলে এল, হাতের ইশারায় জানিয়ে দিল, এবার মোটর থামাতে হবে।

উর্বশী বাটন টিপে মোটর বন্ধ করল। দু'সেকেণ্ড পর নড়ে উঠল সাব, মসৃণ ভাবে উপরে উঠল। সাব-মারসিবলটা মুন পুল-এ তুলে নেয়া হলো। এবার উর্বশী ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কের ভাল্‌ভ্‌ খুলে দিল। পরবর্তী পঁচিশ সেকেণ্ডে সাব-এর পেটের সব পানি বেরিয়ে গেল।

ওভারহেড ক্রেন সাবটা তুলে নির্দিষ্ট ক্রেডল-এ, ডিসকভারি-১০০০-এর পাশে নামিয়ে রাখল। বাংলাদেশ নেভির এক নাবিক সাব-এর উপরে উঠল। হ্যাচ খুলেই হাঁ হয়ে গেল সে, খপ করে মুখ বন্ধ করল—তার আগেই বলে ফেলেছে, 'আরেহ্ শালা, এই অবস্থা হলো কী করে! গন্ধ কীসের!'

উর্বশী রেগে গিয়ে বলল, 'চারদিন ওটার মধ্যে থাকো না তুমি!'

ওরা একে একে বেরিয়ে এল। জাহাজের মেডিকেল অফিসার ফারা রাইনার দু'জন আর্দালি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে, সবাই সুস্থ দেখে মিষ্টি হাসল।

ফারা রাইনার হল্যাণ্ডের মানুষ, ডাক্তার না হলে নামকরা সুপার-মডেল হতে পারত। তবে রানাকে বেশি টানে ওর বেগুনী চোখ। ওই দুই চোখে অদ্ভুত মায়া আছে। ফারা আফগানিস্তানে দেড় বছর ছিল, যারা ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, তাদের চিকিৎসা করেছে তখন। রানা একটা কথা কখনও ভুলবে না—সেদিন ফারা না থাকলে গুরুতর আহত সোহেল মারা যেত।

অনুরোধ জানানোয় ফারা জাহাজের মেডিকেল অফিসার পদ নিয়েছে।

সোহেল-আতাসি-উর্বশী দাঁড়িয়ে পড়েছে, মৃদু মাথা নাড়ল রানা। 'আমার একটু দেরি হবে।'

'আমি গোসলে চললাম।' একবার আড় চোখে ফারাকে দেখে নিয়ে চলে গেল উর্বশী।

সোহেল-আতাসি নিজেদের কেবিনের দিকে রওনা হয়ে গেল।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে এক নাবিক, রানা তাকে বলল, 'দরজা বন্ধ করার ব্যবস্থা নাও। মিস্টার গগলকে খবর দাও, উনি যেন কন্ট্রোল রুমে চলে যান। আমরা সোজা উত্তর-পুবে যাব। গতি বিশ নট।'

'ইয়েস, সার!' স্মার্ট ভঙ্গিতে স্যালুট জানাল নাবিক, ছুটল ইণ্টারকমের খোঁজে।

মৃদু হাসল রানা। মুহূর্তের জন্য অতীতে ফিরল।

ভিনসেন্ট গগল দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসের নাম শুনেছে, ছবি দেখেছে—ওটা ওর স্বপ্নের জাহাজ। ও কল্পনা করত, একদিন ওরকম একটা জাহাজ হবে ওর। গগল একবার বলেওছে রানাকে, ওটা যদি চালাতে পারতাম!

দেড় মাস আগে রানা কথায় কথায় বলেছিল, 'তুমি ইচ্ছে করলে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসের ক্যাপ্টেন হতে পারো।'

গগল ফালতু কথার লোক নয়, বলেছিল, 'রানা, আমি সত্যি ওটার ক্যাপ্টেন হওয়ার যোগ্যতা রাখি। কিন্তু ও-জিনিস কেনার সাধ্য নেই। জাহাজের কথা বাদই দাও, ওটায় যা-যা ইকুইপমেন্ট আছে, তার অর্ধেকও জোগাড় করতে পারব না আমি।'

রানা শুধু বলেছে, 'ধরে নাও তুমিই ওটার ক্যাপ্টেন।'

গগল ভেবেছে: রানা কি ওর স্বপ্ন নিয়ে ঠাট্টা করছে? একটু রেগে গিয়ে বলেছে, 'রানা, তোমার সঙ্গে আমার ঠিক এরকম সম্পর্ক না! তুমি কী বদলে গেছ?'

এরপর রানা গগলকে পাকড়াও করে, সোজা নেপল্স্ বন্দরে এনে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসে তুলে দেয়। পরের কয়েকদিনে জাহাজের চেহারা পাল্টে যায়। বেশ কিছু নতুন অস্ত্র যোগ করা হয়। বদলে যায় ক্রু। এরপর রওনা হয় দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস।

গগল কথা রেখেছে। ও ইউরোপ, আফ্রিকা পার হয়ে মাত্র তেরো দিন পর চিন সাগরে হাজির হয়েছে। রানার দলের সবাই স্বীকার করেছে—এই জাহাজ যেমন সত্যি জাদু দেখায়, এর ক্যাপ্টেনও অদ্ভুত মানুষ—দক্ষতায় তার তুলনা নেই।

ফারা রাইনারের দিকে এগিয়ে গেল রানা। মেয়েটা জরুরি কিছু বলবে, ওর চোখ তা-ই বলে।

এদিকে জাহাজের তল-দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। পাম্প ব্যস্ত হয়ে উঠল, মুন পুলের পানি বের করে দিচ্ছে। ডেক-হ্যাণ্ডরা গর্তটা গ্রিল দিয়ে ঢেকে দিল। চ্যাণ্ড্রো পাপাগোপালার দেয়া টেকনিশিয়ানরা ডিসকভারি ৯৯৯-এর ক্ষতি পরীক্ষা করে দেখছে। আরেকটা ছোট দল ব্লিচের গ্যালন নিয়ে হাজির হয়েছে, সাব-এর ভিতরটা ধুয়ে পরিষ্কার করবে।

রানা দাঁড়ানোয় শ্রাগ করল ফারা, 'বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়েছি। আন্দাজ করছি কী ঘটেছে। হত্যাকাণ্ড।'

'মিথ্যা নয়, তবে আর কোনও উপায় ছিল না।'

আবার শ্রাগ করল ফারা। 'তোমাকে বিশ্বাস করি আমি। রানা, আমি হাঁপিয়ে উঠেছি অন্য কারণে। মনে হচ্ছে এখানে আমার কোনও কাজ নেই। তুমি নেহায়েত দয়া করে চাকরি দিয়েছ আমাকে।'

মৃদু হাসল রানা, 'এখানে এখন পর্যন্ত সবাই সুস্থ আছে বলে তোমার ভাল লাগছে না? আমি তো ভাবতাম যে-কোনও ভাল ডাক্তার চায় সবাই সুস্থ থাকুক!'

'অবশ্যই!' জোরেশোরে পা ঠুকল ফারা। 'কিন্তু কোনও হাসপাতালে জয়েন

করলে কাজ থাকত।'

'আমরা চেয়েছি এই জাহাজে তোমার মত একজন দক্ষ ডাক্তার থাকুক,' বলল রানা। 'অপেক্ষা করো, ফারা, তোমার কাজের অভাব থাকবে না। তখন হাঁপিয়ে উঠবে কাজের চাপে!'

•

চার

বিসিআই হেডকোয়ার্টার, মতিঝিল, ঢাকা।

বসের অফিস। মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের কাঁচা-পাকা ভ্রূ-দুটো কুঁচকে আছে। বাঘের দৃষ্টিতে সামনে বসা দুই এজেন্টকে দেখলেন কয়েক সেকেণ্ড, তারপর ধমকে উঠলেন: 'কী বুঝলে, শোনা যাক এবার। প্রথমে তুমি, সোহেল।'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, সার,' মিনমিন করে বলল সোহেল। 'লোকগুলোকে বৈধ ভাবেই পাঠানো হয়েছে বিদেশে। কাগজপত্র, ভিসা, পাসপোর্ট—কোথাও কোনও গোলমাল নেই। বিদায় নিয়ে হাসিমুখে প্লেনে বা জাহাজে উঠছে, তারপর হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে বেমালুম। দু-তিনটে ধাপ পর্যন্ত ট্রেস করা যাচ্ছে, তারপরেই গায়েব।'

'ব্যুরো অভ ম্যান পাওয়ার, এমপ্লয়মেণ্ট অ্যাণ্ড ট্রেইনিং থেকে মিনিস্ট্রিকে জানানো হয়েছে গত আট মাসে সাড়ে চার হাজার বাঙালি হারিয়ে গেছে। মিনিস্ট্রি আমাদের কাছে সাহায্য চেয়েছে।'

'আগে আমাদের জানানো হয়নি, সার,' বলল সোহেল। 'কর্তৃপক্ষের হুঁশ হয়েছে খবরের কাগজে নিকটাত্মীয়দের আহাজারি দেখে। খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে যখন দেখেছে একটা জায়গায় পৌঁছে আর এগোনো যাচ্ছে না, খুন হয়ে যাচ্ছে একের পর এক তদন্ত-অফিসার; তখন মিনিস্ট্রিকে ধরেছে আমাদের সাহায্য...'

'আমরা দুই-দুইজন এজেন্ট হারানো ছাড়া আর কী সাহায্যে আসতে পেরেছি এ পর্যন্ত?'

জবাব নেই চিফ অ্যাডমিন-এর মুখে। চোখ নামাল।

এতক্ষণ গভীর মনোযোগে একটা ফাইল দেখছিল রানা, চোখ তুলে প্রথমে সোহেল, তারপর বৃদ্ধের দিকে চাইল।

'গভীর জলের মাছ, সার,' বলল ও।

'মানে?' সোহেলকে ছেড়ে এবার রানাকে ধরলেন বৃদ্ধ।

'আমি খানিকটা খোঁজ-খবর নিয়েছি, সার। শুধু বাংলাদেশই নয়, ভারত-বার্মা থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার থাইল্যাণ্ড-মালয়েশিয়া-লাওস-ক্যাম্বোডিয়া-ভিয়েতনাম-ফিলিপাইন, এমনকী খোদ চিন থেকেও প্রচুর লোক হারিয়ে গেছে বিদেশে ভাগ্য গড়তে গিয়ে। ওদের বেশিরভাগেরই গন্তব্য ছিল দক্ষিণ কোরিয়া,

জাপান বা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ক্যালিফোর্নিয়ার মত ধনী, শিল্পোন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ।'

'গন্তব্য না হয় জানা গেল, কিন্তু খোয়া যাচ্ছে কোত্থেকে?'

'একেক দেশের লোক একেক জায়গা থেকে, সার। বোঝা যায় যারা এ-কাজ করছে, তাদের বিরাট নেট ওঅর্ক রয়েছে। ওদের মোকাবিলা করতে হলে ক্ষতিগ্রস্ত সবক'টি দেশের একসঙ্গে মিলে কাজ করতে হবে। কয়েকটি দেশের পরিচিতদের সঙ্গে এ-নিয়ে আমি নিজেই যেচে আলাপ করেছি, সার।'

'ওরা তোমার সঙ্গে কাজ করতে রাজি হয়েছে?'

'জিজ্ঞেস করিনি, সার,' বিনীত কণ্ঠে বলল রানা। 'তবে মনে হলো আমরা যদি কিছু করতে চাই, ওদেরকে সঙ্গে পাওয়া যাবে। এই সমস্যা নিয়ে ওদের সরকারও খুবই বিব্রতকর অবস্থায় রয়েছে।'

'কীভাবে এগোতে চাও?' মনে হলো এক ইঞ্চি কমেছে বুড়োর মেজাজ। সামান্য একটু নরম হয়েছে গলার স্বর।

'সার, আমি তো... কাজটার দায়িত্ব কি আমাকে দিতে চাইছেন, সার? আমার তো নিউ ইয়র্কে...'

'এটা আগে। হ্যাঁ, তোমাকেই দায়িত্ব দিতে চাই। অর্ধেক দুনিয়া জুড়ে যারা অপারেশন চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে যাকে-তাকে তো আর... মানে, মোটামুটি উপযুক্ত কাউকে পাঠানোই দরকার।'

'ঠিক আছে, সার। সোহেল আর আমি মিলে...'

'ওকে আবার কেন? ও অ্যাসাইনমেণ্টে গেলে এখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলবে কী করে?'

'ও তো দু'জন সহকারী তৈরি করে রেখেছে, সার। তাদের একজনকে টেস্ট করার এই তো সুযোগ।'

'আচ্ছা, সেটা দেখা যাবে। এখন শোনা যাক, কীভাবে এগোতে চাও; আর সেজন্যে ওর স্ট্যাণ্ডার্ডের একজন... মানে...'

খুক করে কেশে লজ্জা ঢাকল সোহেল। মানে খুঁজছে বুড়ো! কারও সামনে কিছুতেই প্রশংসা করবে না!

'আমার ধারণা, ব্যাপারটা সাগরে ঘটছে, সার,' বলল রানা। 'কী যেন করছে সংঘবদ্ধ একটা দল। বিরাট কিছু। এদের মোকাবিলা করতে হলে একটা জাহাজ আর নিজস্ব ক্রু লাগবে আমার। সেই জাহাজের ক্রু ও লজিস্টিকস ম্যানেজ করার জন্যে সোহেলকে দরকার। দক্ষিণ চিন সাগর থেকে আমার পরিচিত এক কার্গোশিপ টাইকুনের বেশ কয়েকটা জাহাজ খোয়া গেছে। যোগাযোগ করলে হয়তো তার সাহায্য পাব আমরা।'

রাহাত খান চুরুট ধরালেন। এয়ারকুল্ড ঘরে ঘামছেন। 'আমি আবিদ খন্দকার আর জয়নাল পাটোয়ারিকে জাকার্তায় পাঠিয়েছিলাম। ওরা তিনদিন আগে খুন হয়ে গেছে, রানা।' কথাটা নালিশের মত শোনাল রানার কাছে।

থমকে গেল রানা। হাসিখুশি ছেলে দুটো আর নেই?

মাথা নিচু করে বসে আছে সোহেল। একই কথা ভাবছে দুই বন্ধু, '*আমরা এই হত্যার প্রতিশোধ নেব। যারা ওদের প্রাণ নিয়েছে, নিজেদের প্রাণ দেবে*

তারা।'

একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আমরা এখন উঠি, সার? জাহাজের ব্যবস্থা হয়ে গেলে কাজে নেমে পড়ব।'

'জাহাজের ব্যবস্থা হয়েই আছে, ধরে নাও। পাপাগোপালার কথা মনে আছে তোমার? গ্রিসের সবচেয়ে বড় শিপইয়ার্ডের মালিক, চ্যাপ্রো পাপাগোপালা। কার্গো ও প্যাসেঞ্জার শিপ মিলিয়ে দেড় হাজার জাহাজের বহর আছে ওর। বিরাট ব্যাপার। আমি বললে ও সাধ্যমত সাহায্য করবে। তুমি এথেন্সে চ্যাপ্রোর সঙ্গে দেখা করে কেমন জাহাজ দরকার ওকে বুঝিয়ে বলবে। ঠিক আছে? এবার...' ইন-ট্রে থেকে একটা ফাইল টেনে নিলেন বৃদ্ধ।

দুই বন্ধু নিঃশব্দে চেয়ার ছাড়ল, বাঘের খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে গেল পা টিপে। বাঘের ঠোঁটের সস্নেহ হাসিটা দেখতে পেল না।

দু'দিন পর এথেন্স এয়ারপোর্টে নেমে ট্যাক্সি নিল রানা। ইন্টারকনে রুম বুক করাই ছিল, রেজিস্টারে সই করে ব্যাগ-ব্যাগেজ এগারো তলায় ওর কামরায় পাঠিয়ে দিয়ে জুপিটার রোডে চলে এল। একটা বহুতল বিল্ডিঙের সামনে থামল ট্যাক্সি। দু'জন ইউনিফর্মড় গার্ড রানার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল, তারা ওকে ক্যাপসুল লিফটে তুলে দিল। ওটা আড়াই মিনিটে বিরাশি তলায় উঠে গেল। দরজা খুলে যেতে প্রকাণ্ড একটা কামরায় ঢুকল ও।

চ্যাপ্রো পাপাগোপালা একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন। রানা শুনেছে, পায়ে সমস্যা থাকায় গ্রিক আর্মি যুদ্ধে নেয়নি তাকে । জেদ করে একাই জার্মান বাহিনীর সঙ্গে যথাসাধ্য লড়াই করেছেন।

ওর প্রতীক্ষায় ছিলেন তিনি, চেয়ার ছেড়ে টেবিল ঘুরে এগিয়ে এসে ওর হাত ধরলেন। 'ওয়েলকাম, সান! এসো,' রানাকে পাকড়ে নিয়ে সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। একটা গদিমোড়া চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'প্রথমেই শোনা যাক আমাদের চির-নবীন মেজর খানের কথা। থুড়ি, মেজর তো নয়—মেজর জেনারেল। কেমন আছেন তিনি?'

'ভাল, সার,' বলল রানা। 'তিনি আপনাকে আন্তরিক রিগার্ডস জানিয়েছেন।'

'না-না-না! ওঁর আবার অন্তর আছে নাকি? খালি লেফট-রাইট লেফট-রাইট, অ্যাটেনশন! আর আছে হুকুম ঝাড়া! এখনও আগের মতই আছেন তো?'

হাসল রানা। বলল, 'এক্কেবারে!'

হেসে উঠলেন পাপাগোপালা।

মানুষটা তিনি মাঝারি আকৃতির, বেশ মোটাসোটা, দেখে বোঝা যায় শরীরে প্রচণ্ড শক্তি রাখেন। কাঁধ দুটো অতি চওড়া, বুক ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে। লোমশ, পেশিবহুল হাত দুটো লক্ষ করবার মতই। ওর হাত যখন চেপে ধরেছিলেন, রানার মনে হয়েছিল আরেকটু চাপ দিলেই আঙুলের সবকটা হাড় পাট-কাঠির মত মট্ মট্ করে ভেঙে যাবে।

ও শুনেছে, ইনি প্রিস্ট হতে গিয়েছিলেন। তা আর হয়ে ওঠেনি। যুদ্ধের পর পাঁচ হাজার টনের একটা গ্রিক কার্গোশিপ কেনেন, শুরু হয় ব্যবসা। ওঁর আর

ফিরে তাকাতে হয়নি। এখন তিনি গ্রিসের প্রথম সারির ধনীদের অন্যতম। ছোট-বড় মিলিয়ে তাঁর অন্তত দেড় হাজার জাহাজ ও পঁচিশটা সুপারট্যাঙ্কার আছে।

রানার জন্য কফি ও স্ন্যাকসের অর্ডার দিয়ে নিজের চেয়ারে বসলেন বৃদ্ধ, টেবিলে কনুই রেখে চিবুক রাখলেন দুই হাতের তালুর উপর। খানিকটা ঝুঁকে এলেন সামনে।

'এবার বলো তো, বাবা, ঠিক কী চাও তুমি, আর কেন।'

সব খুলে বলল রানা। চুপচাপ শুনলেন কোটিপতি। বেয়ারা এসে কফি ও কেক-বিস্কিট রেখে বেরিয়ে যাওয়ার পরেও চুপ করে থাকলেন। বিশ মিনিট পর রানার বক্তব্য শেষ হতে মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'তোমার কথা শুনতে শুনতে আমি আমার প্রথম যৌবনে ফিরে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল শুনছি, মেজর রাহাতের আক্রমণের প্ল্যান।' মস্ত মাথাটা ঝাঁকালেন পাপাগোপালা। 'ঠিক কী ধরনের আর কত বড় জাহাজ দরকার তোমার?'

'অত্যাধুনিক, দ্রুতগামী, মাঝারি আকার, আক্রান্ত হলে পাল্টা আক্রমণ করার উপযোগী। পঁচিশ-তিরিশজন ক্রু নিয়েই যেটা চালানো যায়।'

হাসি ফুটল বৃদ্ধের মুখে।

'ঠিক এমনি একটা জাহাজ তৈরি করিয়েছিলাম আমি আমার নিজের জন্যে। চলো, দেখা যাক, তোমার পছন্দ হয় কিনা।'

ধবধবে সাদা মস্ত লিমাযিনে চড়ে জাহাজ দেখতে গেল রানা পাপাগোপালার সঙ্গে। দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস। ঠিক যেমনটি চেয়েছিল রানা। জাহাজটা একপাক ঘুরে দেখে সবকটা দাঁত বেরিয়ে পড়ল ওর।

রানার পছন্দ হয়েছে টের পেয়ে জাহাজের প্রতিটি বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন বৃদ্ধ। তারপর জানতে চাইলেন, 'ঠিক কবে কোথায় জাহাজটা বুঝে নিতে চাও, রানা?'

'ঠিক দেড় মাস পর। নেপলসে। সম্ভব?'

মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। সম্ভব।

তারপর ডেকের রেলিং ধরে সাগরের দিকে চোখ রেখে নিজের সমস্যার কথা জানালেন ওকে।

'আমার ট্যাঙ্কারগুলো একের পর এক উধাও হয়ে যাচ্ছে, রানা। সাগরের বুক থেকে। গত চারমাসে ছয়টা গেছে। ক্রুদের কেউ আর ফিরছে না। ছেলেদের লাশও কোথাও পাওয়া যায়নি।'

'আমার এক জাপানি বন্ধুরও গেছে কয়েকটা জাহাজ,' বলল রানা। 'কানাঘুষা চলছে, একদল দুর্ধর্ষ জলদস্যু নাকি চিন সাগর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এমনও হতে পারে: একই দল গায়েব করছে মানুষ ও জাহাজ।'

'অথচ কোনও দেশের নেভি এদের ধরতে পারছে না।' ডেক চেয়ারে বসে পড়লেন পাপাগোপালা। 'বুড়ো হয়ে গেছি, রানা। না হলে লোকজন নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম সাগরে। একহাত দেখে নিতাম শয়তানের বাচ্চাদের।' মাথা নিচু করে বললেন, 'এভাবে চলতে থাকলে শীঘ্রি আমার তৃতীয় হার্ট অ্যাটাকটা হয়ে যাবে। ...যাক ওসব কথা। তুমি তো ওদিকেই যাচ্ছ, তা-ই না, রানা?'

'আমি চোখ-কান খোলা রাখব, সার।'

'তা হলে ঠিকই দেখতে পাবে ওদের,' মৃদুকণ্ঠে বললেন পাপাগোপালা। 'আর যদি দেখতে পাও, ওদের ওষুধই খাইয়ে দিয়ো ওদের! কিল দোয বাস্টার্ডস্, রানা। কিল দেম অল।'

রানা একটা হাত রাখল বৃদ্ধের বাহুতে। 'যদি ওদের ধরতে পারি, যা বললেন ঠিক তা-ই করব আমি, সার।'

'থ্যাঙ্কিউ, মাই সান।' হাসি ফুটল বৃদ্ধের কোঁচকানো গালে। 'আর একটা কথা: দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসে যদি আরও কোনও সফিস্টিকেটেড গ্যাজেটের প্রয়োজন হয়, বলতে দ্বিধা কোরো না। যত টাকা লাগুক, আমি খরচ করব। ঠিক আছে?'

হাত মেলাল দু'জন অসমবয়সী দুর্ধর্ষ যুবক।

ঠিক দেড় মাস পর সন্ধ্যার ফ্লাইটে নেপ্‌ল্‌স্-এ পৌঁছাল রানা, গগলের সঙ্গে যোগাযোগ করল।

কেবিনের দরজায় জোরে টোকা দিল কেউ।

একটু আগে অ্যাটাচড্ বাথরুমের কপার য্যাকুযি টাব ছেড়েছে রানা, দ্রুত হাতে সুতি ট্রাউজার্স ও ওপেন-নেক শার্ট পরে বেরিয়ে এল ও। 'কাম ইন।'

ভিতরে ঢুকল উর্বশী, দু'হাতে ক্লিপবোর্ড বুকে ধরে রেখেছে। রানার শার্টের বুক-খোলা দেখে চট্ করে চোখ সরিয়ে নিল, চোখ রাখল রানার নিষ্পলক চোখে।

রানার মনে হলো ওই দৃষ্টিতে নালিশ আছে। হাতের ইশারায় একটা চেয়ার দেখাল ও। 'বোসো।' উর্বশী বসতেই নিজের চেয়ারে বসল। 'হঠাৎ তলব কেন?'

'তলব? তোমাকে? কই?' শ্লেষের হাসি হাসল উর্বশী। 'উল্টো আমিই তো এসেছি! ...তবে একটু আগে যেন মনে হলো ফারা রাইনার তলব করেছে তোমাকে!'

'গুরুজনরা বলেছেন, কোনও সুন্দরী ডাকলে দেরি না করে ছুটে যাবে,' মিষ্টি একটু হাসল রানা, 'তাঁদের কথা তো আর ফেলা যায় না... যেমন তুমি একবার ডাকলেই আমি...'

'চাপাবাজ!' বিড়বিড় করল উর্বশী। 'তোমার তো একশোটা মেয়ের সাথে ভাব! কিন্তু বিয়ে করবে না!' ক্লিপবোর্ডে চোখ নামাল ও: 'মিস্টার গগল জানিয়েছেন আমরা তাইওয়ানিজ নৌ-বাহিনীর আওতার বাইরে চলে এসেছি। থাকল শুধু ওদের এয়ারফোর্সের সেরা ফাইটার-বম্বারগুলো।'

'ওরা কী করছে?'

'কমিউনিকেশন ইন্টারসেপ্ট করে জানা গেছে ওরা স্ক্র্যাম্বল করেনি। একটু পরে আমরা ওদেরও রেঞ্জের বাইরে চলে যাব।'

'গুড!' টেবিলে পড়ে থাকা সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিল রানা, একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'তা হলে আর কোনও সমস্যা নেই।'

'আছে। তোমার বন্ধু নাকিমুচি দু'দিন ধরে খুঁজছে তোমাকে।'

নাকিমুচি মাসিদা অক্সফোর্ডে রানার সঙ্গে লেখাপড়া করেছে। ও ছিল

ভার্সিটির সবচেয়ে ভদ্র ছেলে। একরাতে ক্যাম্পাসে একদল মস্তান ওকে ধরে, পিটিয়ে কেড়ে নেয় টাকা-পয়সা। রানা সে-সময় হোস্টেলে ফিরছিল। আর্তচিৎকার শুনে ছুটে যায় ও, নিজের প্রাণের পরোয়া না করে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাঁচ মস্তানের বিরুদ্ধে। প্রথম চোটে রানার ঘুসি-লাথি খেয়ে দু'জন পালায়। বাকি তিন মস্তান পরের সাত মিনিটে হাত-পা ভেঙে শুয়ে পড়ে মাটিতে। রানা ওদের হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। নিজের শরীর থেকেও ছোরার আঘাতে রক্ত গড়াচ্ছিল তখন রানার। এরপর মাসিদার সঙ্গে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে ওঠে। সব শুনে ওর বাবা হাবাগোবা নিকুচিও নিজে এসে রানার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।

নাকিমুচি মাসিদা ডক্টরেট শেষে পারিবারিক ব্যবসার হাল ধরেছে, অল্পদিনেই জাহাজ মালিকদের একটা বড় কনসোর্টিয়াম গড়ে তুলেছে।

'ওয়্যারলেসে যোগাযোগ করেছে নিশ্চয়ই?' বলল রানা। 'ওকে বলেছি আমাকে ফোনে পাবে না। ...কী বলেছে?'

'সোজা কথায় সাহায্য চেয়েছে। তার আরেকটা জাহাজ গেছে। "টায়ে-টায়ে"। এটাও কন্টেইনার শিপ।'

'আগেরগুলোর মত ওটাও উধাও? এবারও কোনও ক্রু ফেরেনি?'

'না।' উর্বশী চট করে ক্লিপবোর্ড দেখে নিল। 'জানিয়েছে, তার জাহাজগুলো জাপান-সাগরে যেভাবে উধাও হয়েছে, সেটার দূরত্ব হিসাব কষে মনে হয়, ডাকাতরা অন্তত চারটে ট্রলার কাজে লাগিয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় হামলা হয়েছে।'

'আক্রমণগুলো কীভাবে এসেছে, সেসব জানিয়েছে?'

'ডিটেইলস-এ? বলেছে যত দ্রুত সম্ভব জানাবে।'

'জানাক, আমরা আমাদের সাধ্যমত করব। এসব জাহাজে এরপরে আবার কখন হামলা হবে, তা বোঝার জন্যে অনিল একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করছে। ওটা শুধু মিস্টার পাপাগোপালার নয়, ওটা নাকিমুচিরও কাজে লাগবে। এদিকে সোহেলের সঙ্গে বসে একটা কাভার-স্টোরি বানাব আমি। এমন কিছু হতে হবে, যেটার লোভে জলদস্যুরা ধারেকাছে আসবে।'

'তারপর...' আর কিছু বলল না উর্বশী। 'অনিল বলেছে এদের পজিশন বের করা যাবে।'

অনিল জাহাজের ওয়েপন্স স্পেশালিস্ট হিসেবে কাজ করছে।

'হয়তো খানিকটা সময় লাগবে, কিন্তু আমরা ওদের ঠিকই পাব,' বলল রানা।

'মিস্টার গগলকে পজিশনটা জানালেই কোর্স সেট করে রওনা হয়ে যাবে,' চেয়ার ছাড়ল উর্বশী, দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল, 'একটু পর লাঞ্চ দেবে।'

সিগারেট শেষে আপার ডেক-এ বেরিয়ে এল রানা, জাহাজের চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখল। জাহাজের জ্যাকস্টাফে ঝুলছে আধময়লা একটা গ্রিসের পতাকা।

গোটা জাহাজে নানান ধরনের কারিগরি ফলানোয় এখন যে-কেউ দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসকে দেখে বলবে: বহু পুরনো—উচিত ছিল অনেক আগেই ওটা ডক-ইয়ার্ডে নিয়ে ভাঙা।

জাহাজটা দৈর্ঘ্যে পাঁচশো ষাট ফুট, চওড়ায় পঁচাত্তর ফুট। ওজন কমবেশি সাড়ে এগারো হাজার টন। জাহাজে তিনটে ক্রেন। সব ক'টা জং ধরা। তার মধ্যে দুটো কাজ করে, অন্যটা খামোকা বসে আছে। মরচে ধরা ডেক, তাতে জায়গায় জায়গায় নানান রং। দেখলে মনে হয় ডেকটা কতকাল রং করা হয়নি, কে জানে! রেইলিং বাঁকা হয়ে গেছে বাইরের দিকে। ভয় হয়, হাতের ধাক্কায় পড়ে যাবে পানিতে। কয়েকটা কার্গো হ্যাচের মুখ হাঁ হয়ে আছে। আশপাশে যে-কটা হ্যাচ দেখা গেল, সবগুলো সাগরের লোনা পানিতে নষ্ট হচ্ছে।

হুইল-হাউজের সামনে একগাদা ড্রাম। ড্রাম থেকে তেল চুইয়ে পড়ছে ডেকে। ওখানে ভাঙা উইঞ্চ থেকে শুরু করে টায়ার-ফাটা সাইকেলও পাওয়া যাবে। চারপাশ বিশ্রী রকমের নোংরা।

জাহাজের খোলে স্টিলের প্লেট দিয়ে নানান জায়গায় পট্টি মারা হয়েছে। যে-কেউ বুঝে নেবে, ওয়েল্ডিং না করলে এই মাল আর চলত না। জাহাজের গায়ে লেপ্টে আছে সবুজ পেইন্ট। দেখলে মনে হয় অনেক আগে নীল রং করা হয়েছিল, এখন সবুজকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

ইন্সপেক্টর, বন্দর-কর্মকর্তা বা পাইলটরা এই জাহাজে বেশিক্ষণ টিকবে না, তাড়াতাড়ি নেমে পড়বে। এত পুরনো, বাজে একটা জাহাজে কে থাকতে চায়। ভাল! খুবই ভাল!

মৃদু হাসল রানা।

হঠাৎ ঠং-ঠং করে একটা ঘণ্টি বেজে উঠল। বাংলাদেশ নেভির পাখোয়াজ বাবুর্চি জানিয়ে দিল, এবার আপনারা খেতে আসতে পারেন।

'চল্। তোর সঙ্গে কথা আছে।'

কানের কাছে সোহেলের কণ্ঠ শুনে ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'চল্। যাই।'

হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ শোনা গেল। শব্দটা জাহাজের ওয়াটার লাইনের কাছে।

রেইলিঙের পাশে চলে গেল ওরা, সাবধানে ঝুঁকে নীচে তাকাল। জাহাজের খোলে কয়েকটা স্পেশাল ট্যাঙ্ক আছে, ওগুলো প্রাণপণে পানি গিলছে। ওয়েক লাইন দেখল ওরা। কিছুক্ষণ পর জাহাজের নড়াচড়া ধীর হয়ে যাবে, মনে হবে হোল্ড ভারী মালে পূর্ণ। দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসের কোর্স একটু পাল্টে গেছে। গগল জাহাজ নিয়ে উত্তর-পুবে রওনা হয়েছে।

'তোকে বলতে এসেছিলাম, কোথায় খাপ পেতে অপেক্ষা করতে হবে সেটা খুঁজে বের করেছে অনিল,' সোহেল বলল, 'আমরা খুঁটিতে বাঁধা ছাগল হবো।'

রানা মাথা দোলাল। 'জলদস্যুরা মনে করবে ওরা বাঘ।'

কে বলবে এই জাহাজে আছে অত্যাধুনিক সব মারণাস্ত্র, সেইসঙ্গে আছে একদল হাইলি ট্রেইণ্ড কমাণ্ডো—যারা সবাই তৈরি থাকবে।

গগল পরদিন সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট গ্রিডে পৌঁছে গেল। নাকিমুচি এরইমধ্যে যোগাযোগ করেছে, জানিয়েছে শেষ কয়েকটা আক্রমণ কোথায় এবং কীভাবে হয়েছে। জানা গেছে ওর জাহাজগুলো থেকে আজ পর্যন্ত মাত্র তিনজন নাবিক বেঁচে ফিরেছে।

অনিল চ্যাটার্জি ও লিউ ফু-চুং আবহাওয়া, চাঁদের অবস্থান, জাহাজগুলোর আকৃতি, কার্গোর পরিমাণ, ক্রু-সংখ্যা ছাড়াও আরও এক ডজন ফ্যাক্টর নিয়ে কাজ করেছে। ওরা দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসকে যেখানে নিয়ে এসেছে, তাতে জলদস্যুদের আক্রমণ আসা উচিত।

ওরা জাপান সাগরে ফুকুওকার কাছে চলে এসেছে। গত একমাসে নাকিমুচি এখানে দুটো জাহাজ হারিয়েছে।

রানা ও সোহেলের কথায় অনিল ডেটা বেজে ঢুকে প্রচুর ভুয়া তথ্য ছড়িয়েছে। যে-কেউ একটু কষ্ট করলেই জানবে, এক নামকরা আমেরিকান লেখক দুনিয়া ঘুরতে বেরিয়েছেন এই জাহাজে। সত্যিই অ্যাডলি কাস্টার দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছেন, নতুন বইটা শেষ করছেন একটা সুপার-ট্যাঙ্কারে। কিন্তু তথ্য এখন বলছে, তিনি আছেন এই জাহাজে। তাঁকে কিডন্যাপ করলে অন্তত পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার মুক্তিপণ পাওয়া যাবে। যদিও এটা ওদের লাইন নয়, জলদস্যুদের লোভ না হওয়ার কোনও কারণ নেই।

সকাল থেকে ফু-চুঙের সঙ্গে কাজ করছে অনিল। এর ফলে ওরা আরও ভালভাবে ডেটা বেইস হ্যাক করতে পেরেছে। এখন কে বলবে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস আসলে দারুণ লোভনীয় একটা মার্চেন্ট শিপ নয়। কথা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, এই জাহাজের সেফ-এ আছে ওদের কোম্পানির স্যালারির কয়েক লাখ ডলার। আরও লেখা হয়েছে, জাহাজটা নিগাটা থেকে দামি টিম্বার আর ইলেকট্রনিক গুড্স্ নিয়ে আসছে।

রানা-সোহেল-অনিল-ফু-চুং-উর্বশী আন্দাজ করছে, নামকরা লেখক, সিন্দুক ভরা ডলার আর লোভনীয় কার্গো জলদস্যুদের টেনে আনবে।

সাগরে রক্তলাল সূর্য ডুবছে, বিদায় নেওয়ার আগে গাঢ় লালিমা ছড়িয়ে দিল মেঘে। বহুদূরে, সেই কামচাটকা পেনিনসুলায় একটা আগ্নেয়গিরি খেপে উঠেছে, দু'হাতে ছাই আকাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে। রক্তিম চাঁদ দিকচক্রবাল টপকাল, সেইসঙ্গে উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো ম্লান হয়ে গেল। শান্ত সাগর, তাতে চাঁদের হলুদ প্রতিচ্ছবি ভূতুড়ে দেখাচ্ছে।

রাত এগারোটায় কমাণ্ডোরা জাহাজের ব্যাটল স্টেশনে জমায়েত হলো।

ফারা রাইনার ওর দুই আর্দালি নিয়ে মেডিকেল বে-তে অপেক্ষা করছে—ওরা ক্রুদের সাধারণ কাটাছেঁড়া থেকে শুরু করে গুরুতর যে-কোনও জখমের জন্য তৈরি।

সন্ধ্যায় জাহাজের আর্মামেন্ট আরেকবার পরীক্ষা করা হয়েছে।

জার্মানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যেসব কে-বোট ব্যবহার করত, দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস ঠিক সেভাবেই আক্রমণ করতে সক্ষম। জাহাজের দু'পাশের খোল খানিকটা নেমে যাবে, বেরিয়ে আসবে কয়েকটা একশো বিশ এমএম কামান। অটো ক্যাননের ফায়ার কন্ট্রোল ও রেঞ্জিং সিস্টেম বসানো হয়েছে এম-ওয়ানএওয়ান অ্যাব্রাম্স্ ট্যাঙ্কেব অনুসরণে।

জাহাজে আরও আছে তিনটে বিশ এমএম রেইডার-কন্ট্রোল্ড মালটি-ব্যারেল গ্যাটলিং গান। ওগুলোর প্রতিটি এক মিনিটে তিন হাজার রাউণ্ড গোলা-বর্ষণ

করতে পারে। গ্যাটলিং সাধারণত মিসাইল ঠেকাতে ব্যবহৃত হয়, তবে ওটা বিমানও ফেলে। এই জাহাজের গ্যাটলিং গান আরেকটা কাজে সক্ষম—শত্রু জাহাজের যে-কোনও দিকে গুলিবর্ষণ করতে পারে, ফলে জাহাজের খোল ঝাঁঝরা করা যায়। গ্যাটলিং গানের আক্রমণে যে-কোনও মাঝারি জাহাজ দু'মিনিটে ডুবে যাবে।

এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটা লুকানো মেশিনগান। ওগুলোতে আছে থারমাল-আইআর সাইট। গানার ইচ্ছে করলেই অপারেশন্স সেন্টারে বসে ভিডিও ডিসপ্লে দেখে টার্গেট নির্ধারণ করতে পারবে।

সামনের একটা হ্যাচ সরিয়ে দিলে চারটে ফ্রেঞ্চ শিপ টু শিপ এক্সোসেট মিসাইল লঞ্চ করা যাবে। আরেকটু দূরে রয়েছে আরেকটা হ্যাচ, ওটা লুকিয়ে রেখেছে দুটো রাশান ল্যাণ্ড অ্যাটাক ক্রুজ মিসাইল। ওগুলো অনিল ইণ্ডিয়ান আর্মির কাছ থেকে যোগাড় করেছে। জাহাজে আরও আছে দুটো টিউব সহ মার্ক-৪৮ অ্যাডক্যাপ টর্পেডো। চোরাই মার্কেটে ওগুলোর দাম আঠারো লাখ ডলার। গগল এক আমেরিকান ভাইস অ্যাডমিরালকে তেরো লাখ ডলার ঘুষ দিয়ে কিনেছে।

রানা ঠিক রাত সাড়ে এগারোটায় অপারেশন্স সেন্টারে ঢুকল। ব্যাটল-স্টেশনের লাল আলোয় সবাইকে অদ্ভুত লাগল। সবার সামনে ডিসপ্লে স্ক্রিন জ্বলছে।

সোহেল অপারেশন্স সেন্টারে অপেক্ষা করছে। সামনের বাল্কহেডে ওয়ার্ক-স্টেশনে বসেছে। পিছনে বসে আছে আতাসি ও উর্বশী।

আতাসি কমিউনিকেশন গিয়ারগুলো মনিটর করছে। উর্বশী রেইডার ও ওয়াটার-ফল সোনার ডিসপ্লে দেখছে। ওর ক্রুরা প্রস্তুত, জাহাজে কোথাও আগুন ধরলে নেভাবে।

একটু আগে ফু-চুং এসেছে। জাহাজে শত্রুদল উঠলে ট্যাকটিকাল ট্রুপ নিয়ে বাইরে গিয়ে লড়াই করবে ও।

জাহাজের ওয়েপন্স স্পেশালিস্ট অনিল অপেক্ষা করছে। ওর কাজ রিমোট কণ্ট্রোল্ড অস্ত্রগুলো চালানো। ওর আরেকটা কাজ ফায়ার অ্যাণ্ড ড্যামেজ কণ্ট্রোল নির্ধারণ করা। কাছেই ছোট্ট একটা দল অপেক্ষা করছে, তারা অনিলের অস্ত্রের গোলা ফুরিয়ে গেলে অ্যামো যোগান দেবে।

গগল ইঞ্জিন রুমের সঙ্গে কথা বলল। একটু পরে নিচু স্বরে বলল, 'বোর্ডে সব গ্রিন দেখাচ্ছে। মার্ভেলের প্রপালশন সিস্টেম ঠিকই আছে। ওভার।'

উর্বশী কিছুক্ষণ আগে সবাইকে সতর্ক করেছে। ত্রিশ মাইল দূরে একটা ট্রলার হঠাৎ করেই কোর্স পাল্টেছে। এখন ওটা মার্ভেলকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। কোনও কারণ ছাড়া তেল খরচ করবে না কেউ। জানতে হবে ওরা কী চায়।

কমাণ্ড-স্টেশনে নিজের চেয়ারে বসল রানা, একবার চারপাশ দেখে নিল। চ্যাণ্ড্রো পাপাগোপালা নিজের জন্য রাজকীয় চেয়ার বসিয়েছেন। মনে হয় টিভিতে স্টার-ট্রেক মুভি দেখতেন। জাহাজের কমাণ্ড রুমটা ঠিক আকাশযান এণ্টারপ্রাইজের কমাণ্ড রুমের অনুকরণে বানিয়েছেন। সামনে বিশাল একটা স্ক্রিন, ওটা দিয়ে বাইরের পরিস্থিতি দেখা যায়।

স্ক্রিন ছেড়ে রানার দিকে তাকাল না উর্বশী। 'কন্ট্যাক্ট ও-সেভেনটিন ডিগ্রি, রানা। সোজা আসছে আমাদের দিকে। গতি বিশ নট। দূরত্ব একুশ মাইল।' আর সবার মত কালো ব্যাটল ফেটিক পরেছে ও, কোমরে সিগ সাওয়ার অটোমেটিক পিস্তল।

ডিসপ্লে দেখল রানা। 'আর কিছু?'

'ওটার দৈর্ঘ্য সত্তর ফুট। ইঞ্জিন একটা মাত্র প্রপেলার চালায়। চার নটে চলছিল আমাদের দেখার আগে। ওটার কীল দেখে মনে হচ্ছে আগে মাছ-ধরা ট্রলার ছিল।'

'রেডিয়ো কিছু বলে, আতাসি?'

'ওদের কোনও কথা নেই, বস। তবে আমাদের গ্রিডের অনেকটা দূরে দুটো বাল্ক ক্যারিয়ার আলাপ করছে।'

মার্ভেলের হ্যাঙার বে-তে যোগাযোগ করল রানা। 'রানা স্পিকিং। পাইলটকে বলে রাখুন পাঁচ মিনিটের নোটিশে রবিনসন টেকঅফ করাতে হবে।' বাটন টিপে মার্ভেলের ওপেন চ্যানেলে কথা বলল ও, 'রানা স্পিকিং। আমরা সম্ভবত টার্গেট পাচ্ছি। মনে রাখবেন, ওদের দিয়ে কথা বলাতে চাই। রিপিট করছি, আমাদের বন্দি দরকার। তবে কেউ অতিরিক্ত ঝুঁকি নেবেন না। ওভার।'

আরেকবার চারপাশ দেখে নিল রানা। সবাই যার যার কাজ করছে। কারও চোখে-মুখে কোনও উত্তেজনা নেই। শীতল, প্রফেশনাল। ওরা অপেক্ষা করছে, পরের চালটা ওই দূরের ট্রলারের ক্রুরা সম্ভবত চালবে।

কিছুক্ষণ পর রানা বলল, 'গগল, গতি সামান্য বাড়াও। যেন ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে পালাতে চাও। ওরা ভাবুক, এত সহজ টার্গেটকে ছাড়া যায় না। ব্যালাস্ট পাম্প তৈরি রাখো, দরকার হলে যেন ওজন কমিয়ে সরে পড়তে পারি।'

'ওকে, রানা।'

আরও পনেরো মিনিট পর রানা জিজ্ঞেস করল, 'রেঞ্জ কত, উর্বশী?'

'দুই মাইল,' থমকে গেল উর্বশী, স্ক্রিনে কী যেন দেখল আবারও। 'আরেহ্! ওটা কী?' আর কিছুই বলছে না।

রানা বলল, 'আমাদের একটু শোনাও শুনি।'

ডিসপ্লে ছেড়ে রানার দিকে তাকাল উর্বশী। 'অবিশ্বাস্য! ট্রলারের নীচে সোনার কণ্ট্যাক্ট পাচ্ছি। ডেপ্থ্ সত্তর ফুট। ...ট্রলারের নীচে ওরা একটা সাবমেরিন লুকিয়ে রেখেছে!'

পাঁচ

উর্বশীর বক্তব্য চুপচাপ হজম করল রানা। পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে সবাই। শুধু অনিল বোমা ফাটাল, 'এইমাত্র ট্রলার মিসাইল ছুঁড়েছে! সাতচল্লিশ সেকেণ্ড পর ইমপ্যাক্ট! গ্যাটলিং লাইনে আনছি!'

এক সেকেণ্ড পর সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। ওরা জানে এরকম পরিস্থিতিতে কী করতে হবে। দেরি না করে রানা বলল, 'অনিল, আমার সিগনাল না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর্। আমাদের ওয়েপন্স রেডি রাখ্, আমরা পাল্টা হামলা করব। ডেপ্থ্ চার্জ তৈরি রাখ। ...গগল, পাম্প চালু করে ট্যাঙ্ক খালি করো। হয়তো আমাদের ইঞ্জিনের পুরো শক্তি লাগবে।'

'সাবটা চুপচাপ পড়ে আছে,' বলল উর্বশী। 'কোনও প্রপালশান নেই। আক্রমণ করবে বলে মনে হয় না।'

'অনিল, মিসাইল ইমপ্যাক্ট কখন?'

ডিসপ্লে দেখছে অনিল। 'আর তিরিশ সেকেণ্ড।'

অপেক্ষা করল রানা। টের পেল, মার্ভেলের ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক খালি হয়ে যাচ্ছে। ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইনামিক ইঞ্জিন কয়েক সেকেণ্ডে সর্বোচ্চ গতি তুলতে পারবে। জাহাজের দৈর্ঘ্য পেরোতে বড়জোর আড়াই সেকেণ্ড লাগবে। ওর পরিকল্পনা যদি কাজ না-ও করে, তবুও মিসাইল আঘাত হানবে না।

'সোনার?'

মাথা নাড়ল উর্বশী। 'আমি বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার আওয়াজ পাচ্ছি। অথচ সাবমেরিন ডুবছে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। সাবমেরিন এখনও কোনও বিপদ ঘটায়নি। আরও কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল ও। মিসাইলটা আরও কাছে আসুক, তারপর উড়িয়ে দেবে ওরা। এর ফলে জলদস্যুরা ধরে নেবে জাহাজে বিস্ফোরণ ঘটেছে। 'ঠিক আছে অনিল, ইমপ্যাক্ট দশ সেকেণ্ড বাকি থাকতে গ্যাটলিং চালু করিস। ...গগল, গতি কিছুটা কমাও। কিন্তু বললেই থ্রটল খুলে লাফ দিয়ে এগোবে।'

একটা ক্যামেরা বাইরের অবস্থা দেখাচ্ছে। অনিল মেইন স্ক্রিন দেখল। হঠাৎ অন্ধকারে কী যেন ঝিলিক দিয়ে ছুটে এল। ওটা সাগর-সমতলের বারো ফুট উঁচু দিয়ে আসছে। এত দ্রুত ছুটছে যে বোঝা যায় ওটার গতিবেগ ঘণ্টায় অন্তত এক হাজার মাইল। একটু বাঁকা পথে আসছে, লাগবে ঠিক মার্ভেলের স্টার্নে। জলদস্যুরা স্টিয়ারিং গিয়ার ও প্রপেলারে আঘাত হানতে চায়। জাহাজের গতি স্তব্ধ হলে খেলা দেখাবে তারা। জাহাজ লুটপাট করতে, বা কাউকে কিডন্যাপ করতে হলে বুদ্ধিটা ভাল।

অনিল এগারো সেকেণ্ড বাকি থাকতে গ্যাটলিঙের সেফটি ট্রিগার সরাল। ওটার ইলেকট্রনিক মগজ রেইডার সিস্টেমকে নির্দেশ দিল। মাইক্রোসেকেণ্ডের মধ্যেই হিসাব কষে বুঝে নিল মিসাইলের ট্র্যাজেকটোরি, উইণ্ডেজ, হিউমিডিটি ও আরও শতখানেক বিষয়।

মার্ভেলের মাস্টার রেইডার প্রথমেই ছুটন্ত মিসাইল ডিটেক্ট করেছে, সঙ্গে সঙ্গে দু'পাশের গান এমপ্লেসমেণ্ট নামিয়ে দিয়েছে। এবার গ্যাটলিং গান এইম করল। ওটার ইলেকট্রিক মোটর ছয় ব্যারেল ঘোরাল। কম্পিউটার ও রেইডার একইসঙ্গে বুঝে নিল ওদের সামনে একটা টার্গেট রয়েছে। মুহূর্তে একফুট দৈর্ঘ্যের বিশ-মিলিমিটার ইউরেনিয়াম শেলগুলো ব্রিচে ঢুকে গেল। পরমুহূর্তে তপ্ত রাউণ্ডগুলো মিসাইলের সঙ্গে দেখা করতে ছুটল।

গ্যাটলিং থেকে বিশ্রী আওয়াজ বের হলো, মনে হলো কোনও কারখানায় করাত চলছে। পাঁচ সেকেণ্ড বর্ষণ শেষে থামল ওটা। মিসাইল মার্ভেলের চল্লিশ গজ দূরে থাকতে গোলার দেয়ালে বাধা পেল। বিস্ফোরণটা সাগরে আগুন ছড়াল। মনে হলো মার্ভেলের একপাশে ছোট্ট একটা সূর্য উঠেছে। মিসাইলের টুকরোগুলো পানিতে অগভীর নালা তৈরি করল। অল্প কিছু ছিটকে এসে পড়ল জাহাজের গায়ে।

'গগল, মার্ভেলকে সাতানব্বুই ডিগ্রি ঘোরাও,' রানা বলল, 'লেফটেন্যান্ট আফতাবকে বলো আমরা একটা ধোঁয়ার আড়াল চাই। ...আতাসি, তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ইমার্জেন্সি ফ্রিকোয়েন্সিতে মে-ডে পাঠাবে। তবে রেডিয়োর পাওয়ার কমিয়ে রাখবে, শুধু যেন আমাদের বন্ধুরা শুনতে পায়।'

ইঞ্জিন রুমে যোগাযোগ করল গগল। 'মিস্টার অ্যাফট্যাভ, আমাদের একটা স্মোক স্ক্রিন দরকার। এমন কিছু হতে হবে, যেটা বলে দেবে আমরা শীঘ্রি ডুবছি।'

'আই-আই, সার, এক্ষুণি পেয়ে যাবেন,' বলল আফতাব। রানা ওকে বাংলাদেশ নেভি থেকে পিক করেছে।

উর্বশীর দিকে তাকাল রানা। 'সাবমেরিনটা কী করছে?'

'কিছুই না। সোনার চুপ। আমরা ঘুরে যাওয়ায় ওটা এখন আমাদের পেছনে আছে। কোনও যন্ত্রপাতি নড়ছে না। শুধু বাতাস ছাড়ার আওয়াজ পাচ্ছি।'

'ওটার আকৃতি কীরকম?'

'অদ্ভুত। লম্বায় একশো তিরিশ ফুট, চওড়ায় পঁয়ত্রিশ ফুট। খাটো আর মোটা, সাধারণত সাবমেরিন এরকম হয় না।'

'কম্পিউটার ওটার সঙ্গে কোনও সাবমেরিন মেলাতে পারছে না?'

'না। মন বলছে ওটা আগে থেকে ওখানে বসে আছে।'

'ঠিক আছে, একটা চোখ রেখো। পরে দেখব কী করা যায়। আমরা এখন ট্রলারের দিকে মনোযোগ দেব।' চুপ হয়ে গেল রানা।

আতাসি মে-ডে পাঠাল। দুর্দান্ত অভিনয় করল। যেন সত্যিই ভয়ংকর বিপদে পড়েছে। ওর কথা শুনে মনে হলো, বেচারা এইবার শেষই হয়ে গেল!

খসখসে স্বরে জবাব এল, 'মোটর ভেসেল দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস, আমরা ট্রলার শিরি-ফোর। মে-ডে কেন পাঠাচ্ছ জানাও। তোমাদের সমস্যা কী?' ট্রলারের ট্র্যান্সমিশন দুর্বল ভাবে শোনা গেল। ওরা সম্ভবত লো পাওয়ারে জবাব দিচ্ছে। উচ্চারণ শুনে বোঝা গেল না কোন্ দেশি লোক।

'শিরি-ফোর, দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস থেকে বলছি। আমাদের স্টিয়ারিং গিয়ারে বিস্ফোরণ ঘটেছে। হেলম একদম কাজ করছে না। আমরা স্রোতে ভেসে যাচ্ছি। আরও কী ক্ষতি যে হয়েছে...'

'মার্ভেল, শিরি-ফোর বলছি। আমরা ছয় মাইল দূরে আছি। ম্যাক্সিমাম স্পিডে আসছি। অপেক্ষা করো।'

'হুঁ!' বিড়বিড় করল আতাসি। মাইকে বলল, 'ধন্যবাদ, শিরি-ফোর। ভাগ্যিস আপনারা কাছে আছেন। আল্লাহ্ মেহেরবান! আমরা স্টার-বোর্ডে সিঁড়ি নামাচ্ছি।

দয়া করে সঙ্গে ফায়ার-ফাইটিং ইকুইপমেন্ট নিয়ে আসবেন।'

'শিরি-ফোর টু দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস। ঠিক আছে। আউট!'

মাইক রেখে দিল আতাসি।

রানা বলল, 'তা হলে শুরু হলো।'

'আমরা চললাম,' উঠে দাঁড়াল ফু-চুং। ট্যাকটিকাল ট্রুপ নিয়ে বাইরে গিয়ে লড়াই করবে।

এলিভেটরে চড়ে পাঁচ সঙ্গী নিয়ে সুপারস্ট্রাকচারের প্যাসেজ-ওয়েতে চলে এল ও। কালো ফেটিগের কারণে ওদের ভূতের মত দেখাল। সবাই ফেটিগের তলায় কেভলার আর্মার পরেছে। চোখে থার্ড জেনারেশন চিনা নাইট ভিশন ভাইজর। প্রত্যেকের সঙ্গে একটা করে সাউণ্ড-সাপ্রেসড় এমপি-ফাইভ মেশিন-পিস্তল আর সিগ সাউয়ার অটোমেটিক। আর্মারি থেকে কম ক্ষমতাশালী বুলেট নিয়েছে ওরা। বুলেটগুলো যে-কাউকে আহত করবে, কিন্তু দেহ ছিন্নভিন্ন করবে না। ওদের কোমরে ঝুলছে ফ্ল্যাশ-ব্যাঙ গ্রেনেড, সঙ্গে দশ মিনিট লড়াই করবার মত স্পেয়ার ম্যাগাজিন।

ফু-চুং আগেই আলাপ সেরে রেখেছে, সবার আগে থাকবে ও। দুটো ভেস্ট পরেছে। ডাকাতরা গুলি করতে করতে উঠে এলে খানিকটা সময় পাবে। হয়তো সরে যেতে পারবে। নিজেকে মুলোর মত ঝোলাবে ও, জাহাজে যত বেশি পারে শত্রু তুলবে। তারা ডেক-এ উঠে এলে ওর সঙ্গীরা গুলি শুরু করবে। ওর কাছে একটা সিগনাল পিস্তলও আছে, ওটা রেখেছে পিঠে ঝোলানো ছোট্ট ব্যাগে। প্রয়োজনে ডাকাতদের সিগনাল দিয়ে টেনে আনবে।

জলদস্যুরা একটু পরে পৌঁছে যাবে। এইমাত্র স্টার-বোর্ডের পাশে সাগরে সিঁড়ি নামানো হলো।

ইয়ারফোনে রানার কথা শুনতে পেল ওরা।

'স্ক্রিনে তোমাদের দেখতে পাচ্ছি। আমি হলে অন্তত আটজন নিয়ে জাহাজে উঠতাম। ব্রিজের জন্যে দু'জন, ইঞ্জিন রুমের জন্যে দু'জন, আর চারজন চারপাশে নজর রাখবে। আতাসি বলেছে আমরা জাহাজে পঞ্চাশজন আছি।' একটু থেমে বলল, 'ফু-চুং, তুই কী আরও কয়েকজন সঙ্গে নিবি?'

'লাগবে না। তুই আসতে চাস নাকি?'

'সোহেলও।'

'উঁহুঁ। দরকার পড়বে না। আমরা তৈরি। ডেক-এর মেশিনগানগুলো কাজ করলে আর সমস্যা হবে না। আমরা শুধু অফিসারদের ধরব।'

'যোগাযোগ রাখবি। ওদের দেখলেই জানাবি।'

অপারেশন্স টিম অপেক্ষায় থাকল।

কিছুক্ষণ পর ট্রলারটা দেখা গেল। মার্ভেলের একটা ক্রেনের মাথায় বসে আছে ক্যামেরা, সেটার মাধ্যমে দেখা গেল। আগে দু'চারজন নাবিক জলদস্যুদের হাত থেকে বেঁচে ফিরেছে, তাদের বর্ণনা মিলে গেল। ট্রলারটা দৈর্ঘ্যে বড় জোর পঁচাত্তর ফুট। বো-টা ভোঁতা। পিছনে অনেকখানি খোলা ডেক, তারপর লম্বা একটা A-ফ্রেম ডেরিক। পাইলট-হাউজের পিছনে মস্ত একটা কার্গো কন্টেইনার

বেঁধে রেখেছে। দেখলে মনে হয় ট্রলারের বয়স হয়েছে, বলা যায় ওটা মার্ভেলের আপন ছোট ভাই।

ফু-চুং রানার কণ্ঠ শুনল, 'ওরা আমাদের মতই বুদ্ধি খেলিয়েছে। ওই মাল অত পুরনো না।'

'ওরা আমাদের স্টার-বোর্ডের বিশ গজ দূরে,' বলল ফু-চুং। 'ডেক-এ বারো-চোদ্দজন। বেশির ভাগ হাফ-প্যান্ট আর জিন্স পরা। মনে হচ্ছে সবার হাতে কোনও না কোনও ইকুইপমেন্ট আছে। আন্দাজ করছি, ওগুলো দিয়ে অস্ত্র ঢেকে রেখেছে।'

'আফতাব,' ডাকল রানা, 'ধোঁয়া দেয়া বন্ধ করো।'

মার্ভেল এখনও অল্প-স্বল্প সামনে এগোচ্ছে। ঘন ধোঁয়া ডেক-এ পাক খাচ্ছে। ওগুলো বিপদে ফেলে দিতে পারে। নাইট ভিশন ভাইজর দিয়ে চারপাশ দেখা কঠিন হবে। অনিলের সঙ্গীরা হয়তো মেশিনগানগুলো ব্যবহার করতে পারবে না।

আধমিনিট পর এক 'জেলে' বুল-হর্ন মুখে তুলল।

ফু-চুং অপেক্ষা করছিল, এবার ধোঁয়া আর ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে গ্যাঙওয়েয়র মুখে চলে এল, সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল—এক ফোঁটা ঘাম ওর গলা বেয়ে বুকে পড়ল, সরসর করে নেমে গেল পেট বেয়ে। ওর কণ্ঠে ভয় আর নিশ্চিন্তি ফুটে উঠল, 'এসেছেন বলে অনেক ধন্যবাদ!' খেয়াল করল ধোঁয়ার চাদর পাতলা হচ্ছে। 'আমরা আগুনটা নেভাতে পেরেছি, কিন্তু স্টিয়ারিং গিয়ারে কী যেন হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না।'

লোকটার কথায় টিটকারির সুর বাজল, 'আমরা সাহায্য করতে পারব।'

মার্ভেল ও শিরি-ফোর পাশাপাশি হলো। ট্রলারের খালাসিরা মার্ভেলের গ্যাংওয়েয়র সঙ্গে শিকল আটকাল, দু'জাহাজে দড়ি বেঁধে দিল। দুই জলদস্যু সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, ফু-চুং মনে মনে বলল, গুলি করলে এখনই করবে। টানটান উত্তেজনায় অপেক্ষা করল ও। ওর পিস্তল আগেই হোলস্টার ছেড়েছে, ওটা এখন কোমরের আড়ালে ধরেছে।

পরের কয়েক সেকেণ্ডে কয়েকটা ঘটনা ঘটল। হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল ট্রলারের সার্চ-লাইটগুলো। উজ্জ্বল সাদা আলোয় মার্ভেলের চারপাশ জ্বলজ্বল করল। ক্রুরা মুহূর্তে নাইট ভিশনের সুবিধা হারাল। প্রথম জলদস্যু ডেক-এ উঠবার আগেই এক ঝটকায় পিস্তল বের করল। সে পরপর দু'বার ফু-চুঙের বুকে গুলি করল, হাতের ইশারায় সঙ্গীকে আসতে বলল। দু'জন ছুটে গেল গ্যাংওয়ে ধরে, বিকট চিৎকার ছাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পাইলট-হাউজ ছেড়ে বেরিয়ে এল বারো-চোদ্দজন, দৌড়ে এসে সিঁড়ি টপকাল।

ফু-চুঙের মনে হলো বিরাট কোনও হাতুড়ি ওর বুক ভেঙে দিয়েছে। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেছে ও, শরীর অবশ হয়ে গেল। পিস্তলটা পড়ে যেতে শুনল ও। অবাক হয়ে ভাবল, ওটা হাত থেকে পড়ে গেল কেন?

ফু-চুঙের দলের কেউ নড়বার আগেই আরও চার দস্যু ডেক-এ উঠে এল। এবার কমাণ্ডোরা গোপন জায়গা থেকে গুলি করল। দস্যুদের সামনের দু'জন গুলি খেয়ে পড়ে গেল। কিন্তু তাদের জায়গা নিল আরও পাঁচজন, এরা লাফিয়ে ডেক-এ

উঠল। গুলির মুখে পড়ে মুহূর্তের জন্য তারা বেসামাল হলো, এক সেকেণ্ড পর উন্মাদের মত লড়াই করতে চাইল। পরের কয়েক সেকেণ্ডে পাঁচ কমাণ্ডোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল পাঁচগুণ দস্যু। প্রতিটি ক্ষণ যেন অস্বাভাবিক ধীর হয়ে গেল। লেজার সাইটের লাল বিমগুলো ধোঁয়ার মধ্যে অন্ধকার কাটাকাটি করল, শত্রুদের খুঁজল। মনে হলো সবাই মিলে পাগলামি করছে।

এদিকে ট্রলারের সার্চ-লাইট জ্বলে ওঠায় মার্ভেলের অপারেশন্স সেন্টারের স্ক্রিন ধবধবে সাদা হয়ে গেল। রানা চট্ করে বুঝে গেল জলদস্যুরা কী করতে চায়। আমেরিকা ইরাকে দ্বিতীয়বার হামলা করবার সময় এই কৌশল করেছিল—প্রথম কিছুক্ষণ চারপাশে গোলমাল তৈরি করো, শত্রুকে দ্বিধায় ফেলে দাও, ওরা পালাবে। এর ফলে যুদ্ধে জেতা অনেক সহজ হবে।

সাধারণ কোনও মার্চেন্ট ভেসেল-এ সবাই হঠাৎ উজ্জ্বল আলো দেখে থমকে যাবে, সেইসঙ্গে হইচই-চিৎকার-গুলির আওয়াজ তো আছেই—একদল মারকুটে লোক হঠাৎ আক্রমণ করলে থতমত খাওয়ারই কথা, কেউ বুদ্ধি করে মে-ডে পাঠাবে না।

কৌশলটা নিরস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে কাজে লাগে।

ফু-চুংরা নাইট ভাইজরের সুবিধা পাচ্ছিল, কিন্তু ওগুলো এখন মূল্যহীন। ডেকে এখনও ধোঁয়া পাক খাচ্ছে। তার উপর উজ্জ্বল সার্চ-লাইটগুলো চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। এই অবস্থায় ইনফ্রারেড সিস্টেম কোনও সুবিধা দেবে না। মেশিনগানাররা অনেক দূরে অপেক্ষা করছে, ওরা এখন কিছুই করতে পারবে না।

লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা, সামনের একটা বাল্কহেড হাতড়ে নাইট ভিশন গগল্‌স্ তুলে নিল। চট্ করে একবার দেখে নিল, কেউ খেয়াল করছে না। একটা এমপি-ফাইভ নিয়ে কোমরে গুঁজল ও, চলে এল এলিভেটরের সামনে, বাটন টিপে ভিতরে ঢুকে বলল, 'আমি ব্রিজে পৌঁছে গেলে এলিভেটর বন্ধ করতে হবে। ...সোহেল, তোরা এদিকটা দেখ্!'

এলিভেটর পাঁচতলা উঠতে ষোলো সেকেণ্ড লাগাল। তুমুল গোলাগুলির আওয়াজ শুনল রানা। ছেলেরা লড়াই করছে, কিন্তু ওদের হারতে হবে। শত্রু অনেক বেশি। উইং ব্রিজে বেরিয়ে এসে নীচে তাকাল ও। অন্তত বিশজন দস্যু মার্ভেলের সামনের ডেকে অবস্থান নিয়েছে। আড়াল পেয়ে গেছে তারা, সুপারস্ট্রাকচার লক্ষ্য করে গুলি করছে।

গ্যাংওয়ের মুখে কে যেন ক্রল করছে, খেয়াল করল রানা। ওয়ালথার তুলেও থেমে গেল ও, ওটা ফু-চুং। ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। হঠাৎ এক জলদস্যু একটা উইঞ্চের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল, ফু-চুঙের মাথা লক্ষ্য করে একে-ফরটিসেভেন তুলল।

সময় নষ্ট না করে গুলি করল রানা। লোকটার রক্তাক্ত মুখটা উধাও হলো। আরেক লোকের বুকে পরপর দু'বার গুলি করল ও। এবার গুলির তোড়ে রেইলিঙের আড়ালে বসে পড়তে হলো ওকে। বুলেট মাথার উপর দিয়ে ভীমরুলের মত গুঞ্জন তুলে চলেছে, ঠকাঠক লাগছে স্টিলের প্লেটে। ওয়ালথার রেখে সিলেক্টর টিপে এমপি-ফাইভটা অটোতে নিয়ে এল রানা, রেইলিঙের উপর

দিয়ে ব্যারেল বের করে গুলি করল। মুহূর্তে পনেরোটা গুলি ডেকে গিয়ে আছড়ে পড়ল। শত্রুদের লুকিয়ে পড়বার সুযোগটা নিল রানা, উঠে দাঁড়িয়ে সিলেক্টর সিঙ্গেল বুলেটে এনে ট্রলারের সার্চ লাইট লক্ষ্য করে গুলি করল।

পরপর দু'বার মিস করল ও, এবার শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে আবারও দু'বার গুলি করল। সার্চ-লাইটগুলো বিস্ফোরিত হলো। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচ। নামল গাঢ় অন্ধকার।

সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগানের খ্যাটখ্যাট-খ্যাটখ্যাট আওয়াজ উঠল। জলদস্যুদের দিকে .৩০ ক্যালিবারের বুলেট ছুটে গেল। গুলির খোসা ইজেক্ট হচ্ছে, ডেকে গিয়ে খটাখট পড়ছে। মেশিনগানাররা তাদের কাজ শুরু করেছে।

মেশিন-পিস্তলের ম্যাগাজিন পাল্টে নিল রানা, গগল্‌স্‌ পরে নিল। চারপাশে বিদ্‌ঘুটে সবুজ আলো। বুলেটের ঝিলিক দেখে মনে হয় ওগুলো আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া কোনও বোকা পতঙ্গ। মানুষ যেন সবজেটে কোনও ভূত। ফু-চুঙের দিকে খেয়াল দিল রানা।

ও খোলা জায়গায় পড়ে আছে, এত ধীরে নড়ছে যে মনে হলো আহত হয়েছে। তবে পিছনে রক্তের ধারা রেখে আসেনি। ভেস্ট ওকে বাঁচিয়েছে। অভিজ্ঞতা বলে, ভেস্ট পরলেও বুলেট প্রচণ্ড আঘাত হানে। অন্তত একঘণ্টা ভাল ভাবে শ্বাস নিতে পারবে না ফু-চুং। কয়েক মিনিট পার হলো। এক জলদস্যু বেরিয়ে এসেছে, রানার গুলি কানের পাশ দিয়ে যাওয়ায় লুকিয়ে পড়ল। তিলতিল করে ক্রল করছে ফু-চুং, হ্যাচওয়েতে পৌঁছে গেল। দুটো হাত সুপারস্ট্রাকচারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল, ওকে টেনে নিল।

করডাইটের ঝাঁঝাল গন্ধে শ্বাস আটকে যায়। বুলেটের ধোঁয়া ইংল্যাণ্ডের কুয়াশার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ফু-চুং সরে যাওয়ায় রানা টার্গেটের দিকে মন দিতে পারল। ওদের পাঁচ কমাণ্ডো এখন ভাইজর দিয়ে দেখতে পাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল ওদের দিকে ঝুঁকল।

রানা উপর থেকে দেখছে। বন্দি পাওয়ার আশা ছাড়তে হলো। ডেকে রক্তের স্রোত বইছে। ফু-চুঙের ছেলেরা খেপে গেছে। সম্ভবত ওদের কেউ আহত হয়েছে। ওদের দিকে দৌড়ে এগিয়ে গেল তিন জলদস্যু। সামনে ক্রেন পেয়ে আড়াল নিল এরা। একজন ন্যাপস্যাক থেকে কী যেন বের করল। ওটা স্যাচেল চার্জ! লোকটা নড়বার আগেই ওর মাথায় গুলি করল রানা। লাশটা ধুপ করে পড়ল, বুকের তলায় আটকা পড়ল স্যাচেল চার্জ।

অন্য দু'জন সুপারস্ট্রাকচারের দিকে দৌড় দিল। রানা মেশিন-পিস্তল তুলল, কিন্তু মেশিনগানার দেখেছে, সে-ই আগে গুলি করল। পেটে গুলি খেল লোক দুটো, প্রায় দু'টুকরো হয়ে গেল।

দৃশ্যটা ভয়ঙ্কর। জলদস্যুদের মন দমে গেল। ছুটল ওরা গ্যাংওয়ে ধরে। এখন আর লড়াই চায় না তারা, বাঁচতে চায়। কিন্তু কমাণ্ডোরা সুপারস্ট্রাকচার থেকে গুলি করছে। একটু আগে চুপচাপ ছিল ওরা, এমন ভান করেছে—যেন ওরা ওখানে নেই। ডাকাতরা ফাঁদে পড়েছে। তাদের তিনজন গুলি-বর্ষণে ছিটকে গিয়ে ডেকে পড়ল। আগেই মারা গেছে।

শিরি-ফোরের বিরাট ডিজেল ইঞ্জিন গর্জে উঠল। ট্রলারটা মার্ভেলের কাছ থেকে সরে যেতে চাইল। যারা ওখানে আছে, তারা নিজেদের জান বাঁচানোর চিন্তা করছে। মেশিন-পিস্তল দিয়ে ট্রলারের ডেকে গুলি করল রানা। কাউকে দেখা গেল না। সামনে কোনও টার্গেট নেই।

ট্রলারের শিকল মার্ভেলের গ্যাংওয়ের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। জোরে টান খেয়ে ট্রয়ের মাউন্ট উপড়ে এল। দড়িগুলো ছিঁড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সরল ট্রলার। মার্ভেলের গ্যাঙওয়ে ব্রিজের মত ওটার ডেকে বসে আছে। সিঁড়িটার ওজন আঠারোশো পাউণ্ড, ওটা খসে পড়ল সাগরে। যারা সিঁড়িতে ছিল পানিতে পড়ল তারা। সাঁতরে ভেসে উঠল। কিন্তু একমুহূর্তের জন্য। ট্রলারের টানাটানিতে দুলছে মার্ভেল, লোকগুলোর উপরে চেপে বসল। মুহূর্তে চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে গেল তারা।

মার্ভেলে যারা এখনও রয়ে গেছে, শিরি-ফোর তাদের পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিল, কাঁপতে কাঁপতে দিক পাল্টাল ট্রলার। গগল অপারেশন্স সেন্টারে দাঁড়িয়ে দেখছে, ও ম্যানুভারটা চিনল। দেরি না করে মার্ভেলকে খানিকটা গতি দিল, জাহাজটা পোর্টে সরিয়ে নিল।

জলদস্যুরা রেইলিং টপকে পালাচ্ছে। তাদের একজন শিরি-ফোরের প্রধান উইঞ্চে পড়ল। রানা উপরের উইং ব্রিজে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট শুনতে পেল, লোকটার হাড়গোড় সব মটমট করে চুরমার হলো। দেহটা পুতুলের মত নীচের ডেকে গিয়ে পড়ল। আরেক লোক ট্রলারের হাল-এর গুঁতো খেয়ে সাগরে পড়ল। তাকে আর দ্বিতীয়বার দেখা গেল না। বাকি ছয়জন দুই জাহাজের মাঝখানের সরু জায়গাটা পার হতে চাইল।

শিরি-ফোরের সারেং হয়তো জানে না কী ঘটছে। মার্ভেলের দিকে সরছে সে। গগল বো থ্রাস্টার দিয়ে ট্রলারকে সরিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু মার্ভেলের প্রপেলারের শাফট ট্রলারের অনেক সামনে। হালকা ঢেউ উঠল, কিন্তু কাজ হলো না—দুই জাহাজে জোরেশোরে ধাক্কা লাগল। ইস্পাতে ইস্পাতে গা শিউরানো কান ফাটানো আওয়াজ হলো। যে-ক'জন জলদস্যু পানিতে ছিল, মুহূর্তে হাড়-মাংসের লালচে দলা হয়ে গেল। দুই জলযান সরে যাওয়ার পর ঢেউ কিমাগুলো ধুয়ে সরিয়ে নিল।

হুইল হাউজে এসে ঢুকল রানা, একটা ড্রয়ার টেনে ওঅকি-টকি নিয়ে বলল, 'অনিল, ট্রল্যারের ওয়াটার-লাইনে ফুটো করতে হবে। ওরা বুঝুক, পালাতে পারবে না।'

'দাঁড়া ব্যবস্থা করছি।' ব্যস্ত হয়ে উঠল অনিল।

দ্রুত দুই নৌযানের মাঝে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। শিরি-ফোরের ডেকে এক খালাসিকে দেখল রানা। লোকটা এ-ফ্রেম ডেরিকে কেব্‌ল্ লাগিয়েছে, কেবলের আরেক মাথা ট্রলারের শেষে নিয়ে গেল, কেব্‌ল্ দিয়ে কন্টেইনারটাকে আটকে দিল।

লোকটাকে লক্ষ্য করে গুলি করল রানা, জানত এত দূর থেকে লাগাতে পারবে না। জোয়ারের ঢেউ ট্রলার নিয়ে খেলছে। রানা নিজেও দুলছে, আবারও গুলি করল। খালাসি নিজের কাজে ব্যস্ত, গুলি কানের কাছ দিয়ে গেলেও লক্ষ

করছে না।

কোথাও লুকিয়ে আছে এক উইঞ্চ-ম্যান, সে ডেরিক চালু করল। এ-ফ্রেমের হাত উঠল উপরে, ট্রলারের পিছনে চলে গেল। এবার দেখা গেল ওটা কন্টেইনারটাকে টানছে। জিনিসটা অত্যন্ত ভারী। তক্তার ডেকে দগদগে ঘায়ের মত দাগ হলো। কন্টেইনারের এক কোনা একটা বোলার্ড-এ আটকে গেল। ডেরিকের ড্রাম তবুও কেবল্ টানছে। কন্টেইনার কাত হয়ে গেল, তারপর প্রচণ্ড ধাতব শব্দে আছড়ে পড়ল। উইঞ্চ-ম্যান বাক্সটা হিড়হিড় করে ক্রেনের তলায় নিয়ে এল। কন্টেইনারটা শূন্যে তুলে ডেকের উপর থেকে সরাল সে, সাগরের উপরে নিয়ে গেল। ক্রেনের ব্রেক সরিয়ে নেওয়া হলো, ঝপাস করে কন্টেইনারটা পড়ল সাগরে। পানি ঢুকছে ভিতরে। প্রকাণ্ড বাক্সের মত দুলল, তারপর আস্তে আস্তে ডুবতে শুরু করল।

উইঞ্চ-ম্যান কেবলগুলো সরিয়ে নিয়েছে। ট্রলার গতি বাড়াল। কন্টেইনারে যা-ই থাকুক, সেগুলো বে-আইনী কিছু। রানা জানে, তাড়াতাড়ি ট্রলার ঠেকাতে হবে। এদিকে কন্টেইনারের লাইনগুলো ডুবে যাওয়ার আগেই ধরতেও হবে।

কিছু বলতে হলো না রানার, পরমুহূর্তে বোঝা গেল, অনিল কাজে নেমেছে। এক সেকেণ্ড পর পর গ্যাটলিং গান গুলি বর্ষণ শুরু করল। পঞ্চাশটা ইউরেনিয়াম বুলেট গিয়ে ঢুকল শিরি-ফোরের ওয়াটার-লাইনে। বুলেটের গর্তগুলো পাইলট হাউসের আগে গিয়ে থামল। ওখানে কোথাও ফিউল ট্যাঙ্ক আছে।

অনিল চায় না ওখানে বিস্ফোরণ ঘটুক। কিন্তু জলদস্যুরা ওই গর্তের খুব কাছে অস্ত্র-শস্ত্রের গুদাম বানিয়েছিল। প্রথম বিস্ফোরণটা হালকা ভাবে শোনা গেল। মনে হলো কয়েকটা আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল। তারপর আবারও বিস্ফোরণ ঘটল। খোড়লের পেট থেকে বেরিয়ে এল কমলা রঙের শিখা। আকাশ চাটল আগুনের জিভ।

গ্যাটলিং গান আরেকবার চালাল অনিল। ডেকের নীচের দিকে তাক করেছে, খোলের একটা বড়সড় অংশ উড়ে গেল। ওখান দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এল লেলিহান আগুন ও ধোঁয়া। ট্রলারে যেন একগাদা কামানের গোলা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ডেক ডেবে গেল। পরমুহূর্তে আবার বিস্ফোরণ। অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা। ট্রলারের পাইলট-হাউজটা গিলে নিল আগুন, একইসঙ্গে কেবিনটা হাজার টুকরো হলো। সামনের ডেকে ফিউল ট্যাঙ্ক ছিল, ওটা এবার বিস্ফোরিত হলো। ট্রলারের স্টার্ন নীচে নামল, উঁচু হলো বো।

শ্র্যাপনেলগুলো মার্ভেলের গায়ে এসে আছড়ে পড়ল। রেইলিঙের আড়ালে লুকাল রানা। ট্রলারের স্টার্নের উইঞ্চ উড়ে এসে মার্ভেলের পিছনের ডেকে পড়ল। চাঁদের আলোয় কেবলগুলো মাকড়সার জালের মত দেখাল। বিস্ফোরণে শিরি-ফোরের কীল দুর্বল হয়ে গেছে, চাপ সহ্য করতে না পেরে এবার দু'টুকরো হয়ে গেল। বো-টা ধপ্ করে সাগরে পড়ল। দু'সেকেণ্ড পর হুশ্‌হুশ্ শব্দ করে স্টার্ন ডুবে গেল। আরেকবার বো লাফিয়ে উঠল, তারপর ঢেউ ওটাকে টেনে তলিয়ে দিল।

ঘড়ি দেখল রানা। বিশ এমএম রাউণ্ডগুলো আঘাত হানবার পর মাত্র উনিশ সেকেণ্ড হয়েছে!

উঠে দাঁড়াল ও, ঘাড়ে রক্ত চটচট করছে। তপ্ত কোনও ধাতু যাওয়ার পথে ঘাড় কেটে দিয়েছে। হাতের তালুতে রক্ত মুছে ফেলল, ঘুরে তাকাল। ট্রলারটা সাগরের যেখানে ছিল, সেখানে কয়েকটা পোড়া তক্তা ভাসছে। ঢেউয়ের মাথায় তেল জ্বলছে। বিস্ফোরণের আওয়াজ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেছে। মার্ভেলের ডেকে তাকাল রানা। আহত কেউ নেই। সাগর শান্ত। কেউ ভাসছে না।

দশ সেকেণ্ড চুপ করে থাকল রানা, তারপর একটু দূরের কণ্টেইনারটা দেখল। দ্রুত ডুবছে ওটা। হয়তো এখনও উদ্ধার করা যাবে। এদিকে মার্ভেলের নাবিকরা কাজে নেমে পড়েছে। কণ্টেইনারে কেব্‌ল্ আটকাচ্ছে।

ওঅকি-টকিতে বলল রানা, 'ডেক পার্সোনেল, কার্গো তোলার জন্যে তৈরি হও। ফোরডেকে কেব্‌ল্ আটকাও। খুঁজে দেখো কেউ বেঁচে আছে কি না।' কথা শেষে সিঁড়ি ভাঙল ও, একেকবারে চার ধাপ করে নামল। সুপারস্ট্রাকচার পার হলো, নেমে এল অ্যাফ্‌ট্ ডেকে।

খালাসিরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কণ্টেইনার কেবলের টান খেয়ে স্থির হয়েছে। পুলি কেব্‌ল্ নিয়ে ঘুরছে, কণ্টেইনারের ওজন নিল। কেব্‌ল্ আরও টানটান হলো। এবার কেব্‌ল্ ডেকের উপর দিয়ে ফিরল। ওগুলো ডেক তপ্ত করে দিল, রং যা ছিল, মুহূর্তে পুড়ে ধোঁয়া হয়ে গেল।

একটা ডেরিকের সামনে থেমে শেকল দু'হাতে তুলল রানা, কেবলের দিকে এগিয়ে গেল। রেইলিঙের সামনে দাঁড়িয়ে শেকল দিয়ে কেব্‌ল্‌টা পেঁচাল ও, শেকলের আরেক মাথা লাগাল একটা উইঞ্চে। জং ধরা উইঞ্চটা দেখে মনে হয় নষ্ট, কিন্তু বাটন টিপতেই গর্জে উঠল টু-সিলিণ্ডার ইঞ্জিন। লেভার পিছাল রানা, সঙ্গে সঙ্গে শেকলগুলো কেব্‌ল্ শক্ত করে ধরল। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষে বিশ্রী নাক জ্বালানো গন্ধ বেরল। খালাসিরা কেব্‌ল্ হাতে পেয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্যাপস্টেনে প্যাঁচ পরিয়ে দিল। প্রচণ্ড ওজনে কেব্‌ল্‌গুলো থরথর করে কাঁপল, কিন্তু ছিঁড়ল না।

পরবর্তী পাঁচ মিনিট যেন মুহূর্তে শেষ হয়ে গেল। খালাসিরা ব্যস্ত হয়ে ক্রেনের সঙ্গে কেব্‌ল্ আটকাল। এরপর মার্ভেলের অ্যাফট ডেকের ক্রেনটা চালু হলো, কণ্টেইনার টেনে তুলছে। রানা অপেক্ষা করল। একটু পরে কণ্টেইনার উঠে আসবে।

ফু-চুং আর উর্বশী বেরিয়ে এল ডেকে। ফু-চুঙের মুখ ফ্যাকাসে, টলছে একটু একটু, ডানহাত বুকের উপরে রেখেছে। রানার পাশে এসে দাঁড়াল ওরা।

পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে তাকাল রানা। 'কী রে, কী অবস্থা তোর?'

খুব সাবধানে শ্রাগ করল ফু-চুং। 'আর কোনও সমস্যা ছিল না, কিন্তু হাসতে গেলে বুকে ব্যথা পাচ্ছি!'

সান্ত্বনা দিল রানা, 'কিছুক্ষণ পর ব্যথা কমে যাবে।' অন্য প্রসঙ্গে সরে গেল ও, 'ওখানে কী অবস্থা?'

'ভাল। আমিই একমাত্র ধরা খাওয়া পাবলিক। ওদের একজন কপাল ঠুকে ব্যথা পেয়েছে, আরেকজনের হাত ছড়েছে।'

'আর ডাকাতরা?'

জবাবটা জানাল উবশী, 'তেরোজন মারা গেছে, দু'জন গুরুতর আহত। ফারা বলছে ওরা আধঘণ্টাও বাঁচবে না।'

মাথা নাড়ল ফু-চুং। 'কপাল মন্দ, আমরা ওদের হাতে পেলাম না। হয়তো ফরেনসিক অটপ্সি করলে কিছু বেরবে।'

'ওদের বয়স দেখে কিছু জানা যেতে পারে,' বলল রানা। 'কোন্ জাতি বোঝা যাবে। কিন্তু এখন আর জানা যাবে না কারা আক্রমণের পেছনে ছিল।'

এক খালাসির চিৎকারে ঘুরে তাকাল ওরা। 'রেইলিঙের কাছ থেকে সরে যান, সার! কণ্টেইনার আসছে!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্রেনের কাছে চলে এল ওরা। কিছুক্ষণ পর রেইলিং পার হয়ে উঠে এল কণ্টেইনার। ওটার চারপাশে ড্রিলের অজস্র ফুটো, সেখান থেকে পানি বেরুচ্ছে। ক্রেনের চালকের দাঁতের ফাঁকে লম্বা জিভ দেখে মনে হলো সে ডিমের বাক্স নামাচ্ছে। কণ্টেইনার সাবধানে ডেকে নামিয়ে দিল।

এক নাবিক রানার হাতে একটা বোল্ট কাটার দিল। প্রচুর শক্তি ব্যয় করে কণ্টেইনারের দরজার প্যাডলক কাটল রানা।

চারপাশের সবাই এসেছে, দেখতে চায় কণ্টেইনারে কী লুকানো আছে। কেউ কেউ ভাবছে জলদস্যুরা ওদের গুপ্তধন নিজেদের সঙ্গে রাখত। আঠারো শতকে কোনও কোনও জলদস্যু তা-ই করত। এইবার দেখা যাবে ভিতরে কী আছে!

কণ্টেইনারের দরজার বোল্ট খুলল রানা, দু'কপাট খুলে গেল। ভিতর থেকে যা বেরিয়ে এল, তার জন্য তৈরি ছিল না ওরা কেউ। হাঁ হয়ে গেল সবার মুখ।

রানা শ্বাস আটকে ফেলল, গলায় বমির টক টক ভাব এল।

কণ্টেইনারের ভিতরে এখনও অনেক পানি, বেরিয়ে আসছে দ্রুত—সঙ্গে এল তিরিশটা নগ্ন দেহ!

ছয়

মাউন্ট পিলাটাসের একটা সবুজ উপত্যকায় শ্যাতোটা, লুসার্নের একটু দক্ষিণে। জুরিখ ছেড়ে সামান্য পথ ট্রেনে এলেই এখানে পৌঁছুনো যায়। এই শ্যাতো অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছে যে, যে-কেউ বলবে এটা এখানে কয়েক শতাব্দী ধরে আছে। কিন্তু বাস্তবে ওটা তৈরি করা হয়েছে মাত্র পাঁচ বছর আগে! টালি বসানো ঢালু ছাদ, অসংখ্য গেইব্ল্ আর চিমনি নিয়ে ওটা যেন কোনও রূপকথার বই ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। শ্যাতোর চওড়া ড্রাইভওয়ে বিরাট একটা শ্বেত-পাথরের ফোয়ারার সামনে দিয়ে গেছে। ফোয়ারার চারপাশে কিশোরী দেবীদের শ্বেত-মর্মর মূর্তি। দু'সারি দেবীর মাঝ দিয়ে বইছে নীল জলের স্রোত, মিশেছে গভীর পুল-এ। ওখান থেকে ফিরছে ফোয়ারায়।

শ্যাতোর দু'পাশে রয়েছে কয়েকটা পাথরের বাড়ি। এস্টেটে ওগুলোর কাজ

ভাবমূর্তি তৈরি করা, যেন মনে হয় কিছুদিন আগেও এটা একটা খামার-বাড়ি ছিল। মাঠে নেমেছে সাদা-হলুদ জার্সি পরা ব্রোঞ্জের ঘণ্টিওয়ালা একপাল গরু—মাঠ পরিষ্কার করছে, একইসঙ্গে চলছে সার দেয়ার কাজও।

গ্যারাজের পাশে পার্কিং অ্যানেক্স-এ অতিথিদের গুরুত্ব অনুযায়ী সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লিমোযান। পিছনে রয়েছে নিচু দেয়াল-ঘেরা একটা ছোট্ট মাঠ। ওখানে গ্যাঁট মেরে বসে আছে দুটো অ্যারোপ্যাশিয়াল গেজাল হেলিকপ্টার। ওগুলোর দুই পাইলট এগজেকিউটিভ চপারের একটায় বসে থারমোস কফি পান করছে।

জুরিখে ইউরোপিয়ান সামিট মিটিং চলছে, কিন্তু মিনিস্টাররা ক্ষুব্ধ, মিডিয়া মোটেই তাঁদের মনোযোগ দিচ্ছে না। সবাই জেনে গেছে তাঁরা যা-ই বলুন না কেন, সহজে বিশ্ব-মন্দা কাটবে না। অবশ্য এই শ্যাতোয় যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরা অতি জরুরি বিশ্ব-অর্থনীতি নিয়ে কাজ করবেন। এখন সবাই ঘুরে দেখছেন প্রকাণ্ড ডুপ্লেক্স হল। চারপাশে ওক কাঠের কারুকার্য খচিত প্যানেল, দেয়ালে ঝুলছে সুইস বুনো শুয়োর আর স্ট্যাগ-এর করোটি। বিশাল ফায়ার-প্লেসের উপরে বসে রয়েছে সুইস ষাঁড়ের এক জোড়া বিরাট শিং। একটু আগে এখানে এসে তাঁরা মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছেন, সত্যি শ্যাতোর মালিকের রুচি আছে।

সুইটযারল্যাণ্ড দুনিয়ার সেরা ব্যাঙ্কিং সেণ্টার, কাজেই এই পনেরোজন ব্যাঙ্কার এদেশে আসতেই পারেন। তাঁরা ইউরোপ আর আমেরিকার সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্কগুলো চালান। তবে আজকে তাঁদের সঙ্গে আছেন আরেকজন।

টেবিলের শেষমাথায় বসে আছেন ফ্রেডারিখ বাউয়ার। তাঁর বাবা ক্যাথোলিক ধর্মরীতি অনুযায়ী ছেলেকে মানুষ করতে চেয়েছেন, সবসময় কড়া শাসনে রেখেছেন, ছেলেকে শিখিয়েছেন কী করে ভালভাবে ব্যাঙ্ক চালাতে হয়। কিন্তু ফ্রেডারিখ বাউয়ার কিশোর বয়সে বুদ্ধি খোলার পর চট করে ধর্ম পাল্টেছেন। তাঁর একমাত্র ধর্ম ধন-সম্পদ অর্জন। তিনি স্বীকার করেন, অর্থই তাঁর আসল ঈশ্বর।

ফ্রেডারিখ বাউয়ারের রক্তে মিশে আছে পারিবারিক ব্যবসা—ব্যাঙ্কিং। এ-কথা মিথ্যা নয় যে, এখন তিনি বিশ্বের সেরা বিত্তবানদের একজন। তাঁর মত যাঁরা আছেন, তাঁরা পৃথিবীর ফিন্যান্স নিয়ন্ত্রণ করেন। বেশিরভাগ সময় সরকার তাঁদের কথামত ওঠে ও বসে। ফ্রেডারিখ বাউয়ার প্রতিদিন শত শত কোটি ডলার নিয়ে খেলেন, দিন শেষে হিসাব কষে দেখা যায়, তাঁর ব্যাঙ্ক আরও সম্পদ অর্জন করেছে, আরও বিত্তবান হয়েছেন তিনি। তিনি কখনও কাজে ভুল করেন না, প্রতিটি পা ফেলেন মেপে, যে-কারণে বড় ব্যাঙ্কাররা মনে মনে তাঁকে ভয় পান।

ফ্রেডারিখ বাউয়ার বিয়ে করেছেন, কারণ একটা বউ থাকাই নিয়ম। তাঁর তিন ছেলে-মেয়ে পৃথিবীতে এসেছে কারণ তিনি দয়া করে স্ত্রীর সঙ্গে ছয়-সাতদিন শুয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেন ওসব ব্যাপার মানুষের পেশায় খুব খারাপ প্রভাব ফেলে। কেউ কখনও বলতে পারবে না তিনি ছেলে-মেয়েদের জন্মদিনে উপস্থিত থেকেছেন। তিনি নিশ্চিত নন যে তাঁর ছোট ছেলের বয়স বাইশ কি না, তবে আন্দাজ করতে পারেন ছেলেটা সরবোন-এ লেখাপড়া করছে। কাজেই বলা যায়, তাঁর দামি চশমার পিছনের তীক্ষ্ণ ধূসর চোখ দুটো সবই দেখে।

ফ্রেডারিখ বাউয়ার প্রতিদিন সকাল ছয়টায় জুরিখের ব্যাহোনহোফ্‌স্ট্রাস-এ অফিসে যান, রাত আটটায় অফিস ছেড়ে বেরোন। শুধু রবিবার বা অন্য ছুটির দিনে বারো ঘণ্টা বাসায় থাকেন। তিনি মদ্য পান করেন না, ধূমপান করেন না, জুয়া খেলেন না। ক'দিন আগে ষাট বছরে পা রেখেছেন। আস্তে আস্তে ভুঁড়ি হচ্ছে। চুলগুলো পেকে গেছে আগেই। তাঁর মণির রং সাবান মেশানো নোংরা পানির মত। সবসময় সুট পরেন ধূসর রঙের। সাদা শার্ট পরেন, কিন্তু ওটা কারও মনে ছাপ ফেলে না, শুধু চোখের ধূসর মণির ছাপটা মনে রয়ে যায়।

যাঁরা তাঁর সঙ্গে কাজ করেন, তাঁরা কখনও ফ্রেডারিখ বাউয়ারকে হাসতে দেখেননি। কোনও ভয়ঙ্কর ফিনানশিয়াল সমস্যা তৈরি হলে তাঁর ঠোঁটের কোণ একটু বেঁকে যায়। এ-পর্যন্তই।

ওঁর চারপাশে আছেন দুনিয়ার সেরা পনেরোজন ব্যাঙ্কার, গম্ভীর হয়ে আছেন তাঁরা। সম্পদ অর্জনে এঁরা ফ্রেডারিখ বাউয়ারের মতই, প্রয়োজন হোক বা না হোক, টাকার জন্য লোভী হয়ে ওঠেন। এঁরা পৃথিবীর সেরা ব্যাঙ্কগুলোর প্রেসিডেন্ট—এঁদের সিদ্ধান্তে বিলিয়ন ডলার এখানে-ওখানে যায়; এঁদের সিদ্ধান্ত লাখ লাখ মানুষের জীবন পাল্টে দেয়। এঁরা এখানে মিটিং করতে এসেছেন, কারণ তাঁরা এখন জানেন, সত্যিই বিশ্ব-অর্থনীতি এবার মুখ থুবড়ে পড়বে।

ফ্রেডারিখ বাউয়ারের সামনে কালো একটা কাপড়—ওটা দিয়ে চার-কোনা কী যেন ঢেকে রাখা হয়েছে। জিনিসটা বড় কিছু নয়। ব্যাঙ্কাররা টেবিলের চারপাশে বসে পড়লেন, অ্যাটেণ্ডেন্টরা তাঁদের পাশে পানি ঢেলে দিয়ে চলে গেল। এবার বাউয়ার কাপড় টান দিয়ে সরিয়ে তলার জিনিসটা দেখালেন।

সাধারণ মানুষ এই জিনিস দেখলে কাছ থেকে দেখতে চায়, লোভী হয়ে ওঠে, দরকারে হামলে পড়ে, কিন্তু ব্যাঙ্কারদের চেহারায় স্পষ্ট কোনও ছাপ পড়ল না। বাউয়ার অবশ্য খেয়াল করলেন, ব্যাঙ্কারদের চোখে আবছা আবেগের ছাপ পড়েছে। তাঁদের কয়েকজন আস্তে করে শ্বাস ফেলতে চাইলেন। একজন চিবুকে টোকা দিলেন। আরেকজন মুহূর্তের জন্য চোখ বিস্ফারিত করলেন, চারপাশের সবাইকে দেখলেন—মনে হলো সবার কথায় বুঝে নিয়েছেন পোকার খেলায় কী জুয়া ধরা হয়েছে।

আয়তাকার টুকরোটার ওজন সাতাশ পাউণ্ড—অনেকে ওটাকে বলেন লণ্ডনের চমৎকার ডেলিভারি। শ্যাতোর প্রকাণ্ড হল-এ মিষ্টি মৃদু আলো জ্বলছে, সেই আলোয় ওটার তেলতেলে গা থেকে হলদেটে আভা বেরোল। জিনিসটা নিরানব্বুই পয়েন্ট নয়-নয় পার্সেন্ট পরিশোধিত। দাম আনুমানিক এক লাখ ষাট হাজার ডলার।

'জেন্টলমেন, আমরা ভয়ঙ্কর একটা বিপদে পড়েছি,' নিখুঁত ইংরেজিতে মুখ খুললেন ফ্রেডারিখ বাউয়ার। 'আপনারা জানেন শীঘ্রি বিশ্বের সমস্ত সোনা ফুরিয়ে যাচ্ছে। অনেক আগে থেকেই যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি ছিল। আর এখন এটা বলা যায়, আপনাদের অনেকে অতিরিক্ত লোভী হয়ে উঠে সর্বনাশটা ঘটিয়েছেন।

'এক দশক আগে আপনারা যার যার দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে লাভজনক

একটা প্রস্তাব দেন। সে-সময় সবাই ধারণা করে এর ফলে সমস্ত পক্ষ সুবিধা পাবে। আপনারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে পয়েন্ট দুই পাঁচ পার্সেন্ট সুদে সোনা ধার নিতে চান। সে-সময় সবাই বলেছিল সোনাগুলো খামোকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ভল্টে পড়ে আছে, অথচ চালাচালির মধ্যে থাকলে ওগুলোর মূল্য অনেক বাড়বে। আপনারা বলেন, পয়েন্ট সিকি পার্সেন্ট সুদ পেলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলো এত-এত টাকা পাবে, এর আগে কখনও যেটা চিন্তাও করা যায়নি।

'ওখানেই যদি চিন্তাটা বন্ধ হতো, তা হলে আজকে এই মহাবিপদ আসত না। কিন্তু আপনারা থামেননি, সরকারকে চাপ দিয়ে সোনাগুলো নিয়ে বছর বছর সুদ দিয়ে যেতে থাকলেন। সবই ঠিক চলছিল, সরকারও খুশি সুদ পেয়ে ...কিন্তু তারপর? তারপর এটাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ধরে নিয়ে আপনারা সোনাগুলো মুক্ত বাজারে ছেড়ে দিলেন, সেই টাকায় বিরাট সব ব্যবসা শুরু করলেন। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে: কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলো শুধু ধারই দিয়েছে, কখনোই বিক্রি করার অনুমতি দেয়নি। চুক্তি অনুযায়ী তারা যখন-তখন সোনাগুলো চেয়ে বসতে পারে। আপনারা ধরে নেন কোনও দেশ হঠাৎ করে তাদের সোনা চেয়ে বসবে না, আর যদি চায়ও, মুক্ত বাজার থেকে কেনা যাবে। আপনারা ধরে নেন, ব্যাঙ্কগুলো সামান্য পরিমাণে সোনা ফেরত চাইতে পারে। তাতে কোনও সমস্যা ছিল না। আপনারা বিপদে পড়তেন না।

'সোজা কথায় বলতে হয়, লোভ আপনাদের মস্তিষ্ক দখল করল। এখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলোর হিসাবের খাতা বলছে, তাদের কাছে রয়েছে বারো হাজার টন সোনা। ওগুলোর দাম ধরা হয়েছে আনুমানিক এক ট্রিলিয়ন ইউরো। ...বাস্তবে বলতে পারবেন ওগুলো কোথায় গেছে? ওগুলো হয়ে গেছে অলঙ্কার—সারা দুনিয়ার মহিলারা চুড়ি, দুল, আঙটি, নেকলেস ইত্যাদি গহনা বানিয়ে নিয়েছে! আপনারা ওগুলো আর উদ্ধার করতে পারবেন না এখন।

'কয়েকটা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ভাল করেই জানে কী ঘটেছে। তারা সোনার মূল্যের পয়েন্ট সিকি পার্সেন্ট সুদ নিচ্ছে, কিন্তু এটাও জানিয়ে দিয়েছে, তাদের সোনা নিয়ে যা খুশি করা চলবে না, চাওয়ামাত্র ফেরত দিতে হবে। দু'বছর আগে ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক তাদের কিছু রিজার্ভ বিক্রি করতে চায়, তখন আমরা সবাই মিলে সোনা কিনে ট্রেজারিতে দিই। এর ফলে আপাতত উদ্ধার পাওয়া যায়। আপনারা নিশ্চয়ই মনে রেখেছেন, সে-সময় ব্যবসায়ীরা বুঝে যায় কী ঘটছে। তখন মাত্র কয়েক সপ্তাহে সোনার দাম পঞ্চাশ ইউরো বেড়ে যায়। ওই সময় ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কাররা সোনার দাম স্থির রাখার জন্যে সোনার স্টক বিক্রি করে। তখন বাজার আবারও শান্ত করতে আমাদের খরচ হয়েছিল প্রায় এক বিলিয়ন ইউরো। আমরা আমাদের স্টক-হোল্ডারদের বলেছিলাম আর কখনও এভাবে মুনাফা কমবে না। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলো তাদের সোনা চাইলে আবারও বিপদে পড়ব আমরা।'

নিউ ইয়র্কের এক ব্যাঙ্কার টিটকারির সুরে বললেন, 'ফ্রেড, আপনি কি আমাদের ইতিহাসের ক্লাস নিচ্ছেন নাকি? একটু খেয়াল করলে কিন্তু দেখবেন আমাদের বেশ কয়েকজন এখানে নেই। ওরা বোর্ড অভ ডিরেক্টর্স নিয়ে মিটিঙে

ব্যস্ত। আপনার কী মনে হচ্ছে না, আমাদেরও একই কাজ করা উচিত?'

'আপনি যা বললেন, সেটা এই মুহূর্তে আমাদের চিন্তার বিষয় নয়, মিস্টার ওয়েলার।' ফ্রেডারিখ বাউয়ার আমেরিকান ব্যাঙ্কারকে কড়া চোখে দেখলেন। এর ফলে কেউ ট্যাঙ্ক ওয়েলারের অনুসরণ করবার সাহস পেলেন না।

'ব্যাঙ্ক বিশ্বাসের ওপরে ব্যবসা করে,' আবার শুরু করলেন বাউয়ার, 'শ্রমিক কাজ শেষে চেক পায়, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনে, আর বাকি টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখে। এর ফলে কী হয় সেটা সে জানে না, জানতে চায়ও না। সে শ্রমকে মূলধনে রূপান্তর করে, আশা করে আমরা ওই মূলধন যতটা পারি বাড়াব। আমরা ওই মূলধন উদ্যোক্তাদের জোগান দিই, তারা নতুন ব্যবসা খোলে। ওখানে আরও শ্রমিক কাজ পায়, তারা শ্রম দিয়ে আরও মূলধন বাড়ায়। এই চক্র প্রক্রিয়া শতশত বছর ধরে চলেছে।

'কিন্তু শ্রমিকের বিশ্বাস যদি নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে কী ঘটে? আমরা জানি কখনও কখনও ব্যাঙ্ক শ্রমিকের বিশ্বাস ধরে রাখতে পারেনি। কিন্তু এবার যা ঘটবে সেটা আগে কখনও হয়নি—হবেও না আর। এককথায় বলব, বিশ্বাসহীনতার যে-পরিমাণ আমরা দেখব, সেটা মুখে বলে কাউকে বোঝানো যাবে না। দেশের সোনার রিজার্ভ না থাকায় সরকার বলতে পারবে না যে-কেউ ইচ্ছে করলে অর্থের বদলে সোনা নিতে পারে। এর ফলে সরকার জনতার বিশ্বাস হারাবে, ইচ্ছে করলেও আই.ও.ইউ. ফেরত দিতে পারবে না। এখন বাস্তব কথা হচ্ছে, আমরা চাইলেও প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ফিরিয়ে দিতে পারব না। যদি আমাদের কাছে ওই পরিমাণ টাকা থাকত, তবুও মুক্ত বাজারে এত সোনা নেই যে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলোকে সন্তুষ্ট করতে পারতাম।'

এক ইংরেজ ব্যাঙ্কার বললেন, 'আমরা গোল্ডের প্রোডাকশান বাড়াতে পারি, এতে খানিকটা সময় হাতে পাব।' ভদ্রলোকের পরনে স্যাভিল রোও সুট।

এক বেঁটেমত ভদ্রলোক এককথায় জানিয়ে দিলেন, 'একদম সম্ভব নয়।' তাঁর উচ্চারণে বোঝা যায় তিনি কোনও প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশের লোক।

ফ্রেডারিখ বাউয়ার আস্তে করে মাথা দোলালেন, 'মিস্টার স্যাণ্ডার্স, একটু খুলে বলবেন?'

বেঁটে ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অন্যরা রোদে না বেরিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন, তিনি নন। সর্বক্ষণ নীল চোখগুলো কুঁচকে রেখেছেন। হাতের পাঞ্জা অস্বাভাবিক বড়, আঙুলের গাঁটগুলো ফোলা। বোঝা যায় সম্পদ অর্জনের জন্য গায়ের জোর খরচ করেন তিনি, ব্যাঙ্কার নন।

'আমি এখানে সাউথ আফ্রিকান মাইনিং সোসাইটিকে রিপ্রেজেণ্ট করছি,' বললেন ন্যাট স্যাণ্ডার্স, 'মিস্টার বাউয়ার আমাকে জানিয়েছেন এখানে কী আলাপ হবে, কাজেই আগেই আমার লোকদের সঙ্গে আলাপ করেছি আমি। আশা করি আমি নিখুঁত তথ্য দিতে পারব। গত বছর সাউথ আফ্রিকা তিন হাজার চারশো টন সোনা উৎপাদন করে। এতে প্রতি আউন্সে খরচ হয় দুশো আশি ডলার। আমরা আশা করছি এ-বছর একই পরিমাণ সোনা উৎপাদন হবে। এতে প্রতি আউন্সে খরচ পড়বে তিনশো আঠারো ডলার। ট্রেড-ইউনিয়নের কারণে শ্রমিকদের বেতন

বাড়াতে হয়েছে, ইউনিয়ন চায় আমরা আরেকটা চুক্তি করি। ওটা হলে সোনার দাম আরও বেড়ে যাবে।'

'চুক্তি করবেন না,' তাড়াতাড়ি করে বলে উঠলেন হল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট।

তাঁকে কড়া নজরে দেখলেন ন্যাট স্যাণ্ডার্স। 'হার্ড রক মাইনিং কোনও ফ্যাক্টরির সাধারণ কাজ নয়। এই কাজে দক্ষ হতে বছরের পর বছর লাগে। এখন ওখানে ধর্মঘট চলছে বলে আমরা হাত গুটিয়ে বসে আছি। ইউনিয়ন জানে আমাদের কিছু করার নেই। ওরা এটাও জানে খনিগুলো প্রতি আউন্স সোনা পাঁচশো ডলারে বিক্রি করছে, বেতন বাড়ালে খনি-মালিকের ক্ষতি হবে না।'

টেবিলের অপর পাশে বসে থাকা এক ব্যাঙ্কার জিজ্ঞেস করলেন, 'উৎপাদন বাড়ানো যায় না?'

'আমাদের খনি ইতিমধ্যে দু'মাইল নীচে নেমেছে। আমরা যত নীচে যাব আমাদের খরচ জ্যামিতিক হারে বাড়বে। একে অনেকটা স্কাই-স্ক্র্যাপারের সঙ্গে তুলনা করতে পারেন। মাথার উপরে আরেকটা তলা তুললেই হবে না, আগে ভিত শক্ত করতে হবে, সেইসঙ্গে বিম-কলাম শক্ত করতে হবে। এলিভেটর সেখান পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে, বাড়তি মানুষের জন্য পানি ও সুয়্যারেজের ব্যবস্থা রাখতে হবে। আর্কিটেক্টরা বলেন মাথার ওপরে আরেকটা তলা বানানো যতটা কঠিন, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি কঠিন তৈরি বিল্ডিঙের নীচে আরেকটা তলা তৈরি করা। তেমনি আমাদের গভীর খনিগুলোকে যদি আরও নীচে পৌঁছুতে হয় তা হলে খরচ দুই থেকে তিনগুণ বেশি পড়বে। সোনা আমরা ঠিকই ওখান থেকে উদ্ধার করতে পারব, কিন্তু মুনাফার বদলে উল্টো লোকসান দিতে হবে।'

'তা হলে আমাদের সোনার অন্য কোনও উৎস দরকার। রাশা? ওখানে? ক্যানাডা, বা ইউনাইটেড স্টেট্স্?'

ফ্রেডারিখ বাউয়ার বললেন, 'ওসব জায়গায় এত প্রচুর নেই যে আমাদের এই বিপুল চাহিদা মিটবে। তা ছাড়া নর্থ আমেরিকায় পরিবেশ স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রতি আউন্সে তিরিশ থেকে চল্লিশ ডলার বাড়তি খরচ করতে হবে।'

'আমরা নতুন কোনও খনি আবিষ্কার করে নিই না কেন? তা ছাড়া ব্রাজিলের সোনার খনিতে সর্বক্ষণ গোলমাল চলছে, ওদের গোলমাল মিটিয়ে দিলেই ওরা উৎপাদন বাড়াতে পারে।'

'যেসব দামি যন্ত্রপাতি লাগবে, তাতে... আর ম্যানেজমেন্ট তৈরি করা... তা ছাড়া ব্রাজিলের সোনার খনিতে যে শিরা পাওয়া যায়, তাতে এক বছরে বড়জোর একটা আর্মার্ড কার ভরা যাবে।' মাথা নাড়লেন স্যাণ্ডার্স। 'বিশ্বে অনেক সোনার খনিতে ভাল শিরা পাওয়া যায়, কিছু কিছু জায়গা আমরা ঘুরেও দেখেছি। কিন্তু আমলাতন্ত্রের কারণে ওগুলো নিয়ে কাজ করতে সময় লাগবে। ধরে নিতে পারেন, ফাইল নড়তে অন্তত এক বছর। এরপর আপনারা খনিতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করবেন। তারপর সোনা তুলতে লাগবে বহু দিন। কিন্তু আপনারা তো হঠাৎ চাইছেন হাজার হাজার টন সোনা।'

ন্যাট স্যাণ্ডার্সের কথা শেষে হল-এ থমথমে নীরবতা নামল। কিছুক্ষণ পর

এক ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কার বললেন, 'তা হলে একটাই পথ আছে। আমরা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ককে জানাব হুট্ করে রিজার্ভ যেন না চেয়ে বসে। ওরা বুঝবে। দরকার হলে দ্বিগুণ সুদ দেব।'

'আপাতত হয়তো ব্যবস্থা হলো, কিন্তু সমস্যাটা তো রয়েই গেল,' বললেন নিউ ইয়র্কের আরেকজন ব্যাঙ্কার। 'আমরা আমাদের দায়িত্ব এড়াতে পারছি না।'

'কিন্তু আমরা সোনাগুলো সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ভল্টে ফেরত দিতে পারলে বাজার-মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারব,' বললেন ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কার। 'আমার দেশে যা ঘটেছে, সেটা চট করে আবারও ঘটবে না।'

'কিন্তু যখন *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল* এই খবরটা প্রকাশ করবে?' মাথা নাড়লেন নিউ ইয়র্কার, বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এই খবর জানা মাত্র সরকারের গলা টিপে ধরে পাবলিক বলবে, *তোমরা বলেছ সোনার রিজার্ভ ঠিক আছে। দেখাও দেখি আমাদের সোনা কোথায় রেখেছ!* আমেরিকার পাবলিক সত্যি মনে করে ফোর্ট নক্স-এ একটা সোনা ভরা ভল্ট আছে। ওরা যদি জেনে যায় ওখানে আছে কয়েকটা মূল্যহীন কাগজ, সবাই খেপে উঠবে। স্রেফ পাগল হয়ে যাবে পাবলিক। সরকার আগে কখনও এরকম ভয়ানক মিথ্যা বলেনি, ডলার আগে কখনও মূল্যহীন কাগজ ছিল না।'

'জেন্টলমেন, এই জন্যেই বক্তব্যের শুরুতে আমি বলেছি, আমরা একটা ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছি,' বললেন বাউয়ার। 'আমরা ধনতন্ত্রের আসল ভিত্তিটা সরিয়ে নিয়েছি। জনতা যখন সোনা উধাও হওয়ার খবর জানবে, সব দেশের সমস্ত প্রক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যাবে—সবকিছু তাসের বাড়ির মত খসে পড়বে।'

সুইস ব্যাঙ্কার থামলেন, চারপাশ দেখলেন। সবার তিক্ত চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন, সম্পূর্ণ মনোযোগ পেয়েছেন। তাঁরা এখনও জানেন না তিনি কী বলবেন, কিন্তু আন্দাজ করবার চেষ্টা করছেন। গ্লাস তুলে এক চুমুক পানি খেলেন বাউয়ার, তারপর গ্লাস রেখে বললেন, 'গত ছ'বছর ধরে জার্মানি অর্থনৈতিক ভুল পলিসির কারণে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। ওরা ইউরোপের সবচেয়ে বড় শিল্প-কারখানাগুলো চালাত, কিন্তু নিজেদের ওয়েলফেয়ার স্টেট বানাতে গিয়ে কী হয়েছে? ওদের উৎপাদন কমেছে, বেকারের সংখ্যা হয়েছে আকাশচুম্বি—এখন সরকার অতিরিক্ত ভাতা দিতে গিয়ে ফতুর হয়ে যাচ্ছে। এককথায় বলা যায়, এভাবে চললে জার্মানি দেউলিয়া হয়ে যাবে। দু'সপ্তাহ আগে আমি জেনেছি, ওরা ওদের সোনার মজুদ বিক্রি করবে।'

চট করে শ্বাস আটকে ফেললেন সবাই। পরিষ্কার বুঝতে পারলেন এরপর কী আসছে।

'জেন্টলমেন, তার মানে ছ'হাজার টন। সাউথ আফ্রিকার দু'বছরের উৎপাদনের প্রায় সমান। বার্লিন আর বন-এ ওরা রিজার্ভ রেখেছে মাত্র দু'হাজার টন। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন, বাকি চার হাজার টন আমাদের জোগাড় করে দিতে হবে।'

'কবের মধ্যে দিতে হবে?' জানতে চাইলেন ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কার। বরাবর ভদ্রতা করে বাউ করেন তিনি, কিন্তু এখন ভুলেই গেছেন।

'এখনও জানি না,' বললেন বাউয়ার। 'তবে মনে হয় ওরা বাজার-মূল্য স্থির রাখতে খানিকটা সময় নেবে।'

বিড়বিড় করে বললেন নিউ ইয়র্কার, 'খানিকটা সময়, যথেষ্ট সময় নয়।'

'আরেকটা কথা মনে রাখবেন,' বললেন বাউয়ার, 'যদি সুবিধাবাদী ব্যবসায়ী-চক্র টের পায় যে আমরা সোনা জোগাড় করছি, এমনও হতে পারে দাম বেড়ে যাবে দুই থেকে তিন গুণ।'

হল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কার আফসোস করে বললেন, 'আমরা শেষ হয়ে যাব! সবাই ফতুর হয়ে যাব! জার্মানি কাগজের নোট নিলেও দিতে পারতাম না! সবাই সোনা বিক্রি করে ওই টাকা ধার দিয়েছি। যত ঋণ দিয়েছি এখন সব ফেরত চাইতে হবে! ডাচ অর্থনীতি একেবারে ধসে পড়বে!'

'শুধু আপনাদের অর্থনীতি নয়,' বললেন ট্যাঙ্ক ওয়েলার। 'আমরা বিশ বিলিয়ন ডলারের সোনা কেনা-বেচা করেছি, ওগুলোর বড় একটা অংশ গেছে ডট-কম বিস্ফোরণের পরের ধাক্কায়। যারা সঞ্চয়ী হিসাবে টাকা জমা রেখেছে, তাদের মূলধন থেকে এখন ঋণ শোধ করতে হবে। আমেরিকান ব্যাঙ্কে ছোটাছুটি করবে সবাই। তার মানে অকল্পনীয়, বিশাল মন্দা আসবে।'

আবারও থমথমে নীরবতা নামল। যা আলাপ হয়েছে সেগুলো নিয়ে ভাবছেন সবাই। উনিশশো বিশ ও ত্রিশের দশকে যা ঘটেছে দেখেননি এঁরা, কিন্তু দাদা-নানার কাছে শুনেছেন। তখন বিশ্ব জুড়ে মহা মন্দা আসে। কিন্তু এবার আরও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে, দেশগুলো এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি পরস্পর নির্ভর। ব্যাঙ্কারদের কয়েকজন নিজস্ব ক্ষতি বা নিজের দেশ নিয়ে চিন্তা করছেন না, ভাবছেন গোটা বিশ্বে কী ঘটবে তা-ই নিয়ে। উন্নত দেশগুলো নিজেদের মানুষের খাবার জোগাড় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, ফলে আন্তর্জাতিক সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে। স্বল্পোন্নত দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যাবে।

কেন?

কারণ, এই টেবিলে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা নিজেদের মুনাফা বাড়ানোর জন্য সমস্ত সোনা বিক্রি করে দিয়েছেন!

এ-মুহূর্তে সব ব্যাঙ্কার ফ্রেডারিখ বাউয়ারের মত ধূসর চিন্তা করছেন।

কিছুক্ষণ পর একজন বললেন, 'জার্মান সরকারকে ঠেকানো যায় না?'

'চেষ্টা করা যায়,' জবাবে বললেন আরেকজন। 'কিন্তু ওদেরই খুঁজে বের করতে হবে কীসে লাভ। ওরা ওদের সোনাগুলো চাইছে ইনসলভেনসি থেকে বাঁচতে। নইলে ওদের ওখানে রায়ট হবে, কু-ও হতে পারে।'

সবাই মিলে নিজেদের রক্ষা করতে চাইছেন—নিজেদের ব্যাঙ্ক আর বিশ্বটা উদ্ধার করতে চাইছেন। কিন্তু একসময় তাঁরা হাল ছেড়ে দিলেন। আসলে এই বিপদ থেকে বাঁচা যাবে না। ফ্রেডারিখ বাউয়ার সবার কথা শুনেছেন, একসময় তাঁরা থেমে গেলে তিনি আফ্রিকান মাইনিং সোসাইটির রিপ্রেজেণ্টেটিভকে একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসতে বললেন।

হল-এর দরজা খুলল, বন্ধ হয়ে গেল আবার। ব্যাঙ্কাররা ফ্রেডারিখ বাউয়ারের দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিলেন। তিনি ঠিক করেছেন প্রশ্ন আসার আগ পর্যন্ত চুপ

করে থাকবেন।

এবার সবাই মিলে ধরে বসলেন, জানতে চাইলেন উনি কোনও পথ দেখাতে পারবেন কি না।

'এই সমস্যা থেকে বেরোনোর পথ আছে?' জানতে চাইলেন দুনিয়ার ষষ্ঠ ব্যাঙ্কের সিইও, এক ইংলিশম্যান।

'হ্যাঁ, পথ আছে,' এবার বললেন বাউয়ার। সবাই তাঁকে দেখছেন। তিনি পিডিএ-তে মৃদু টোকা দিয়ে মেসেজ দিলেন। কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও হল-এর দরজা খুলে গেল। যিনি ঘরে ঢুকলেন তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়ছে। ব্যাঙ্কাররা কখনও স্বীকার করবেন না যে তাঁরা ক্ষমতাবানদের ভঙ্গি নিলেও নিজেদের লুকিয়ে রাখেন আড়ালে, আসলে অনিশ্চয়তা তাঁদের কুরে কুরে খায়—কিন্তু এই লোক অন্য ধাতু দিয়ে তৈরি। সাবলীল ভঙ্গিতে এলেন তিনি, মাথা উঁচু করে হাঁটেন। বয়স পঞ্চাশ বা বায়ান্ন। হয়তো ব্যাঙ্কারদের সমানই হবেন। মুখে কোনও ভাঁজ পড়েনি, তবে চোখ যেন বলছে ওঁর মনের বয়স আরও অনেক বেশি। মাথায় বাদামি চুলের চেয়ে ধূসর চুলই বেশি। বেশিরভাগ ব্যাঙ্কার বিত্ত আর প্রতিপত্তির নকল আত্মতৃপ্তি দিয়ে নিজেকে সন্তুষ্ট রাখেন, কিন্তু ইনি তা করেন না। দরকার পড়ে না। তিনি যেন একটা আশ্চর্য শক্তি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। হল-ঘরে কী যেন একটা ঘটেছে, তাঁকে কথা বলতে হলো না, সবার মনোযোগ পেয়ে গেলেন।

ভদ্রলোককে পাশে বসালেন বাউয়ার, 'জেন্টলমেন, ইনি ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন। আগে সোভিয়েত ব্যুরো অভ ন্যাচারাল রিসোর্সেস-এ ছিলেন। এখন কনসালট্যান্সি করেন।'

কেউ কোনও কথা বললেন না। আন্দাজ করতে চাইলেন এই লোকের এখানে আসবার কারণ।

'আমি জানতাম এরকম কিছু ঘটবে, তাই অনেক আগেই গোপনে পরিকল্পনা করেছি,' বললেন বাউয়ার। 'এখন আপনাদের যা বলব সেটা নিয়ে কোনও তর্ক বা আপত্তি তুলবেন না। আমাদের কাছে এই একটাই রাস্তা আছে, কাজেই আপনারা দয়া করে কথাগুলো খেয়াল করে শুনবেন। মিস্টার সরোকিন এখন আমাদের পরিকল্পনা আপনাদের খুলে বলবেন।'

ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন উঠে দাঁড়ালেন না, চেয়ারের ঘাড়ে ডানহাত রেখে বক্তব্য শুরু করলেন। ব্যাঙ্কাররা শুনলেন কী ভাবে উদ্ধার পাওয়া যাবে। ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন পুরো দশ মিনিট কথা বলে গেলেন। তাঁর কথা শেষে ব্যাঙ্কারদের চেহারায় আতঙ্ক, রাগ, ও ঘৃণার ছাপ পড়ল। ডাচ ব্যাঙ্কারকে দেখে মনে হলো যে-কোনও মুহূর্তে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়বেন। ফ্রেডারিখ বাউয়ার জানেন নিউ ইয়র্কের ব্যাঙ্কারদের একজন ভিয়েতনামে লড়াই করেছেন, তিনিও ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন।

'জেন্টলমেন, আমাদের আর কিছু করার নেই,' বললেন বাউয়ার। কেউ মুখে কিছু বললেন না। বাউয়ার একে একে সবার চোখে তাকালেন, তাঁদের চোখই কথা বলল। তাঁরা চোখ সরিয়ে নিলেন, বা মৃদু মাথা দোলালেন। রইল ডাচ

ব্যাঙ্কার। কীসে রাজি হয়েছেন ভেবে গুঙিয়ে উঠলেন তিনি, চোখ নামিয়ে হাতের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

উপসংহারে বাউয়ার বললেন, 'আমি চুক্তিপত্রের ব্যবস্থা করছি, এখুনি আপনারা সবাই সম্মতিস্বাক্ষর দেবেন। পরে আর কখনও আমাদের এভাবে সাক্ষাৎ হবে না।'

শুধু নিউ ইয়র্কের ব্যাঙ্কার ট্যাঙ্ক ওয়েলার বললেন, 'পরে সাক্ষাৎ ঠিকই হবে—নরকে!'

সাত

কয়েক পা পিছিয়ে গেল মাসুদ রানা।

কন্টেইনারে সব বয়সের মানুষ আছে, তবে বেশির ভাগের বয়স বিশ থেকে পঁচিশ। কিছু দেহে বিষক্রিয়ার কালচে-নীল ছোপ। লাশগুলো আগেই পচে গেছে। কয়েকটা লাশের পেটে গ্যাস জমেছে, বেঢপ ফুলে উঠেছে। সম্ভবত অন্যরা সামান্য আগে মারা গেছে। জলদস্যুরা যখন কন্টেইনার সাগরে ফেলে, তখন ডুবে মারা গেছে। ডেক-এর আলোতে তাদের দেহ ফ্যাকাসে, অসুস্থ দেখাল। লাশগুলো পরস্পরকে জাপ্টে ধরে পড়ে আছে। মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের সংখ্যা অনেক বেশি। এরা সবাই এশিয়ান—চাইনিজ, ইন্দোনেশিয়ান, লাওশান, বার্মিজ। কয়েকটা লাশ নীরবে বলল, ওরা সার্ক অঞ্চলের মানুষ।

চোখ সরিয়ে অন্ধকার সাগরের দিকে তাকাল রানা, তা হলে এদেরই মত একদল পাষণ্ডের খপ্পরে পড়ছে সোনালি ভবিষ্যতের আশায় পাড়ি দেওয়া মানুষগুলো! বুকের ভিতরে ফুঁসে উঠছে প্রচণ্ড রাগ। শিরি-ফোর যেখানে ছিল, সেখানে এখনও ঢেউয়ের মাথায় তেল জ্বলছে।

রানার পাশে এসে দাঁড়াল ফু-চুং ও উর্বশী। ফু-চুং নিচু স্বরে বলল, 'ওই ট্রলারের ওরা ছিল স্নেকহেডের শিকার।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা, চুপ করে থাকল।

এশিয়ায় বেশ কয়েক বছর ধরে ঘটছে এটা। যারা বুঝে নিচ্ছে দেশে উন্নতি হবে না, তারাই যেতে চাইছে উন্নত দেশে। আর সেই সুযোগটা নিচ্ছে স্মাগলাররা, হাজার হাজার ডলার নিয়ে মানুষ পাচার করছে এরা। যারা টাকা দিল, তারা বেঁচে গেল, কিন্তু গরীব মানুষ অত টাকা কোথায় পাবে? কাজেই স্মাগলাররা অন্য ব্যবস্থা রেখেছে—তুমি চুক্তি করো, আমরা তোমাকে কোরিয়া, জাপান, ইউরোপ বা আমেরিকায় পাঠিয়ে দেব। শর্ত থাকবে, যতদিন টাকা ফেরত না দাও, আমাদের দেওয়া চাকরি ছাড়তে পারবে না। একবার ওসব দেশে বে-আইনী ভাবে ঢুকলে আর পালাবার পথ থাকছে না—স্নেকহেড বা সর্দারের কথা মত চলতেই হবে। বেতন এত কম দেয়া হয় যে বছরের পর বছর পার হয়ে যায়, টাকা শোধ দেয়া যায় না। আর কেউ যদি পালায়? দেশে তার আত্মীয়-স্বজনের

উপর নেমে আসে অত্যাচারের চাবুক। টাকা ফেরত না দিলে খুন করা হয়। সবচেয়ে করুণ অবস্থা হয় মহিলাদের। সাধারণত তাদের ম্যাসাজ পার্লার নামের পতিতালয়ে কাজ দেয়া হয়।

শুধু লাল-চিন থেকেই প্রতি বছর হারিয়ে যাচ্ছে দশ হাজার লোক। বোকা মানুষগুলো জানেও না বিদেশে কপাল ঠুকতে গিয়ে জীবনভর দাসত্বের শেকল পায়ে বাঁধছে। এই একই পরিণতি হচ্ছে আশিয়ান হোক, বা সার্ক—সব দরিদ্র বা উন্নয়নশীল দেশের সাধারণ মানুষের।

এসব দেশের ইন্টেলিজেন্স কিছুদিন আগেও ভেবেছে ওই মানুষগুলোর বেশিরভাগ যায় কোরিয়া, জাপান, ইউরোপ, আমেরিকায়। কিন্তু এখন আর কেউ অতটা নিশ্চিত নয়।

কন্টেইনারে যে-মানুষগুলো ছিল, তাদের গন্তব্য কোথায় ছিল? বিষ খাওয়ানো হয়েছে কেন?

'চল্, রানা, ফু-চুং আয়, এসো উর্বশী,' হঠাৎ পিছনে সোহেলের গলা শুনতে পেল ওরা। 'ফারা রাইনারের সঙ্গে কথা হয়েছে। অটপসি করলে হয়তো বেরিয়ে আসবে ওদের সবার দেহে বিষ এল কেন, কোত্থেকে।'

ঘুরে দাঁড়াল ওরা।

এক আর্দালিকে ডাকল রানা, 'মোস্তাফা, তোমরা কন্টেইনার খালি করো। খেয়াল রেখো কোনও আইডি বা আর কিছু পাওয়া যায় কি না। লাশ বের করে কন্টেইনার সাগরে ফেলে দেবে।'

'ইয়েস, সার,' চলে গেল মোস্তাফা।

'আমি থাকছি, ফারার কাজে সাহায্য করব,' বলল উর্বশী।

রানার সঙ্গে সুপারস্ট্রাকচারের দিকে এগোল সোহেল ও ফু-চুং। ওরা অপারেশন্স সেন্টারে ফিরে এল। কেউ মুখ তুলে ওদের দিকে তাকাল না, থমথম করছে সবার মুখ। গগল হেল্‌ম্-এ দাঁড়িয়ে। অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে ওয়েপন্স পরীক্ষা করছে অনিল।

'অনিল,' মৃদু ডাকল রানা।

ঘুরে তাকাল ভারতীয় এজেন্ট। ওর চোখ দুটো লাল। চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। ও-ই শিরি-ফোর ডুবিয়ে দিয়েছে। নিজেকে দায়ী করছে এখন। ভাবছে, ওর কারণে বন্দি পাওয়া গেল না, কন্টেইনারের মানুষগুলো মারা গেল।

'তুই খামোকা নিজেকে দোষ দিচ্ছিস,' বলল রানা। 'আমিও শিরি-ফোরের ঠিক ওখানেই আঘাত হানতাম। একইকাজ করত অন্যরা, ইচ্ছে করলে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারিস।'

'এর পরেরবার ওদের ধরব আমরা,' বলল ফু-চুং।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্ত্রের দিকে মনোযোগ দিল অনিল।

গগলের দিকে তাকাল রানা। 'গগল, আমরা তিরিশ নট-এ ফিরতি পথ ধরব। সাবমেরিনটার উপরে যাব।'

উর্বশী ডেকে ফারাকে সাহায্য করছে, কাজেই আতাসির পাশে বসল রানা, প্যাসিভ সোনারে চোখ রাখল। রহস্যময় সাবমেরিনের উপরে পৌঁছুনো পর্যন্ত

কোর্স আর স্পিড বলল ও।

ওরা একঘণ্টা আগে সাবমেরিনটা ডিটেক্ট করেছে। ওটা এখনও আগের জায়গাতেই আছে। পঁচাত্তর ফুট নীচে। অ্যাকুস্টিক সিগনাল পেল রানা, অদ্ভুত শব্দগুলো কম্পিউটারের মাধ্যমে কমিয়ে নিল। থাকল শুধু বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ। বোঝা গেল না সাবমেরিন ঘাপটি মেরে পড়ে আছে, না কোনও সমস্যায় পড়েছে। কোনও বিপদে থাকলে অ্যালার্ম ক্ল্যাক্সোন বাজত, প্রেশার্ড টিউবের ভিতরে ক্রুদের নড়াচড়ার আওয়াজ থাকত। আছে শুধু বাতাস বেরুনো আর ধীরে ধীরে সাব-এর ডুবে যাওয়া।

কম্পিউটারে এদিকের সাগরের চার্ট দেখল রানা। সাগর এখানে প্রায় দুই মাইল গভীর। এই হারে নামলে সাবমেরিন তলায় ঠেকতে কয়েকদিন লাগত, কিন্তু তার অনেক আগেই ওটা চারপাশের পানির প্রচণ্ড চাপে চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে যাবে।

নিজের চেয়ারে ফিরে এল রানা, মুন পুল-এ ইন্টারকম করল, 'ডাইভ মাস্টার, মাসুদ রানা বলছি। হাল ডোর খুলুন, কম পানির রোভটা রেডি করুন। দু'জন ডাইভার ওখানে থাকুক, আমার কিছু গিয়ার লাগবে।'

পনেরো মিনিট পর মুন পুলে, রোভ-এর পাইলটের পিছনে দাঁড়াল রানা, বাম হাতে গগল্স্-এর স্ট্রিপ। আস্তে করে রওনা হলো প্রোব, নামতে শুরু করল। সাবমেরিন দেখতে যে-কাউকে পাঠানো যেত, কিন্তু ওখানে বিপদ থাকতে পারে বলে নিজেই দেখতে চেয়েছে রানা।

আণ্ডারওয়াটার প্রোবটা দেখতে ছোটখাটো একটা টর্পেডোর মত। প্রপেলারের গতি তিন ধাপে বাড়ানো-কমানো যায়, প্রোবটা এদিক-ওদিক সরিয়ে নেওয়া যায়। গম্বুজের মত নাকে বসে আছে একটা হাই রেযোলিউশন ভিডিও ক্যামেরা। পিছনের দিকে রয়েছে শক্তিশালী বাতি। ওই আলো অতিরিক্ত নোংরা পানিও ভেদ করতে পারে, চারপাশের দশ ফুট একদম পরিষ্কার দেখা যায়। মুন পুলে দু'জন ক্রু অপেক্ষা করছে, প্রোবের কেইবল-এ প্যাঁচ লেগে গেলে ছাড়িয়ে দেবে।

একবার উপরের দিকে তাকাল রানা। মার্ভেলের বিরাট কবাট হাঁ করে আছে। ওখানে আণ্ডারওয়াটার উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাতি দেখা যাচ্ছে। চারপাশে সবুজ আলো ছড়িয়ে পড়ছে। মুন পুল-এর উপরে দেখা গেল মিনি-সাব ডিসকভারি-১০০০-এর ছায়া, যেন কোনও ডুবে যাওয়া বিধ্বস্ত প্লেন। ওটা অপেক্ষা করছে, কিছু টেনে আনতে হলে শক্তিশালী হাতসহ নেমে আসবে।

'পঞ্চাশ ফুট পার হচ্ছি,' বলল পাইলট। খুব মনোযোগ দিয়ে স্ক্রিন দেখছে সে। রোভ-এর ক্যামেরা চারপাশ দেখাচ্ছে। নীচে শুধু গাঢ় অন্ধকার!

'ষাট ফুট।' দুই আঙুলে প্রোবের জয়স্টিক দুটো নাড়ছে সে।

'ওই যে,' আঙুল দিয়ে দেখাল রানা।

ধীরে ধীরে নীচে কী যেন দেখা দিল। ওটার দিকে নেমে চলেছে রোভ। ওরা সাবমেরিনের পিছনে আছে। উজ্জ্বল আলোয় প্রপেলারটা ব্রোঞ্জের মত চকচক করল। এবার রেইডার দেখা গেল। আগে কখনও এরকম সাবমেরিন দেখেনি রানা। ইয়ারফোনে বলল, 'আবার পাঁচ ফুট ওপরে ওঠো, তারপর দশ ফুট এগিয়ে

যাও।'

নির্দেশ পালন করল ইন্দোনেশিয়ান নেভির সাব লেফটেন্যান্ট মুর্তোজা। প্রপেলারের দিক থেকে সরে গেল ক্যামেরা। স্টিলের প্লেট দেখতে পেল ওরা। কিন্তু ওগুলো দেখে মনে হলো না ওটা সাবমেরিনের গা। চুরুটের মত নয়। উর্বশী সোনারে দেখে বলেছিল, জিনিসটা খাটো আর মোটা। সাবমেরিন এরকম হয় না।

হঠাৎ কালো হাল-এ সাদা এইচএএম লেখাটা দেখতে পেল ওরা। রানা বলল, 'একটু পিছিয়ে যাও।'

খুদে সাগর-রোবোট পিছিয়ে গেল। এবার লেখাটা পরিষ্কার দেখা গেল–**UTHAMPTO.**

ডাইভারদের একজন বলল, '**UTHAMPTO**-র মানে কী?'

'মানেটা জরুরি নয়,' বলল রানা। 'প্রশ্ন ওটা এখানে কেন। সাউথহ্যাম্পটন তো ইংল্যাণ্ডে।'

কয়েক সেকেণ্ড পর বোঝা গেল ওটা ভেসেলের হোম পোর্ট। একইসঙ্গে দেখা গেল নাম–***AVALANCHE.***

অ্যাভালাঞ্চ কোনও সাবমেরিন নয়। ওটা একটা জাহাজ।

প্রোবের স্ক্রিনে দেখছে রানা। ওরা জাহাজের স্টার্ন রেইলিং পার হলো, চলে এল অ্যাফ্ট্ ডেকে। কয়েকটা মাছ জঞ্জালের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'মনে হয় শিরি-ফোরের খুনিদল এখানে হামলা করেছে,' বলল রানা।

'ওরা আমাদের রেইডারের একটু দূরেই ছিল,' বলল দ্বিতীয় ডাইভার, 'বাঁচাতে পারলাম না।'

ব্রিজে অনিলের সঙ্গে কথা বলল রানা।

কম্পিউটারে ব্যস্ত হয়ে ব্রিটিশ জাহাজটার নাম খুঁজল অনিল।

'মাসুদ ভাই, আমরা কিন্তু ওদের কোনও এসওএস ধরতে পারিনি,' বলল প্রথম ডাইভার।

'হয়তো শিরি-ফোর অ্যাভালাঞ্চের রেডিয়ো জ্যাম করে,' বলল রানা। 'এমনও হতে পারে হঠাৎ করে ওদের উপরে চড়াও হয়েছে, ওরা আর সাহায্য চাইতে পারেনি।'

'রানা,' ভেসে এল অনিলের কথা। 'অ্যাভালাঞ্চ রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির ভেসেল। সাগরে নামে উনিশশো বিরাশিতে। দৈর্ঘ্যে একশো তিরিশ ফুট, চওড়ায়...'

কথা শেষ করতে দিল না রানা, জিজ্ঞেস করল, 'শেষবার ওটা কোথায় দেখা গেছে?'

'রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে ওটা চারদিন আগে হারিয়ে গেছে। ওকিনাওয়া থেকে আমেরিকান সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ টিম এদিকে আসে, কিন্তু কিছু খুঁজে পায়নি।'

'আশ্চর্য!' আপনমনে বলল রানা। মাইক্রোফোনে ওর কথা শোনা গেল। 'ধরলাম খুনিরা ওদের রেডিয়ো জ্যাম করেছে। কিন্তু সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ টিম ওদের দেখল না কেন?'

গগলের সঙ্গে কী যেন আলাপ করল অনিল। গগলের চাঁছাছোলা গলা শোনা গেল, 'হয়তো পাইরেটরা ওটা আগেই ডুবিয়ে দিয়েছে?'

'চারদিন ধরে ডুববে?' বলল রানা। 'একটা কারণ তো থাকতে হবে! কেউ ভেতরে পানি ঢোকা থামিয়েছে।'

'তবুও ডুবেছে,' বলল গগল। 'লোকটা বাঁচতে পারেনি। ওটা একবার বয়্যান্সি হারিয়েছে, আবার ফিরে পেয়েছে, তবে শেষে একদম তলায় নেমে যাবে।'

'ওটার ভেতরে বাতাস আটকে আছে,' বলল রানা। ব্যাখ্যা দিল, 'এমনও হতে পারে ওটা কোনও হ্যালোক্লাইনে আটকেছে।'

'হতে পারে,' মেনে নিল গগল। 'সাগরে আগেও অতিরিক্ত লবণের স্তর দেখেছি আমি। অনেকটা ডেড সি'র মত। চেষ্টা করলেও ডোবা যায় না।'

'তবে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে,' বলল রানা। 'আস্তে আস্তে ডুবছে।'

'আপাতত বয়্যান্সি ঠিক আছে, কিন্তু যে-কোনও সময় পাথরের মত নেমে যাবে,' বলল গগল। 'সরে পড়ো। হতে পারে তোমাদেরকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে।'

'ব্যাটা খালি ভয় দেখায়,' মনে মনে বলল রানা। মুখে বলল, 'কেউ বেঁচে আছে কি না দেখতে চাই।'

চুপ হয়ে গেল সবাই। প্রোবটা নিঃশব্দে নিমজ্জিত জাহাজের উপর দিয়ে ভেসে চলল। বাইরে হামলার ছাপ নেই। কোনও বুলেটের দাগ বা ফুটো দেখা গেল না। অ্যাভালাঞ্চে কোনও বিস্ফোরণ ঘটেনি। মনে হলো জাহাজের লোকগুলো কোনও প্রতিবাদ না করেই স্বেচ্ছায় ডুবে গেছে।

অ্যাভালাঞ্চের বো'র সামনে পৌঁছে গেল প্রোব। সাব লেফটেন্যান্ট মুর্তোজাকে সুপারস্ট্রাকচার দেখাল রানা। 'ওখানে চলো। পোর্টহোলে উঁকি দেব।'

'মাসুদ ভাই, ভাবছেন ওখানে কেউ বেঁচে আছে?' জিজ্ঞেস করল মুর্তোজা।

'না,' এককথায় জানিয়ে দিল রানা। একটু আগে চিন্তা করেছে ও—জলদস্যুর হামলার পরে কেউ বাঁচবে না। তাদের আক্রমণ দেখেছে ও। পিঁপড়ের মত মানুষ খুন করবে, সাক্ষী রাখবে না। ও নিজে নিমজ্জিত জাহাজে আটকা পড়লে মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করত। নানারকম আওয়াজ করত, প্রাণপণে চেঁচাত। কেউ যদি সোনারে শব্দটা পায়, দেখতে আসে। কিন্তু সোনারে শুনেছে ও, অ্যাভালাঞ্চে কোনও প্রাণের আওয়াজ নেই।

অ্যাভালাঞ্চের ডেকের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে রোভ। ব্রিজের দিকে চলেছে। বৈদ্যুতিক আলোয় প্রকাণ্ড জানালাগুলো দেখা গেল। ওখানে কোনও কাঁচ নেই।

হাতের ইশারায় ওদিকটা দেখাল রানা। 'প্রোব নিয়ে ভেতরে চলো। দেখব।'

সাবধানে একটা জানালা টপকে ভিতরে ঢুকল মুর্তোজা, খেয়াল রাখল যেন লাইফ লাইনে প্যাঁচ না পড়ে।

ঘরের ছাদে স্বচ্ছ স্ফটিক দেখা গেল। পানিতে বাতাস জমে আছে। মেঝেতে একটা বুলেটের গর্ত। ওখান থেকে বাতাস উঠছে, জমছে গিয়ে সিলিঙে।

ব্রিজে আক্রমণের সুস্পষ্ট ছাপ। ঘরের চারপাশে অজস্র গুলির দাগ। ডেকে পড়ে আছে বুলেটের খোসা। ঘরের এক কোণে একটা মোড়ানো কার্পেট পড়ে

আছে—না, ওটা একটা লাশ!

'মুর্তোজা, আইডি থাকতে পারে,' বলল রানা।

আরেকটু এগোল রোভ, কিন্তু ওটা দিয়ে লাশ সরানো গেল না। মোটাসোটা মানুষটা অতিরিক্ত ভারী। অবশ্য কয়েক মিনিটের চেষ্টায় কাত হলো। দেখা গেল ছোট ছোট মাছ লাশের চোখ দুটো খেয়ে নিয়েছে।

'সুপারস্ট্রাকচারে ঢোকা যায় কি না দেখব,' বলল রানা।

ব্রিজের পিছনের দরজাটা ধাতব বার দিয়ে আটকানো।

সিদ্ধান্ত পাল্টাল রানা, 'খুলব না। ফিরে চলো, পোর্টহোলে উঁকি দেব।'

ব্রিজ থেকে বেরিয়ে অ্যাভালাঞ্চের পোর্ট-সাইডে চলে গেল রোভ। একটার পর একটা পোর্টহোলে উঁকি দিল ওরা। ভিতরে কিছু দেখা যায় না, শুধু গাঢ় অন্ধকার।

স্টার্ন ঘুরে স্টার-বোর্ডে চলে এল ওরা। আলোটা জাহাজের গায়ে গোল বৃত্ত তৈরি করল। পোর্টহোল যেন কোনও মণিরত্ন, ঝিকমিক করছে। একটা পোর্টহোলে আলো পড়তেই ওরা ধাতব আওয়াজ শুনল—ইস্পাতে ইস্পাতে বাড়ি লাগছে! কেউ জাহাজের প্লেটিঙে টোকা মারছে!

আলো আবার তাক করল মুর্তোজা। এক মহিলা! তার বড়বড় দুই চোখে আতঙ্ক। চেঁচাচ্ছে। মাঝখানে পানির দেয়াল থাকায় কোনও আওয়াজ পাওয়া গেল না।

'বেঁচে আছে, মাসুদ ভাই!' অবাক হয়ে বলল মুর্তোজা।

পাশের বেঞ্চ সিটে সরে গেল রানা, দ্রুত হাতে জোড়া ট্যাঙ্কের স্ট্রিপ পিঠে আটকাল, গলায় পরে নিল বয়্যান্সি কন্পেনসেটার। এবার কোমরে ওয়েট বেল্ট পরল। পরবর্তী দু'মিনিটে অন্য দুই ডাইভারও পানিতে নামবার প্রস্তুতি নিল। তিনজন ফিন আর শক্তিশালী ফ্ল্যাশ-লাইট সঙ্গে নিল।

'ফারাকে তৈরি থাকতে বলো,' শরীরে ষাট পাউণ্ড ওজন নিয়ে রোভের মুন পুলের দিকে রওনা হলো রানা। মাস্ক পরে এয়ারফ্লো পরীক্ষা করল, তারপর ফিন পরে নেমে পড়ল পানিতে। মুহূর্তে ও তলিয়ে গেল। ওর চারপাশে বুদ্বুদ উঠল। মাস্কের ভিতরে খানিকটা পানি ঢুকেছে, বের করে দিল।

পানি অতিরিক্ত ঠাণ্ডা নয়। কিছুক্ষণ পর ওয়েট সুটের ভিতরে আটকা পড়া পানি গরম হয়ে উঠল। অন্য দুই ডাইভার নেমে পড়বার পর আর দেরি করল না রানা, অন্ধকারে রওনা হলো।

অবাক লাগছে ওর, মেয়েটা বেঁচে আছে কী করে? মাছগুলো ব্রিজে পড়ে থাকা লাশটার যা অবস্থা করেছে, তা থেকে বোঝা যায় জলদস্যুরা জাহাজে উঠে সময় নষ্ট করেনি, যাত্রীদের গুলি করে মেরেছে। অন্য একটা চিন্তা এল ওর—অ্যাভালাঞ্চের খোলে কতটুকু বাতাস আছে? মেয়েটা কতক্ষণ টিকবে? ওকে বের করা যাবে তো?

নীচে প্রোবের ঝলমলে বাতি দেখল রানা, অ্যাভালাঞ্চের গায়ে ফ্যাকাসে আলো পড়ছে। জাহাজের হাল-এ কয়েকটা আঘাতের দাগ দেখল। ওসব জায়গায় বাতাস বেরোচ্ছে। মেইন ডেকে নেমে এল রানা, ডাইভ কম্পিউটার বলে দিল

তিরাশি ফুট। আগের চেয়ে দ্রুত নামছে অ্যাভালাঞ্চ। হাতে বেশি সময় নেই!

ফিন নেড়ে রোভ-এর কাছে নেমে এল রানা, নির্দিষ্ট পোর্টহোলে তাকাল। গোলাকৃতি জানালায় ওকে দেখে ভয়ে চমকে উঠল মেয়েটা, পিছিয়ে গেল। পরমুহূর্তে বুঝল, বিপদ হবে না। আবার এগিয়ে এল। দুটো মুখের মাঝখানে থাকল এক ইঞ্চি পুরু কাঁচ। এই দূরত্ব দূর করতে হবে। রানা মাথা খেলাচ্ছে। বারবার মন গাইছে, যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে?

মেয়েটা কয়েকটা সোয়েটারের উপরে দুটো জ্যাকেট চাপিয়েছে। মাথা ঢেকে রেখেছে উলের ওয়াচম্যান ক্যাপ। ভিতরে তাপমাত্রা নিশ্চয়ই বাইরের পানির সমান? রানা চট্ করে ডাইভ কম্পিউটার দেখল—একান্ন ডিগ্রি। মেয়েটার বড়বড় চোখ দুটো সাগর নীল রঙের। এখন আর চোখে উন্মাদনা নেই, বদলে আছে বাঁচার আকুতি। মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে, রানার দিকে কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকাল, টোকা দিয়ে ঘড়ি দেখাল, যেন বলছে, 'সময় হয়েছে, এবার আমাকে বের করো।'

মেয়েটার সাহস প্রশংসা করবার মত। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আছে, ওগুলো শীতে নীল হয়ে গেছে। চেহারা একদম ফ্যাকাসে সাদা। সর্বক্ষণ থরথর করে কাঁপছে। কেবিনের ভিতরে তাকাল রানা। ভিতরে পানি ঢুকেছে। একটা ম্যাট্রেস ভাসছে। মেয়েটা আছে আরেকটা কটে। দু'হাঁটু গেড়ে ম্যাট্রেসে ওজন রেখে বসেছে। ম্যাট্রেসটা আগেই ভিজে গেছে, পোশাকও একদম চুপচুপে ভেজা। যেখানে হাঁটু রেখেছে, ওখানে সাগরের পানি একটু নড়ছে। মেয়েটা কতক্ষণ এভাবে অপেক্ষা করছে, কে জানে! যে-কোনও সময় ওকে ধরে বসবে হাইপোথারমিয়া।

রেগুলেটর সরিয়ে মুখ নাড়ল রানা, যেন বলল, 'কী অবস্থা?' মুখে সাগরের লবণাক্ত পানি নিল ও। আগে যা ভেবেছে, তা-ই মনে হলো এখন। অ্যাভালাঞ্চ অনেক আগেই সাগর-তলায় নেমে যেত, আটকে গেছে শুধু অতিরিক্ত লবণের স্তরে।

রানার চোখে তাকাল মেয়েটা, যেন বলছে, 'এই অবস্থায় ভাল থাকি কী করে?' মাথা নাড়ল, বোঝাল ও আহত নয়।

ওর দিকে একটা আঙুল তাক করল রানা, তারপর অন্য আঙুলগুলো দিয়ে জাহাজের চারপাশ দেখাল।

মেয়েটা চট্ করে বুঝে নিল, আস্তে করে মাথা নাড়ল।

জাহাজে ও ছাড়া আর কোনও জীবিত মানুষ নেই। একটা আঙুল উপরে ওঠাল মেয়েটা, কোথায় যেন চলে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এল। হাতে একটা প্যাড আর কালো মার্কার। ওর হাত এত কাঁপছে যে লেখাগুলো পড়া কঠিন।

'আমিই একমাত্র জীবিত মানুষ। আমাকে এখান থেকে বের করতে পারো?'

মাথা দোলাল রানা, ওকে বের করে আনতে পারবে। তবে আসলে জানে না, তা কী করে সম্ভব। এই জাহাজের সঙ্গে মার্ভেলের ক্রেনগুলো আটকাতে পারে ওরা। কিন্তু তাতে এটা তোলা যাবে না। ওদের দুটো ক্রেন এত ওজন নেবে না। কিন্তু ওরা যদি কেব্‌ল্ দিয়ে অ্যাভালাঞ্চ বাঁধে? একটু এদিক-ওদিক হলে ভারসাম্য

হারাবে অ্যাভালাঞ্চ, দ্রুত নামতে শুরু করবে। তবে মার্বেল কিছুক্ষণ ওজন ধরে রাখতে পারবে।

অন্য দুই ডাইভার চলে এসেছে। স্লেটে নির্দেশ লিখল রানা। একজনের হাতে ধরিয়ে দিল। ছুটল সে মার্বেলের দিকে। পোর্টহোলে তাকাল রানা, চোখ টিপল।

মেয়েটা প্যাডে কিছু লিখেছে, কাঁচের সামনে ধরল। 'তুমি কে?'

স্লেটে নিজের নাম লিখল রানা।

হতাশ চোখে তাকাল মেয়েটা। লিখল, 'তুমি কি নেভিতে আছ?'

মনে মনে বলল রানা, 'তোমাকে কী করে বলি আমি কে, বা কী করি!' লিখল, 'আমি একটা সিকিউরিটি কোম্পানিতে কাজ করি। আমাদের কাজ জলদস্যুদের ঠেকানো।'

মনে হলো মেয়েটা সন্তুষ্ট হয়েছে।

রানা জানতে চাইল জাহাজের কোথায় কোথায় পানি নেই।

মেয়েটা লিখল—ব্রিজে পানি আছে, ইঞ্জিন রুমেও। গত বারো ঘণ্টায় পানি এখানে উঠে এসেছে।

রানা লিখল, 'বাইরের দিকে এমন কোনও দরজা আছে, যেখানে ছোট ঘর বা অ্যান্টিচেম্বার আছে? এমন কোথাও, যেখানে পানি ঢুকলে জাহাজের অন্য জায়গা ডুববে না।'

মেয়েটা লিখল, ও কিছুই জানে না।

হঠাৎ বিছানায় পড়ে গেল। সেখানে পাক খেল ঢেউ। ওর কাঁধ ডুবে গেল, খেয়াল করছে না। হয়তো ধরে নিয়েছে আসলে বাঁচবার পথ নেই।

ফ্ল্যাশ-লাইটের তলা দিয়ে কেবিনের পাশে কয়েকবার জোরে টোকা দিল রানা। ঘুমিয়ে পড়লে মৃত্যু!

আবার চোখ মেলল মেয়েটা, মনে হলো আবছা ভাবে রানাকে দেখেছে। জ্ঞান হারাচ্ছে ও। ফ্ল্যাশ-লাইট দিয়ে গায়ের জোরে খোলে বাড়ি দিল রানা।

ধীরে ধীরে উঠে বসল মেয়েটা, পোর্টহোলের সামনে এসে তাকাল। সাগর-নীল চোখে ভাসা-ভাসা অদ্ভুত দৃষ্টি। শীতে থরথর করে কাঁপছে চোয়াল।

ওর সাহায্য পেতে হবে, না হলে কিছুই করতে পারবে না রানা। মেয়েটা হয়তো পাঁচ মিনিটের মধ্যে জ্ঞান হারাবে।

স্লেটে লিখল রানা, 'তোমার নাম কী?'

বোকার মত লেখাটা দেখল ও, যেন জানে না ওগুলো কী। তারপর মুখে কী যেন বলল।

স্লেট নাড়ল রানা, মনে করিয়ে দিতে চাইল কীভাবে যোগাযোগ করতে হবে।

বিশ সেকেণ্ড পর মেয়েটা প্যাডে লিখল, 'জুডি।'

'জুডি, তোমার জেগে থাকতে হবে! ঘুমিয়ো না! ঘুমালে মরে যাবে! বাইরের দিকে এমন কোনও দরজা আছে, যেখানে ছোট কোনও ঘর বা অ্যান্টিচেম্বার আছে? সিল করতে পারবে?'

মনে হলো প্রশ্নের জবাব দেয়ার সাধ্য নেই জুডির। কিন্তু হঠাৎ সোজা হয়ে বসল, চোয়াল দৃঢ় হলো। ঘনঘন মাথা ঝাঁকাল কয়েকবার, তারপর লিখতে শুরু

করল। লেখা শেষে কাঁচের পাশে ধরল। বারবার লেখাটা সরিয়ে নিল, শব্দ কেটে আবার অন্য কোনও শব্দ লিখছে।

অপেক্ষা করল রানা।

মেয়েটার হাত অসম্ভব কাঁপছে। ঠিক যেন নতুন লিখতে শেখা বাচ্চাদের হাতের মত। হাতের লেখা বোঝা যায় না।

জুডি লিখেছে, 'উপ... উপরে পো পোর্টে দরজা... এক ডেক উপরে খোল খোলে... সিঁড়ি ওখানে ঘর সিল করা যা...'

হাতের লেখা বুঝতে চার মিনিট লাগল রানার। পোর্ট-এ এক ডেক উপরে সিঁড়ির কাছে একটা ঘর আছে, ওটা সিল করা যাবে।

রানা লিখল, 'তুমি ওখানে চলে যাও, দরজা সিল করবে। যা-ই হোক, ওখান থেকে নড়বে না। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।'

মাথা দোলাল জুডি, কট ছেড়ে নেমে পড়ল হাঁটু পানিতে। চেহারায় তীব্র কষ্টের ছাপ পড়ল। রানা পরিষ্কার বুঝল, ওর পায়ের পেশিতে প্রচণ্ড খিঁচ ধরেছে, ব্যথায় স্থির হতে পারছে না। এগোতে গিয়ে ভারসাম্য হারাল, একটা বাল্কহেড ধরতে চাইল, কিন্তু পারল না, ধপ করে পড়ে গেল পানি-ভরা মেঝেতে।

রানার মনে হলো, যদি পারত, পোর্টহোল গলে মেয়েটাকে দু'হাতে তুলে নিত। নীরব দর্শকের মত দেখছে ও। সময় পার হচ্ছে। উঠছে না জুডি। তারপর খুব ধীরে ধীরে উঠল। একই জায়গায় কয়েক সেকেণ্ড টলল, তারপর একবারও পিছনে না তাকিয়ে পা বাড়াল। সিনেমার যোম্বির মত নড়ছে। পায়ে পায়ে দরজার ওপাশে চলে গেল।

জুডি চোখের আড়াল হতেই সাঁতার কাটতে শুরু করল রানা। মেয়েটা যে-দরজার কথা লিখেছে, সেখানে যাবে। রেইলিং টপকাল ও, দূরে চারজন ডাইভারকে দেখতে পেল—ওরা আণ্ডারওয়াটার সার্চ লাইট সঙ্গে নিয়ে আসছে। দেরি না করে অ্যাভালাঞ্চের স্টার্নের দুই বোলার্ডে কেবল আটকাল ওরা। রানা জানে, বো-তে একই কাজ করছে আরও চার ডাইভার। ডাইভ কম্পিউটারে দেখল, অ্যাভালাঞ্চ এখন একশো ফুট গভীরে। আগের চেয়ে দ্রুত নামছে। তবে কেবল আটকাতে পারলে জাহাজটা আপাতত নামবে না। আশা করা যায়, মার্ভেল ওজনটা সইতে পারবে।

গভীরতা এখন বড় সমস্যা নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, জুডি কতক্ষণ টিকবে?

ডুবুরিদের জন্য অ্যাভালাঞ্চ একেবারেই অপরিচিত জাহাজ। ওখানে বিল্জ্ থেকে মেইন ডেক পর্যন্ত হোল্ড রয়েছে, চওড়ায় প্রায় পুরো জাহাজ। ওখানে হয়তো পানি ঢোকেনি। আজকাল হ্যাচ যত্ন করে বানানো হয়। সার্ভো-কন্ট্রোল্ড লুভার ভেন্টিলেটারগুলো নিখুঁত থাকে, বেশিরভাগ সময় বাতাসও ঢোকে না। সার্ভে জাহাজ দ্রুত না ডোবার বড় কারণ ওই নিখুঁত হ্যাচ ও ভেন্টিলেটার।

ভ্রূ কুঁচকে দরজাটা দেখছে রানা। খেয়াল করল পানির অতিরিক্ত চাপে একটা ভেন্টিলেশন ডাক্ট বেঁকে গেছে। দুটো লুভারের মাঝখানে ছিটকে উঠছে পানি, সূক্ষ্ম কণাগুলো হোল্ডে ঢুকছে। লুভারের ধাতব দেহে সরু একটা ফাটল তৈরি হয়েছে। প্রতি মিনিটে হোল্ডে বড়জোর দু'তিন গ্যালন পানি ঢুকছে। খুব ধীরে, কিন্তু ফাটল

বাড়ছে। একটা সময় আসবে যখন লুভার হঠাৎ করেই ধসে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে হোল্ডে সগর্জনে ঢুকবে তিন বর্গ-ফুট কলামের পানির স্তম্ভ।

জুডি এই দরজার আড়ালে আসবে। দরজায় শক্তপোক্ত হিঞ্জ রয়েছে। কেউ পালাবে জলদস্যুরা সেই সুযোগ রাখেনি, একটা স্টিলের বার দিয়ে কবাট বন্ধ করেছে। ইচ্ছে করলে ওটা ফেলে দিয়ে দরজার হ্যাণ্ডেল টেনে খুলতে পারবে? না। বাধা দেবে বাইরের পানির প্রচণ্ড চাপ।

আগে ভিতরের পানির চাপ বাইরের সমান হতে হবে।

জুডি অ্যান্টিচেম্বারে ঢুকেছে? ওদিকের দরজাটা আটকেছে? রানা জানে, মেয়েটা ভীষণ ভয় পাবে, কিন্তু ওর সত্যিকার কোনও বিপদ হবে না। ওকে চট করে বের করে আনবে ও। ডাইভাররা আগে থেকে বাড়তি স্কুবা ট্যাঙ্ক নিয়ে তৈরি থাকবে।

এক ডাইভারকে কাছে ডাকল রানা, স্ল্যাবে লিখল কী চায়। ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিকেন্স হেলমেট পরে আছে ডাইভার, সহজেই মার্ভেলের ডাইভ মাস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করল।

রানা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, আশা করল জুডি এরইমধ্যে অ্যান্টিচেম্বারে চলে এসেছে। সময় যেন খুব ধীরে কাটছে। মনে হলো অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল, তারপর মার্ভেল থেকে বাস্কেট ভরা যন্ত্রপাতি আর ডাইভ ইকুইপমেণ্ট নামানো হলো। কিন্তু জুডি ওপাশের ঘরে এখনও এল না। রানার মনে আশঙ্কা এল, মেয়েটা বোধহয় আসতে পারেনি, কোথাও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

পচে ওঠা লাশের মধ্যে দিনের পর দিন কাটিয়েছে ও। প্রচণ্ড মানসিক চাপ তো আছেই। ও জানে, পানির অনেক গভীরে ডুবে যাওয়া জাহাজে আটকা পড়েছে। ডুবছে আরও। ও যে কেন অনেক আগেই পাগল হয়ে যায়নি, সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। ভীষণ ভয় পেয়েছে ও, ঠাণ্ডা পানিতে ভিজে হাইপোথারমিয়া শুরু হয়েছে।

অ্যান্টিচেম্বারে আসতে পারবে মেয়েটা? ওর মনে থাকবে তো ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে হবে?

রানা জানে, সুপারস্ট্রাকচারের কোনও দরজা খুললে সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ পানিতে ভরে উঠবে। মেয়েটাকে খুঁজে বের করবার আগেই ডুবে মরবে। ওকে উদ্ধার করবার মাত্র একটাই পথ আছে। ওকে ওই অ্যান্টিচেম্বারে ঢুকতে হবে।

ইয়ার-ফোন পরল রানা। দরজায় কান পাতল। ফ্ল্যাশ-লাইট দিয়ে খোলের গায়ে টোকা দিল। বারবার। কিছুক্ষণ পর মনে হলো ওপাশে আওয়াজ হচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা, নিশ্চিত হতে চাইল। সত্যিই ওপাশে টোকার আওয়াজ হচ্ছে। ট্যাপ-ট্যাপ। দুটো বিট।

পৌঁছে গেছে জুডি।

ডাইভ ইকুইপমেন্ট পরীক্ষা করল রানা, তারপর বাস্কেট থেকে ড্রিল নিল। ওটা শক্তি যোগান পাবে কমপ্রেস্‌ড্‌ এয়ার সিলিণ্ডার থেকে। ড্রিলের মাথা টাইটানিয়াম দিয়ে তৈরি, পুরো শক্তি খরচ করলে যে-কোনও দরজা কয়েক সেকেণ্ডে ফুটো করা যায়। ঘুরে তাকাল রানা, স্টার্নের ডাইভাররা কেব্‌ল্‌

আটকানোর কাজ শেষ করেছে। ওদের দু'জন বো-এর ডাইভারদের সাহায্য করতে গেছে। অন্য দু'জন ওর সাহায্যে এগিয়ে এল।

ভারী বাস্কেটে পিঠ দিয়ে বসল রানা, একটু ঝুঁকে ড্রিলের মাথা ঠেকাল দরজার নীচের দিকে, তারপর ট্রিগার টিপল। নিজেকে ওর দাঁতের ডাক্তার মনে হলো, কোনও রোগীর দাঁতের বিশ্রী ক্যাভিটিতে ড্রিল করছে। আওয়াজটা এতই তীক্ষ্ণ যে কানের পর্দায় তীব্র ব্যথা শুরু হলো। পাত্তা দিল না রানা, জেদ নিয়ে লেগে থাকল। ড্রিলের ঘসায় ধাতব দরজায় রূপালী সুতো উঠল। সুতোগুলো পানির আলোড়নে ভেসে সরে গেল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, তারপর ড্রিলের মাথা ওপাশে চলে গেল। যন্ত্রটা সরিয়ে নিল রানা। পানি আর ধাতব টুকরোগুলো মুহূর্তে দরজার ওপাশে গিয়ে ঢুকল। অ্যাণ্টিচেম্বারের আকৃতি কেমন, বা কখন পানিতে ভরে উঠবে, জানবার পথ নেই। রানা জানে, অপেক্ষা করতে হবে। দু'দিকের পানির চাপ কাছাকাছি না হলে দরজা খোলা যাবে না।

একটা ধাতব প্রাই বার দিয়ে দরজায় টোকা দিল ও, চাইল জুডি জানুক ও এপাশে আছে, চলে যায়নি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পাওয়া গেল। মনে হলো মেয়েটা রেগে গেছে, দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি ওকে এভাবে পানিতে চুবিয়ে উদ্ধারের চেষ্টা হবে।

চার মিনিট পেরিয়ে গেল। দরজার হ্যাণ্ডেল টানল রানা, প্রাই বার দিয়ে টান দিল। দরজা একটুও নড়ল না। আবার কাজে লেগে পড়ল ও। আরও দুটো ফুটো করল। কিছুক্ষণ পর পরীক্ষা করে দেখল, দরজা নড়ে না। আরও কয়েকটা ফুটো দরকার।

আবার কাজে নামবে, এমনসময় হঠাৎ সুপারস্ট্রাকচারের সামনের দিকে বুদ্বুদের বিস্ফোরণ ঘটল। ওদিকের লুভার আচমকা ধসে গেল, সঙ্গে সঙ্গে হোল্ডে ঢুকল হাজার হাজার গ্যালন পানি। আটকা বাতাস একসঙ্গে বেরতে চাইল, ধাক্কা দিল মেইন ডেকের ইন্সপেক্শন হ্যাচকে। ছিটকে খুলে গেল ওটা। অ্যাভালাঞ্চের বো-তে কাজ করছিল ছ'জন ডাইভার, ওরা বুঝবার আগেই জোরাল বাতাসের ধাক্কা গেল। উল্টোপাল্টে চিমনি পার হয়ে গেল ওরা। ওদের একজন দ্রুত আলোর বৃত্তে ফিরল, একহাতে গলা কাটার ভঙ্গি দেখাল। ওরা সামনের কেবল সিকিওর করতে পারেনি।

আধমিনিটও পার হলো না, অ্যাভালাঞ্চের মাথাটা নীচে নেমে গেল। জাহাজটা পোর্টে কাত হয়ে গেল। ডুবুরিরা শুধু স্টার-বোর্ডের বোলার্ডে কেবল পরাতে পেরেছে। অ্যাভালাঞ্চ এখন মার্ভেলের সঙ্গে তিনটে কেবল-এ আটকে আছে। কিছুক্ষণ পর মনে হলো জাহাজটা স্থির হয়েছে। কিন্তু এমন ভাবে কাত হয়েছে যে হুড়হুড় করে চারপাশে পানি ঢুকছে। মার্ভেলের দুই ক্রেন অপারেটর নিশ্চয়ই গগলের কথা মত কাজ করে চলেছে। ওরা চাইবে অ্যাভালাঞ্চকে স্থির রাখতে। সবাই জানে, ওরা হারা খেলায় সময় নিচ্ছে।

রানা বাতাস আর স্রোতে ভেসে উঠেছিল, ডেকে নেমে এল, দরজায় দাঁড়াল। বাস্কেট ভরা যন্ত্রপাতি চলে গেছে ডেকের আরেকদিকে। এক ডুবুরিকে হাতের ইশারায় বাস্কেট দেখাল রানা, ওটা নিয়ে আসতে বলল। নিজে হ্যাচটা খুলবার

চেষ্টা করল।

জাহাজের পাগলামি জুডিকে নিশ্চয়ই ছিটকে দিয়েছে। দরজাটা এখন যেখানে আছে, তাতে ওকে পানি ঠেলে এগিয়ে আসতে হবে। রানা জানে, দরজাটা তাড়াতাড়ি খুলতে হবে। হাতে খুব অল্প সময় আছে। বো-র একটা বোলার্ডে কেবল আটকানো আছে, কিন্তু সেটাও বেরিয়ে গেলে?

পানি সামনের হোল্ডে হুড়মুড় করে ঢুকছে। কেবলে চাপ বাড়ছে। ওটা যে-কোনও সময় বোলার্ডের মাথা গলে বেরিয়ে যাবে।

রানার মনে হলো, ও বলেছে বলেই সত্যিই কেবলটা বেরিয়ে গেল। অ্যাভালাঞ্চের বো ঝাঁকি খেল, আরও নীচে নামছে। মার্ভেলের ক্রেনে প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। ওটা মাত্র ষাট টন তোলার জন্য তৈরি। এখন অন্তত তিনগুণ চাপ পড়ছে। যে-কোনও সময় কেবল ছিঁড়ে যাবে, বা ক্রেন ভেঙে পড়বে।

পানির বাধার কারণে অ্যাভালাঞ্চের বো নামতে তিন সেকেণ্ড লাগল, ততক্ষণে দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে ফেলল রানা। পাঁচ সেকেণ্ড পর জাহাজটা নব্বুই ডিগ্রি সোজা হলো। বো-র মাথাটা তাক হয়ে গেল অতলের দিকে। ডেক মুহূর্তে মেঝে থাকল না, হয়ে গেল দেয়াল। অ্যাফট্ বাল্কহেড হয়ে গেল মেঝে। ভয়ানক জোরে আওয়াজ উঠল, কিঁচকিঁচ করল ধাতব কিছু। শিউরে উঠল রানা। ওর মনে হলো চারপাশে সবকিছু ছিঁড়ে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে। পানির মধ্যে আওয়াজটা চারপাশ থেকে আসছে। উৎস বুঝবার জন্য চট্ করে ঘুরে তাকাল ও। ডাইভাররা ডেকে সার্চ লাইটের টাওয়ার বসিয়েছিল, ওগুলো এখন নীচের দিকে খসে পড়ছে। বাতিগুলো দপ করে নিভে গেল। চারপাশে নামল গাঢ় অন্ধকার। আওয়াজটা কান ফাটানো, বাড়ছে আরও। একটা লাইফবোট ডেভিট ছেড়ে খসে পড়েছে, ডেক ঘেঁষে সোজা নেমে আসছে! ছিটকে সরে গেল রানা। ওর পাশ দিয়ে গেল বোট। পানিতে আলোড়ন উঠল। জোর টান খেয়ে নীচের দিকে রওনা হয়ে গেল রানাও। তারই মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ওর ডুবুরিরা ছুটন্ত বোটের গতিপথ থেকে সরে গেছে কি না। ডেভিটের মোটা দড়িগুলো এবার লাইফবোটের পিছনে এল। একটা দড়ি রানার মাথায় চাবুকের মত লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মাস্ক খুলে গেল।

ব্যথা! কয়েক সেকেণ্ড বুঝতে পারল না রানা, ও কোথায়। ওর মাস্ক চলে যাচ্ছে নীচে! চোখ জ্বলে উঠল। আগে কখনও এত লবণাক্ত পানি চোখে লাগেনি। ওর হাতের পাশ দিয়ে নেমে যাচ্ছে কমলা রঙের মাস্ক। ওটা খপ্ করে ধরল, পরে নিল আবার। ভিতরে পানি আছে, মুখ উঁচু করে রেগুলেটর দিয়ে বাতাস ছাড়ল। বেরিয়ে গেল পানি। ফিরে এল ও দরজার সামনে। ডাইভ কম্পিউটারে দেখল, প্রতি মিনিটে অ্যাভালাঞ্চ দশ ফুট করে নামছে। যে-কোনও সময় গতি আরও অনেক দ্রুত হবে। গগল হাল ছাড়বে না, প্রতিটি ইঞ্চি কেবল অতি ধীরে ছাড়বে। কিন্তু গভীরতা ওদের বাধা দেবে, সীমার বাইরে কম্প্রেস্ড্ বাতাস কাজে লাগবে না। ইচ্ছে করলেও নীচে নামতে পারবে না ওরা, নইলে মরতে হবে।

অ্যাভালাঞ্চ একটু আগে খেলা দেখিয়েছে, ডুবুরিরা কে কোথায় আছে কে জানে! একটু দূরে দুই ডাইভারকে দেখল ও। পাশে এসে থামল ওরা। যন্ত্রপাতির বাস্কেট রেইলিঙের ধারে জ্যাক স্টাফের পাশে বসে আছে। ড্রিলের কথা ভুলে

যেতে হবে এখন, বাড়তি এয়ার ট্যাঙ্ক ও ডাইভ ব্যাগটা দরকার। হাতের ইশারায় দেখাল রানা।

ডুবুরিরা জানে ও কী চায়, একজন দেরি না করে চলে গেল, দেড় মিনিট পর ফিরে এল। এদিকে রানা ও দ্বিতীয় ডুবুরি দরজা খুলবার চেষ্টা করছে। এবার তিনজন মিলে প্রাই বার-এ চাপ বাড়াল। এক মিনিট পার হয়ে গেল, তারপর মুহূর্তের জন্য দরজায় একটুটা সূক্ষ্ম চিড় তৈরি হলো। বেরিয়ে এল অক্সিজেনের একগাদা বুদ্বুদ। দরজাটা আবার পানির চাপে আটকে গেল। তিনজন প্রাণপণে চাড় দিল। রানার মনে হলো পিঠের পেশি ছিঁড়ে আসবে। চোখ বুজে ফেলল, মনে হলো মাথার ভিতরে অনেকগুলো নক্ষত্র বিস্ফোরিত হচ্ছে। বাহু টন-টন করছে ওর। আর পারা যায় না। এবার কী হাল ছেড়ে দেবে? পা বদলে দাঁড়াবে? ঠিক তখনই দরজাটা খুলে গেল। কামরায় যতটুকু পানি বাকি ছিল, সেটা ভরে গেছে!

অ্যাফ্ট ডেকে বসানো বাতিগুলো আগেই উধাও হয়েছে। ডাইভ টর্চের আলোয় দেখতে হবে। রানা ঘরে ঢুকল, টর্চের আলো ফেলল। ঘরটা মাঝারি। আরেক মাথায় নেমে গেছে একটা সিঁড়ি। নীচে একটা পেটমোটা হ্যাচ। ডানপাশে আরেকটা দরজা। ওটা দিয়ে মেইন ডেকে যাওয়া যেত। এখন বন্ধ। এবার জুডিকে দেখতে পেল ও। অচেতন? হাত-পা নাড়ছে না। ঢেউ ওকে পুতুলের মত এদিক-ওদিক নিতে চাইছে। চুলগুলো খোলা, চারপাশে নড়ছে।

সাঁতরে পাশে চলে গেল রানা। মেয়েটার মুখ হাঁ হয়ে আছে। নিজের রেগুলেটর জুডির মুখে গুঁজে দিল রানা, বাতাসের গতি বাড়াল। প্রথম ডুবুরি ঢুকেছে, ডাইভ ব্যাগ খুলে কেমিকেল ওয়ার্মিং প্যাক বের করল। ওগুলো বারংবার ঝাঁকি দিল রানা। কেমিকেলের রিয়্যাকশন শুরু হলো। প্যাকগুলো নিয়ে মেয়েটার গেঞ্জি ও প্যান্টের ভিতরে গুঁজে দিল রানা। এতে শীত খানিকটা কমবে।

ও জানে, আপাতত আর কিছু করবার নেই। চেষ্টা করলেও মেয়েটাকে তুলতে পারবে না। কয়েক ধাপে ডিকমপ্রেশন করতে হবে।

রেগুলেটরটা নিয়ে একবার শ্বাস নিল রানা, তারপর আবারও মেয়েটার মুখে গুঁজে দিল। কোথাও বাড়ি খেয়ে কপাল কেটে গেছে জুডির। ফুলে উঠেছে।

দ্বিতীয় ডুবুরি বাড়তি এয়ার ট্যাঙ্ক ও ডাইভ হেলমেট নিয়ে ভিতরে ঢুকল। মেয়েটাকে হেলমেট পরিয়ে দিয়ে স্টারনাম-এ ধাক্কা লাগাল রানা। বেচারী কেশে উঠল, মুখ থেকে পানি বেরোল, জমল গিয়ে হেলমেটের নীচের অংশে। এবার চোখ মেলল, কয়েকবার কাশল।

রেগুলেটর দিয়ে হেলমেটের ভিতরের পানি বের করে দিল রানা। ওর চোখে চোখ রাখল জুডি, আস্তে আস্তে হুঁশ ফিরছে। গম্ভীর হয়ে গেল রানা। মেয়েটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে বাধ্য হয়ে ওর গেঞ্জি আর প্যান্টে হাত ভরেছে ও।

অন্য সবাই চলে এসেছে। ওরা টর্চ জ্বেলে পথ দেখাল। জুডিকে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা। একজন ওর ট্যাঙ্ক পরীক্ষা করে দেখল। ওরা জানে রানাই সবচেয়ে আগে এসেছে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করেছে। হিসাব বলে দিল, ওর দ্বিতীয় ডিকমপ্রেশনের সময় নতুন ট্যাঙ্ক লাগবে।

ঝুলন্ত অ্যাভালাঞ্চের কাছ থেকে সরে গেল ওরা। হেলমেটধারী ডুবুরি

মার্ভেলের সঙ্গে যোগাযোগ করল, জানিয়ে দিল, ওদের অক্সিজেন ট্যাঙ্ক লাগবে, এখন কেবল্‌গুলো ছেড়ে দেয়া যায়।

দশ সেকেণ্ড পর কেবল খুলে গেল, অ্যাভালাঞ্চ অতল গহীনে রওনা হলো। দ্রুত গতি বাড়ছে ওটার। কেবলগুলো স্টিলের অক্টোপাসের মত পিছনে ছুটল। কয়েক মুহূর্ত পর জাহাজটা হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

ডুবুরিরা রানা-জুডিকে ঘিরে উঠে চলেছে। তবে কয়েকবার থামতে হবে। দু'বার থামবার পর ডুবুরিদের একটা দল অক্সিজেনের ট্যাঙ্ক নিয়ে এল। পনেরো মিনিট পর মার্ভেলের মুন পুলে পৌঁছে গেল সবাই। ডেক-হ্যাণ্ডরা ওদের টেনে তুলল।

মাস্ক খুলে শ্বাস নিয়ে রানার মনে হলো, একেই বলে বেঁচে থাকা। মুন পুলে মোবিলের গন্ধ, যন্ত্রপাতির ধাতব ঘ্রাণ, কিন্তু মনে হলো ও আছে পাহাড়ি ভোরের তাজা হাওয়ায়।

ফারা রাইনার আর্দালি নিয়ে অপেক্ষা করছে, দেরি না করে জুডিকে মেডিকেল বে-তে নিয়ে গেল।

সোহেল দাঁড়িয়ে আছে, একটু আগে এসেছে। হাতে কফির মগ। চট করে একবার দেখল, ফারা চলে গেছে। মগ বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নে, খা! জানি খুব শীত লাগছে তোর, কিন্তু ডাক্তার বলে দিয়েছে, রক্তের নাইট্রোজেন দূর হওয়ার আগে কড়া কোনও ড্রিঙ্ক চলবে না।'

সন্দেহ নিয়ে মগটা ঠোঁটের কাছে তুলল রানা, কিন্তু কফিতে চুমুক দিয়ে কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল। সোহেল ওর প্রাণের কথা জানে। কফির সঙ্গে অনেকখানি ব্র্যাণ্ডি ঢেলেছে।

রানার পাশে বসে পড়ল সোহেল, বলল, 'আশা করা যায় মেয়েটা সুস্থ হয়ে উঠবে।'

রানা অতি ক্লান্ত, তবুও ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। একটা প্রাণ ঝরে যায়নি। একটু দূরে দু'জন ডেক-হ্যাণ্ডকে দেখল ও। ওরা প্রিমিয়াম আইসক্রিম খাচ্ছে।

সোহেল বলল, 'ফারা রাইনার আমাদের বড় ফ্রিযারটা কেড়ে নিয়েছে।'

দু'জনই জানে, কেন নিয়েছে। অন্যদিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। ফারা মৃতদেহ ফ্রিযারে রেখেছে। ওরা মানুষগুলোকে বাঁচাতে পারেনি।

আট

সারা শরীরের ব্যথা নিয়ে ঘুম ভাঙল জুডি স্টিভেনসনের। ব্যথা! খুব ব্যথা! হাঁটু আর কপাল যেন ছিঁড়ে যাবে। অন্য জায়গায় অতটা ব্যথা নেই, টিসটিস করছে। চোখ খুলল, বারবার পাতা নেড়ে ঘুম-ঘুম ভাব দূর করতে চাইল। মাথার উপরে উজ্জ্বল ফ্লুরোসেন্ট বাতি জ্বলছে। কাছেই পোর্টহোল, ওখান দিয়ে আলো আসছে। তিনজন মানুষ ওর দিকে ঝুঁকে আছে। কেন যেন মনে হলো এরা ওর ক্ষতি করবে

না। মহিলার গায়ে ডাক্তারের সাদা কোট, চোখ দুটো বেগুনী। লোক দু'জন একই বয়সী, একজনের হাত নকল। তার পাশের লোকটাকে চেনা-চেনা লাগছে। কেন? তাকে নিষ্ঠুর মনে হয়, আবার একইসঙ্গে চোখে এত মায়া! গাঢ় কালো চোখ দুটো ওকে দেখছে। সচেতন হয়ে উঠল জুডি।

সাদা কোট পরা মেয়েটা বলল, 'ফিরলে তা হলে।' ও ডাক্তার। উচ্চারণ বলছে ও ইংরেজ নয়। 'কেমন লাগছে এখন?'

জবাব দিতে চাইল জুডি, গলা দিয়ে কর্কশ একটু আওয়াজ বেরল। নিষ্ঠুর লোকটা কাপ আর স্ট্র নিয়ে ঝুঁকল, ঠোঁটে স্ট্র ধরল।

ওর মনে হলো জিভ মরুভূমি হয়ে গেছে, পানিটুকু প্রথম বৃষ্টির মত পড়ল। লোভীর মত চুমুক দিল জুডি। পানি এত মিষ্টি হয়? চোঁ-চোঁ করে কাপ শেষ করল। এবার বলল, 'আমার মনে হয়...' বেদম কাশি ওকে থামিয়ে দিল। দশ সেকেণ্ড পর খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'এখন ভাল লাগছে। কিন্তু খুব শীত!'

এবার খেয়াল করল, ওর উপরে কয়েকটা কম্বল চাপানো হয়েছে। সবচেয়ে নীচেরটা ইলেকট্রিক ব্ল্যাঙ্কেট। ওটার কারণে ত্বকে কেমন যেন চিড়চিড়ে অনুভূতি।

'তোমাকে যখন আনা হয়, তখন তোমার কোর টেমপারেচার বলছিল তুমি বাঁচবে না,' বলল ডক্টর রাইনার, 'কপালের জোরে বেঁচে গেছ।'

কেবিনের চারপাশ দেখল জুডি।

নীরব প্রশ্নের জবাবে বলল ফারা, 'এটা জাহাজের ইনফারমারি। আমি ফারা রাইনার। এঁরা মাসুদ রানা ও সোহেল আহমেদ।' রানাকে দেখাল। 'উনিই তোমাকে উদ্ধার করেছেন।'

অবাক হয়ে রানার দিকে তাকাল জুডি। 'উদ্ধার?'

'আপনার কিছু মনে নেই?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

স্মৃতি হাতড়াল জুডি। 'হামলা হয়েছিল। ঘুমাচ্ছিলাম। গোলাগুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। কেবিনে লুকিয়ে ছিলাম। তারপর...' চিন্তায় পড়ে চুপ হয়ে গেল।

'সময় নিন,' বলল রানা।

'আপনার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে,' বলল সোহেল।

'মনে পড়ছে হামলার পর জাহাজে একা ঘুরে বেড়িয়েছি।' দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল জুডি। সান্ত্বনা দেবার জন্য কাঁধে হাত রাখল রানা, এর ফলে সামলে নিল মেয়েটা। 'জাহাজে পড়ে ছিল লাশ। ক্রুরা সবাই মারা গেছে। ...তারপর আর কিছুই মনে নেই!'

'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই,' বলল ফারা। 'মানুষের মগজে ডিফেন্স মেকানিজম আছে, ওটা এ-ধরনের ট্রমা ঠেকায়।'

'জলদস্যুরা আপনাদের জাহাজে উঠে সবাইকে মেরে ফেলল,' বলল রানা, 'আমরা যখন ওখানে যাই, তখন অ্যাভালাঞ্চ সাগরের সত্তর ফুট নীচে।'

'তার কয়েকদিন আগে জাহাজটা ডুবে গেছে,' বলল সোহেল। 'আপনাদের জাহাজ একটা অতিরিক্ত লবণের স্তরে আটকা পড়ে।'

'কয়েকদিন আগে ডুবে গেছে?' শিউরে উঠল জুডি।

'নিজেকে তুমি নতুন জোনাহ্ বলতে পারো,' মৃদু হাসল ফারা। 'তবে তিমির পেট থেকে নয়, জাহাজের পেট থেকে বের করা হয়েছে তোমাকে।'

জুডির চোখ বিস্ফারিত হলো। 'এখন মনে পড়ছে!' রানার দিকে তাকাল। 'আমি আপনাকে আমার পোর্টহোলের ওপাশে দেখেছি! আপনি সাঁতার কাটছিলেন!'

শ্রাগ করল রানা। ভাব দেখে মনে হলো এটা কোনও বড় ব্যাপার নয়।

'আপনিই আমাকে অ্যাফট হ্যাচওয়েতে যেতে বলেন। দরজা আটকে রাখতে বলেন। আপনিই হ্যাচে ড্রিল করেন। আমার মনে হয়েছিল আমাকে মেরে ফেলবেন। আরেকটু হলে দৌড়ে গিয়ে আমার কেবিনের দরজা বন্ধ করে দিতাম। পরে বুঝলাম, আপনি ভেতরের পানির চাপ সমান করতে চাইছেন। তখন খুব ভয় পেয়েছি। কেবিনে আস্তে আস্তে পানি ঢুকছে! ভয়ে সিঁড়ি বেয়ে ব্রিজের কাছে চলে গেছি! তারপর পানি উঠে এল। দেখলাম, পালাবার পথ নেই।' শিউরে উঠল জুডি। মনে হলো আবার ওই শীতল পানিতে পড়ে গেছে। 'তারপর পানি বুক পার হয়ে গেল। মনে হলো হাজার বছর ওখানে থাকলাম। ঈশ্বর জানেন, ওখানে এত শীত! আগে কখনও এত শীত করেনি। দাঁতে দাঁত খটাখট বাড়ি খাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল দাঁতগুলো পড়ে যাবে।' বিছানার পাশে দাঁড়ানো মানুষগুলোকে দেখল ও। 'তারপর তো একটু আগে ঘুম ভাঙতেই দেখি আপনারা এখানে।'

'আপনাদের জাহাজ দ্রুত ডুবতে লাগল,' বলল রানা। 'হোল্ডে পানি ঢোকায় বো-টা নেমে গেল। সে-সময় ছিটকে পড়ে মাথায় ব্যথা পেয়েছেন। আমরা ঘরে ঢুকে দেখি আপনি অচেতন হয়ে পড়ে আছেন।'

এক হাতে কপাল স্পর্শ করল জুডি। কপাল জুড়ে পুরু ব্যাণ্ডেজ।

'রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে আমাদের,' বলল সোহেল। 'তাঁরা আপনার আত্মীয়দের জানিয়েছেন, আপনি ভাল আছেন। আমরা জাপানের রেঞ্জে পৌঁছে গেলে আপনার জন্যে একটা হেলিকপ্টার পাঠানো হবে।'

'আপনি শিওর তো যে হামলার ব্যাপারে আর কিছু জানেন না?' নরম স্বরে বলল রানা। 'জরুরি কিছু বাদ পড়েনি তো?'

ভ্রূ কুঁচকে ভাবল জুডি। 'নাহ্। আর কিছু তো মনে পড়ছে না!' ডাক্তারের দিকে তাকাল। 'আপনি ঠিকই বলেছেন, ওই ট্রমার কারণে কিছু মনে পড়ছে না।'

'গতরাতে আপনি যখন এখানে আসেন তখন আমাদের এক অফিসার উর্বশী দাশার সঙ্গে কথা বলেন,' বলল রানা। 'ওর সঙ্গে যা বলেছেন, মনে পড়ে?'

'না।' জুডির কথা একটু তপ্ত শোনাল। 'তখন নিশ্চয়ই কোনও ঘোরে ছিলাম।'

ফারা চোখের ইশারায় রানাকে চুপ করতে বলল। পাত্তা দিল না রানা, 'আপনি ওকে বলেন আপনি রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির রিসার্চার। জলদস্যুদের আক্রমণের কথা বলছিলেন। তখন আপনি কেবিনে লুকিয়ে ছিলেন, দেখেন এক লোক কালো ইউনিফর্ম পরে ঘরে ঢুকেছে। পায়ে কমব্যাট বুট ছিল।'

'তা-ই যদি বলে থাকি, তা হলে নিশ্চয়ই তা-ই। কিন্তু কিছুই মনে পড়ছে না।'

'আপনি আরও বলেন দুটো জাহাজ দেখতে পান। ওগুলোর একটা এত বড় যে দ্বীপের মত মনে হয়েছে। ওটা প্রায় চারকোনা। অন্য জাহাজটা অনেক ছোট। মনে হয়েছে দুটোর সংঘর্ষ হবে।'

'হামলার পরে কী ঘটেছে বলতে পারব না।' মাথা নাড়ল জুডি। 'চার দিন অ্যাভালাঞ্চে আটকে ছিলাম সেটাও মনে নেই!' ফারার দিকে তাকাল। 'ডক্টর, আমি এখন একটু ঘুমাতে চাই।'

'নিশ্চয়ই!' চট্ করে রানার দিকে তাকাল ফারা, বলল, 'আমার অফিস তোমার ঘরের ওপাশে, জুডি। কিছু দরকার হলে ডাক দিয়ো।'

'ধন্যবাদ, ডক্টর।' রানাকে দেখল জুডি, কয়েক সেকেণ্ড অস্বস্তিকর সময় পেরল, তারপর বলল, 'আমাকে বাঁচানোর জন্যে ধন্যবাদ।'

'ইউ আর ওয়েলকাম,' মৃদু হাসল রানা।

ওরা কেবিন থেকে বেরিয়ে এল। ফারা নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল।

মেডিকেল বে ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা-সোহেল। পাশে হাঁটতে হাঁটতে সোহেল বলল, 'মেয়েটা দেখতে দারুণ!'

'মিছেকথায় কেমন?' বলল রানা।

'চ্যাম্পিয়ান!'

তিক্ত হাসল রানা। 'উর্বশী ওর পেটের সব কথা বের করতে পারেনি। আমার তখনই ওর সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল।'

'তুই অতিরিক্ত ক্লান্ত ছিলি। নিজের কেবিন চিনে ফিরেছিস, সেটাই বেশি। আর আমিও ভাবিনি মেয়েটা জেগে উঠে মুখে তালা মারবে।'

'আমরা উর্বশীর কাছে শুনেছি জুডি জলদস্যুদের ইউনিফর্ম দেখেছে। আমার ধারণা, ও কোনও মিলিটারি ট্রেইনিং পেয়েছে।'

মাথা দোলাল সোহেল। 'আমার বিশ্বাস ও রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির রিসার্চার নয়, ওরা যা-ই বলুক। ভেতরে প্যাঁচ আছে। এই মেয়ে মনে রেখেছে, চারদিন আগে হামলা হয়েছে। আমরা কেউ এ-ব্যাপারে কথা বলিনি। কিন্তু দিন-ক্ষণ বলে দিচ্ছে।'

'মিথ্যা বলছে কেন জানা দরকার।'

'আটকে তো রাখতে পারব না,' বলল সোহেল। 'তিন ঘণ্টা পর রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির চপার আমাদের হেলি-প্যাডে নামবে ওকে নিয়ে যেতে।'

মনে হলো রানা নিজের সঙ্গে আলাপ করছে, 'ইউনিফর্ম। জুডি বলেছে জলদস্যুরা কালো ইউনিফর্ম পরে। কিন্তু গতকাল যাদের সঙ্গে টক্কর লাগল, ওদের পরনে ছিল টি-শার্ট, জিন্স আর হাফপ্যান্ট। দুটো হামলা কিন্তু মোটেই মিলছে না।'

'সম্ভবত আলাদা দুটো দল,' বলল সোহেল।

অপারেশন্স সেন্টারে ঢুকল ওরা। ডিউটিতে আছে উর্বশী। ওদের দেখে বলল, 'মেয়েটা কী বলল?'

'বলছে এখন আর কিছুই মনে পড়ছে না,' বলল রানা। 'ইউনিফর্ম বা জাহাজের কথা ভুলে গেছে।' নিজের সিটে বসল ও। সোহেল গিয়ে নিজেরটায়।

'ভীষণ মিথ্যুক মেয়ে তো!' বলল উর্বশী। 'গতকাল বলেছে বিরাট একটা

চারকোনা জাহাজ দেখেছে।'

'ওর ডাহা মিথ্যা বলার পিছনে কোনও কারণ আছে,' বলল সোহেল।

ভ্রূ কুঁচকাল উর্বশী। 'আমাকে যখন বলছিল, মনে হচ্ছিল ও কোনও কেস অফিসারকে রিপোর্ট করছে।'

'তখন ভেবেছে আর বাঁচবে না,' বলল সোহেল, 'উপায় না দেখে বলেছে আপনাকে।'

মাথা দোলাল উর্বশী। 'আমারও তা-ই মনে হয়েছে। জুডি স্টিভেনসন সাধারণ কোনও মেরিন রিসার্চার নয়, ওর অন্য কোনও পরিচয় বা উদ্দেশ্য আছে।'

'মার্ভেলের মুন পুল দেখেছে ও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না,' বলল সোহেল। 'জ্ঞান হারাচ্ছে তখন। ফারা পানি থেকে তুলে তোয়ালে পেঁচিয়ে নিয়ে গেছে। দেখার পথ ছিল না ওর।'

'মেডিকেল বে-তে নিয়ে শরীরে তাপ দিল ফারা,' বলল উর্বশী। 'জে পাখির মত নীল ছিল তখন, জোর হাওয়ায় বাঁশ পাতা যেমন কাঁপে, সেরকম কাঁপছিল। তবে জাহাজটার কথা বলতে ভোলেনি।'

'সাধারণ কেউ অ্যাভালাঞ্চে একা থাকলে পাগল হয়ে যেত,' বলল সোহেল। 'কিন্তু সামলে নিয়েছে।'

'চায় কী ও?' বলল উর্বশী।

অন্য প্রসঙ্গে সরে গেল রানা, 'ধরে নিই এদিকের পানিতে দু'দল জলদস্যু আছে। একটা দল আমাদের সঙ্গে জুটে যায়, আরেক দল চারদিন আগে অ্যাভালাঞ্চে হামলা করে। ওরা ছিল ট্রেইণ্ড কমাণ্ডো। জুডি বলেছে, ওরা দেরি করেনি, সবাইকে খুন করে জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে চলে যায়। তখন রহস্যময় জাহাজটা ওখানে ছিল। আমাদের জানতে হবে এখানে আমাদের ভূমিকা কী।'

'আমরা বে-আইনী আদম-ব্যাপারির খোঁজ করছি,' বলল সোহেল, 'জুডি মুখ খুললে হয়তো জরুরি তথ্য পাওয়া যেত। এমন কিছু, যেটা থেকে বোঝা যায় মানুষগুলো কন্টেইনারে কেন।'

এসবের জবাব ওদের জানা নেই। অপারেশন্স সেন্টারে নীরবতা নামল।

রানা বুঝতে পারছে না জুডি স্টিভেনসন কেন সহযোগিতা করছে না। ওকে উদ্ধার করবার আগে ডাইভ স্লেটে লিখেছে ও, ওরা একটা সিকিউরিটি কোম্পানিতে কাজ করে। ওদের কাজ জলদস্যুদের ঠেকানো। তখন কিন্তু মেয়েটা পরিষ্কার পড়েছে, বুঝেওছে। কিন্তু এখন সব কথা এড়িয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা কিছুর সঙ্গে জড়িত। সেটা কী?

রানা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, যত দ্রুত সম্ভব মেয়েটাকে বিদায় দেবে।

'কী খবর তোদের?' অনিল চ্যাটার্জি অপারেশন্স সেন্টারে ঢুকেছে, নিজের সিটে গিয়ে বসল।

'তুই তো রিসার্চ করতে ভালবাসিস,' বলল রানা। 'বল্ দেখি এমন একটা জাহাজ আছে, যেটা দেখলে মনে হয় দ্বীপের মত বিশাল। ওটা চারকোনা। পারবি?'

'ঠাট্টা করছিস?'

'না। জরুরি।'

কম্পিউটার অন করল অনিল। 'আরও তথ্য ছাড়।'

'চারদিন আগে ওটা এদিকে ছিল।'

'আর কিছু তথ্য তো ছাড়বি? ওটা কন্টেইনার শিপ, সুপার ট্যাঙ্কার, নাকি এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার?'

'এয়ারক্র্যাফ্ট্ ক্যারিয়ার বলে মনে হয় না।'

মার্ভেলের যে-কোনও স্টেশন থেকে মেইনফ্রেম কম্পিউটারের সাহায্য পাওয়া যায়। মেরিটাইম ডেটা বেইস-এ ঢুকল অনিল, সী অভ জাপানে উঁকি দিল।

'রিসার্চারদের কপ্টার কখন আসবে, উর্বশী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ইটিএ তিন ঘণ্টা,' জানাল উর্বশী।

মার্ভেলের শক্তিশালী রেইডার একশো মাইল কাভার করে। সবকটা জাহাজ ধরা পড়ল। এদিকের সাগরে পাঁচটা আছে। ইচ্ছে করলেও মার্ভেলের ইঞ্জিনের পুরো ক্ষমতা ব্যবহার করা যাবে না। ওরা তো এখন একটা ঝক্কর মারা স্টিমার, বিশ নটে এগিয়ে চলেছে। ইচ্ছা হলেও এগিয়ে গিয়ে চার্টার্ড হেলিকপ্টারের সঙ্গে দেখা করা যাবে না।

চেয়ার ছাড়ল রানা। 'আমি কেবিনে থাকব। নাকিমুচিকে জানাব একদল জলদস্যু আর ওদের বিরক্ত করবে না। অনিল, কিছু পেলে জানাস। উর্বশী, কপ্টার দশ মাইলের মধ্যে এলে জানিয়ো।'

একঘণ্টা হলো নাকিমুচির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে রানা। কেবিনে বসে এখন একটার পর একটা সিগারেট শেষ করছে। বারবার জুডির দেয়া তথ্যগুলো মনে পড়ছে, আর ভাবছে—সাগরে হচ্ছেটা কী? একদল কমাণ্ডো অ্যাভালাঞ্চে হামলা করল। কেন? ওরা সম্ভবত চায়নি অ্যাভালাঞ্চের কেউ ওই জাহাজ দুটো দেখে ফেলুক। তাই মেরে ফেলতে হবে? ওখানে এমন কী ঘটছিল? ওই বিরাট জাহাজটা কী এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার? ওখানে কোনও গভার্নমেন্ট অপারেশন চলছিল? আমেরিকার? চায়নার? চায়নার হলে ফু-চুং জানত।

জানা কথা এদিকের সাগরে আমেরিকান এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার রয়েছে। অ্যাভালাঞ্চ ডুবিয়ে দিয়ে ওদের কী লাভ? জুডি যেটা দেখেছে, সেটা অন্য কোনও ধরনের জাহাজ। একদল কমাণ্ডো অ্যাভালাঞ্চ ডুবিয়ে কী পাবে? যে-সব জলদস্যু মার্ভেলে উঠেছে, তাদের সঙ্গে কাজ করছে ওরা?

ইন্টারকমের মৃদু আওয়াজে চটকা ভাঙল রানার, রিসিভার তুলে নিল।

ফারা রাইনার বলল, 'রানা, আমার অফিসে আসতে পারবে?'

চিন্তার কোনও ফসল নেই, তথ্য ছাড়া শুধু শুধু মাথা খাটানো, বিরক্ত হয়ে উঠেছে রানা, ফারার কথায় বেঁচে গেল। 'আসছি।' সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে এল ও, চলে এল মেডিকেল বে-তে। ফারাকে ট্রমা রুমে পাওয়া গেল। তাপমাত্রা এখানে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি। লাশটা উজ্জ্বল আলোয় একটা গার্নিতে পড়ে আছে। সবুজ সার্জিকাল স্ক্রাব পরে আছে ফারা। গ্লাভ্স্ রক্তে মাখা। শক্তিশালী ভেন্টিলেটারগুলো পচা লাশের গন্ধ সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তবুও কেমন

একটা বিশ্রী গন্ধ রয়ে গেছে।
লাশের পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'চাইনিজ?'
'না। পাইরেটদের একজন। লাশটা দেখবে?'
কোনও জবাব দিল না রানা। চাদরটা সরিয়ে নিল ফারা। লাশের বুক-পেট কেটে ভিতরের অঙ্গগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে। লোকটার বয়স বড়জোর পঁচিশ। হাড়গুলো বেরিয়ে আছে, মনে হয় ভাল খেতে পেত না। মাথা ভরা চুলগুলো নোংরা। হাতে-পায়ে বড়বড় কড়া। পরনে জিন্স। পায়ে ছেঁড়া কেড্স্। কপালে টিপের মত একটা জায়গা, ওখান দিয়ে বুলেট ঢুকেছে। মনে হলো ওটা তৃতীয় নয়ন। ফুটোর চারপাশে হাড়-মাংস থেঁতলে গেছে।
চাদর দিয়ে লাশ ঢেকে দিল ফারা। রানা বলল, 'কী পেলে?'
'এটুকু বলা যায়, এ মারা গেছে।'
'সরি? বুঝলাম না।'
'বুলেট না খেলেও মরত। বড়জোর দু'মাস টিকত।' হাতের ইশারায় ওয়ার্ক স্টেশন দেখাল ফারা।
স্ক্রিনে স্পেকট্রো-গ্রাফের লাইনগুলো কিছুই বুঝল না রানা, ডাক্তারের দিকে তাকাল।
'চুলগুলো অপটিকাল এমিশন স্পেকট্রোমিটারে পরীক্ষা করেছি,' ব্যাখ্যা দিল ফারা। 'দেখলাম ধরা পড়ছে সিগনিফিকেন্ট সিম্পটোম্যাটোলজি। এই লোক কমপ্লিট রেনাল ফেইলারের ঝুঁকিতে রয়েছে—একেবারে শেষ পর্যায়ে। এ লোক রক্তশূন্যতায়ও ভুগছে। মাড়ি ফুলে আছে সিভিয়ার জিনজিভাইটিসে। গোটা ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টে জখম পেয়েছি, জমাট রক্ত পাওয়া গেছে নাকের ফুটোতেও। বুঝতেই পারছ, সেজন্যেই ওর চুল পরীক্ষা করা।'
মনে মনে বলল রানা, 'আরে ছেমড়ি, আমি এসবের কী জানি?' কিন্তু সমঝদারের মত মাথা ঝাঁকাল। 'তারপর? কী মনে হচ্ছে এখন?'
'এই লোক বহুদিন ধরে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত ছিল। এর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে মারকিউরি।'
'মারকিউরি? পারদ?'
'হ্যাঁ। ভারী ধাতুর বেলায় ট্রিটমেন্ট না করলে যা হয়। মারকিউরি এর টিশ্যু আর চুলে জমেছে। এরকম ঘটলে একসময় শরীর পুরোপুরি কলাপ্স্ করে। মারকিউরির ফলে প্রথমে যায় মগজ। মানুষ পাগলামি শুরু করে। পাইরেটদের লড়াইয়ের ভিডিও আছে তোমাদের কাছে, দেখলেই প্রমাণ পেয়ে যাবে—এসব উন্মাদ লোকজন মৃত্যুর চিন্তা না করেই লড়াই করে।'
'ওদের কয়েকজন পালাবার চেষ্টা করেছে,' বলল রানা।
'ওদের মধ্যে হয়তো বিষক্রিয়া কম ছিল।'
'আর কন্টেইনারের মানুষগুলোর কী হয়েছে?'
'আমি মাত্র একজনকে দেখেছি। ওই মেয়েটা ক্লিন ছিল।'
'জলদস্যুরা পারদের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত?'
হাতের ইশারায় লাশটা দেখাল ফারা। 'ওর দেহে যা আছে তাতে তিনটে

থারমোমিটার ভরতে পারবে। আমি আরও দু'জনকে পরীক্ষা করে দেখেছি—একই অবস্থা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'আমরা যদি মারকিউরির উৎস বের করতে পারি, জলদস্যুদের খোঁজ পাব। এই তো?'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে।' গ্লাভ্‌স্‌ খুলে ফেলল ফারা। 'মারকিউরিতে ভরা পানিতে মাছ থাকলে কী হয়? ওগুলো খেলে বিষক্রিয়া হয়। বেশি ক্ষতি হয় শিশু আর মহিলাদের। কিন্তু এখানে যা দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে এই লোকগুলো কোনও ইণ্ডাস্ট্রিতে কাজ করত। হয়তো মারকিউরির খনিতে... কিংবা আর কোথাও যেখান থেকে শরীরে ঢুকেছে এই বিষ।'

'এদিকে মারকিউরির খনি...' আনমনে বলল রানা। 'এরা কোন্‌ দেশের মানুষ?'

'পাইরেটদের পনেরোটা লাশ আছে,' বলল ফারা। 'একেক দেশের মানুষ। দু'জনকে মনে হয় থাই বা ভিয়েতনামি। দু'জন চাইনিজ। তিনজন ককেশিয়ান। অন্যরা উপ-মহাদেশীয়।'

'উপ-মহাদেশীয়?'

'ভারত, পাকিস্তান বা বাংলাদেশের হতে পারে।'

'আর কিছু?'

'আপাতত আর কিছু নেই,' শ্রাগ করল ফারা। 'আগে সব দেখব, তারপর রিপোর্ট দেব। চার-পাঁচ দিন লাগবে।'

'তোমার রোগিণী কী করছে?'

'ঘুমাচ্ছে। অথবা চুপ করে পড়ে আছে। আমার সঙ্গে আলাপ করবে না। মনে হলো, কারও সঙ্গেই কথা বলবে না। ও যত শীঘ্রি সম্ভব মার্ভেল ছেড়ে পালাতে চাইছে।'

'তা-ই?' মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'আশ্চর্য! থ্যাঙ্ক ইউ, ডক্টর।' ফারাকে হাসতে দেখে ভুরু কোঁচকালো। 'হাসছ যে?'

'হাসছি তোমার পোড়া কপাল দেখে। এত কষ্ট করে মেয়েটার প্রাণ বাঁচালে, উদ্ধার করে নিয়ে এলে... কিন্তু লাভ হলো না, এখন পালাতে চায়।'

'লাভ? কীসের লাভ?' আরও কুঁচকে গেল রানার ঘন ভুরু।

'না, মানে... এত কিছুর পর তোমার তো কিছু প্রাপ্য হয়...' খিল খিল করে হেসে উঠল ফারা।

এবার রানাও হাসল। 'তোমার যেমন প্রাপ্য হয়েছে সোহেলের কাছে? আফগানিস্তানে নিঃস্বার্থভাবে ওর প্রাণ বাঁচিয়ে এখন ওকে দখল করার...'

হাত মুঠো করে চোখ পাকালো ফারা, 'ভাল হবে না বলে দিচ্ছি! ওর জন্যে আসিনি আমি, এসেছি তোমার কথায়!'

'সোহেল সঙ্গে আছে জানার পরেই তো রাজি হলে, তাই না?'

ডাক্তারকে তেড়ে আসতে দেখে এক লাফে বেরিয়ে গেল রানা কামরা থেকে। চট্‌ করে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মুচকি হাসি ফারার ঠোঁটে। নিজের কেবিনে ফিরে এল রানা। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে ডুবে গেল চিন্তায়। তিন মিনিট পর দরজা

খুলে গেল। অনিল। হাতে সরু একটা ফাইল।

'কী রে, কিছু পেলি?' সোজা হয়ে বসল রানা। সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল।

মুখোমুখি বসে সিগারেট ধরাল অনিল, 'মনে হয় যা চাই, তা পেয়ে গেছি।'

'বাল্ক ক্যারিয়ার, না কোনও কন্টেইনার শিপ?'

'না, অন্য জিনিস।' ফাইলটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল ও।

ভিতরে একটা মাত্র ছবি। তার নীচে অর্ধেক পাতা বিবরণ।

ছবিটা একবার দেখে বন্ধুর দিকে তাকাল রানা। 'তুই শিওর?'

'ওটা জাপানের ওরাটু ছেড়ে তাইওয়ানে চলেছে। একটা আমেরিকান ট্যাঙ্কার ঝড়ে প্রপেলার হারিয়েছে, ওটাকে মেরামত করবে।'

ছবিটা আরেকবার দেখল রানা। ভেসেলটা আটশো ফুট লম্বা, চওড়ায় দুশো চল্লিশ ফুট। জুডি ঠিকই বলেছে, জাহাজটা পুরোপুরি চারকোনা ধরনের। বো বা স্টার্ন—কোনটা যে কী, বোঝা মুশকিল! একটা ঘাসহীন সমতল মাঠ বলা যায়। কিছুই উঁচু হয়ে নেই। বিদ্‌ঘুটে জাহাজটা দুনিয়ার চতুর্থ বড় ভাসমান ড্রাই-ডক। রাশার তৈরি। ব্যবহার করা হতো অস্কার টু-ক্লাস সাবমেরিনের জন্য। বেশ কয়েক বছর আগে ডুবে যাওয়া কুরস্ক ওরকমই সাবমেরিন। ওগুলো পেটে রেখে মেরামতি করত ড্রাই-ডকগুলো। রাশানরা ড্রাই-ডকটা একবছর আগে জার্মানির এক স্যালভেজ ফার্মের কাছে বিক্রি করেছে। তারা আবার বিক্রি করেছে একটা ইন্দোনেশিয়ান জাহাজভাঙা কোম্পানির কাছে।

রানার বুকের ভিতরে রক্ত ছলকে উঠল।

ওই ড্রাই-ডক আস্ত জাহাজ হাইজ্যাক করতে পারবে। উপযুক্ত কেউ নেতৃত্ব দিলে কাজটা সম্ভব। জিনিসটার প্রকাণ্ড আকৃতি বলে দিচ্ছে, ওটা যে-কোনও জাহাজ হজম করতে সক্ষম!

একদল কমাণ্ডো জাহাজগুলোতে ডাকাতি করে? তারাই কী জলদস্যুদেরকে ব্যবহার করছে? তাদের দিয়ে জাহাজ কাছে আনিয়ে নিয়েছে, এমনসময় অ্যাভালাঞ্চ দেখা দিল? কাজেই রিসার্চারদের খুন করতে হলো? রাতের আঁধার, ভাল আবহাওয়ায় ড্রাই-ডক ব্যালাস্ট কমাবে, হোল্ডের দরজা খুলে দেবে। হোল্ডের মেঝের অনেক উপরে থাকবে জাহাজের কীল। ভাসমান ডকের স্টার্নের বিরাট উইঞ্চগুলো চোরাই জাহাজ টেনে হোল্ডে ভরবে, বো-র ফটক বন্ধ হয়ে যাবে। পাম্পগুলো পেটের পানি বের করে দেবে, টাগ-বোটগুলো ড্রাই-ডক নিয়ে রওনা হবে। চারপাশের কেউ দেখতে পাবে না হোল্ডে একটা জাহাজ আছে। দেখবার একটাই পথ—মাথার উপর দিয়ে প্লেন উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া।

'কী বুঝলি?' অ্যাশট্রেতে সিগারেট ফেলে বলল অনিল। 'ভাল বুদ্ধি! ওরা এগোবে আর আশপাশে জাহাজ পেলে গিলে ফেলবে।'

'কাছাকাছি কোথাও আস্তানা আছে ওদের,' বলল রানা। 'ওরা জাহাজ ডাকাতি করছে, কিন্তু মানুষগুলো কোথায় যাচ্ছে?'

'সম্ভবত খুন করছে,' বলল অনিল। 'জাহাজগুলো ডকে নিয়ে ভাঙছে, বা আকৃতি বদলে নতুন রং করছে, স্টার্নে নতুন নাম লিখে নিজেরাই সাগরে

নামাচ্ছে। অনেক কিছু হতে পারে।'

'ড্রাই-ডকের কোম্পানির ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছিস? ড্রাই-ডকের নামটা জানা দরকার।'

'ওটার নাম দ্য চুহা।'

'দ্য চুহা? ছুঁচো?'

'ছুঁচো কিনা কে জানে!' শ্রাগ করল অনিল। 'কোম্পানিটা একশো এগারো বছর ধরে ব্যবসা করেছে। ওরিয়েন্টাল লাইন্স কোম্পানিজ। তবে বছর দশেক আগে থেকে একটু একটু করে ওটার সমস্ত শেয়ার কিনে নিয়েছে এক বা একাধিক লোক। শেল কোম্পানি বলতে পারিস। আপাতত মালিকের কারও আসল নাম পাওয়া যাবে না।'

'যাবে না?'

'না। খোঁজ নিতে গেলে একশোটা কোম্পানির নাম বেরিয়ে আসবে। এনপি অ্যাডভাইজার্স এলএলসি, ফাইন্যানশিয়াল অ্যাসে এলএলসি, কমেট ট্রেডিং এলএলসি... কত চাস?'

'অ্যাসে?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, 'অ্যাসে তো মাইনিং টার্ম। ফারা বলেছে জলদস্যুরা পারদের বিষক্রিয়ায় মরছিল। আমার মনে হয়েছে, ওরা এদিকের পরিত্যক্ত কোনও পারদের খনিতে কাজ করত।'

'হতে পারে। শেল কোম্পানিগুলোর ভেতরে ঢুকব আমি। সময় লাগবে, কিন্তু কিছু না কিছু বেরিয়ে আসবেই। তুই ড্রাই-ডকের খবর চেয়েছিস, তা-ই ওদিকে আর সময় দিইনি।'

'লেগে পড়। আমাদের জানতে হবে দ্য চুহার মালিকটা কে। শেল কোম্পানি দিয়ে কাজ হবে না। বেতন যে দেয়, সেই আসল লোকটাকে দরকার।'

'ড্রাই-ডকের কী করবি? মেয়েটা হয়তো ঠিকই বলেছে, ওটার ভেতরে একটা জাহাজ আছে। হয়তো ক্রুদের জিম্মি করেছে!'

'দুনিয়ার সেরা টাগও দ্য চুহাকে ঘণ্টায় ছ-সাত মাইলের বেশি টানতে পারবে না। আমরা ওদের সহজেই ধরতে পারব।'

'ওটাতে উঠবি ভাবছিস?'

'আমি না,' মাথা নাড়ল রানা। 'আমি অন্য কাজ করব।'

আর কিছু বলল না রানা, চট করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। ওদের দলকে এখন কয়েকটা ভাগে কাজ করতে হবে। শুধু জাহাজে থাকলে হবে না, মাটিতে নিজেদের লোক দরকার। এমন কোথাও থাকতে হবে, যেখানে চট্ করে প্লেনে ওঠা যায়। এই অ্যাসাইনমেন্ট ওদের কোথায় নিয়ে যাবে, কেউ বলতে পারে না। ইন্দোনেশিয়ায় নিশ্চয়ই ওরিয়েন্টাল লাইন্স কোম্পানির অফিস থাকবে। হয়তো ওখানে যেতে হবে।

চেয়ার ছাড়ল অনিল, ফাইলটা তুলে নিল। 'চললাম, দেখি কী পাই।'

'দ্যাখ্।'

অনিল চলে যাওয়ায় ইন্টারকমে লিউ ফু-চুংকে ধরল রানা। 'তুই ব্যাগ গুছিয়ে নে। সঙ্গে কোনও অস্ত্র রাখতে পারবি না। এয়ারপোর্টে যাতে ধরা না খাস। সঙ্গে

দু'জন নিবি। জুডি স্টিভেনসনের কপ্টারে চড়ব আমরা।'

একটু অবাক হলো ফু-চুং, জিজ্ঞেস করল, 'যাবি কোথায়, সেটা তো বলবি?'

'আপাতত সোজা জাপানে। অনিল একটা কোম্পানির তথ্য ঘেঁটে বের করবে আসল মালিক কে। এরপর ঠিক হবে আমরা কোথায় যাব। ...লাঞ্চের সময় হয়ে এল, খাওয়ার টেবিলে তোদের খুলে বলব সব।'

নয়

ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন খুশি হতো মুদাস্সর আলী খানের জাকার্তা-অফিসে মিটিং হলে। কিন্তু লোকটা জেদ ধরেছে। ছাড়বে না, তার নতুন কারখানা ঘুরিয়ে দেখাবে। কাজেই সুমাত্রার সুন্দা স্ট্রেইট-এ যেতেই হচ্ছে। লোকটা বলেছে, কষ্ট করে ফেরিতে উঠতে হবে না, সে তার কোম্পানির হেলিকপ্টার পাঠিয়ে দেবে।

তা-ই পাঠিয়েছে। সরোকিন এখন কপ্টারের পিছনের সিটে বসে রয়েছে। হলদেটে প্লেক্সিগ্লাসের ভিতর দিয়ে নীচের নীল সাগর, রুপালি সৈকত আর ঘন সবুজ জঙ্গল দেখছে।

আধুনিক সভ্যতা এখনও পৌঁছেনি এখানে। মাঝে মাঝে নীচে দুয়েকটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। খুদে সব উপসাগরে ছোট ছোট নৌকোর মেলা বসেছে। খোঁজ নিলে হয়তো জানা যাবে, একশো বছর আগে বর্তমান মালিকদের প্রপিতামহরা বানিয়েছে ওগুলো!

বাঁ দিকে বিশাল জঙ্গল। হাজারও-কোটি পাতা একটা সবুজ ছাদ তৈরি করেছে। কোথাও কোনও ফাঁক দেখা যায় না। এখানে গাছ কেটে খামারের জন্য জমি আদায় করেনি কেউ। ডানে দিগন্ত জুড়ে নীল সাগর। দুই মাস্তুলওয়ালা একটা স্কুনার পাল তুলে রাজহংসীর মত চলেছে কোথাও। আরও একটু সামনে পুরনো একটা ফ্রেইটার বাণিজ্য-হাওয়ায় পাল ফুলিয়ে নিয়ে ছুটছে। পরিবেশটা যেন উনবিংশ শতাব্দীর।

অবাক হয়ে ভাবছে সে, এই স্বপ্নঘেরা দ্বীপপুঞ্জের সহজ সরল মানুষ জাকার্তার মত এক কোটি আশি লক্ষ মানুষের একটা নরক বানালো কী করে! রাস্তায় যেখানে সারাক্ষণ লেগে থাকে যানজট, অলিতে গলিতে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অপরাধ; ধুলো-ধোঁয়ায় দম নেয়া যায় না; নিজেদের যা ভাল সেসব পরিত্যাগ করে পশ্চিমাদের সমস্ত খারাপ জড়িয়ে ধরেছে বুকে, মনে করেছে এরই নাম আধুনিকায়ন। ফলে জন্ম দিয়েছে বেনিয়া কালচার, দুর্নীতি, ধর্মীয় ফ্যানাটিসিজমের জগাখিচুড়ি। সরোকিন খবর পেয়েছে এক হাজার মার্কিন সেনা এ অঞ্চলের আর্মিকে শেখাচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর যুদ্ধ কৌশল। অর্থাৎ, গেল দেশটা। একেই বলে স্বর্গ হইতে নরকে পতন!

সরোকিনের বাম হাতে টোকা দিল পাইলট, আঙুল তুলে সামনের দিকে তাক করল।

খুব বিরক্ত হলো সরোকিন, নীল সাগরে চোখ রেখে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ ছেড়ে গন্তব্যের দিকে দৃষ্টি ফিরাল। দেখবার মত কিছু নেই। খানের কমপ্লেক্সটা খুঁজল। দেখা গেল না। ওদিকে পড়ে আছে লম্বাটে একটা পাথুরে সৈকত। সাগরের বিশাল একটা জায়গা স্টিলের ফেন্স দিয়ে ঘেরা হয়েছে। ওখানে অসংখ্য জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে নোঙর ফেলে। দূর থেকে বোঝা যায় জাহাজগুলো পরিত্যক্ত—ওগুলো আর কখনও সাগরে ভাসবে না। বেশ কিছু ট্যাঙ্কার নিজেদের বহন করা তেলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, ঠিক যেন নিজ রক্তে নাক গুঁজে পড়ে আছে খুন হওয়া লাশ। একটা ট্যাঙ্কার এত পুরোনো যে জং-এর আক্রমণে ভেঙে গেছে কীল, ওটার বো আর স্টার্ন এখন উঁচু হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

দূরে দূরে বেশ কিছু অয়েল কণ্টেইনমেন্ট বুম উপসাগরে হাত বাড়িয়ে রেখেছে, যেন অগ্রসরমান জাহাজ দেখলেই হামলে পড়বে। খোলা সাগরের দিকে জাহাজ ঢুকবার বিরাট এক ফটক। মৃদু হাসল সরোকিন। এখানে কোনও জাহাজ এলে আর কখনও ফেরে না, অন্তত সাগরপথে নয়।

বাঁক নিল কপ্টার, চলে এল খান ব্রেকার্স ইয়ার্ডের উপরে। জোয়ারের ঢেউ আর কয়েকটা প্রকাণ্ড উইঞ্চ এক হাজার ফুটি দুটো সুপার-ট্যাঙ্কারকে ঢালু সৈকতে টেনে তুলেছে। দুই জাহাজে কাজ করছে একগাদা লোক। তাদের হাতে কাটিং টর্চ। ওগুলো জাহাজের গা স্পর্শ করলে উজ্জ্বল আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। সাগরের তীরে একটা বড় ক্রেন রেইল-এ বসে আছে, জাহাজের প্লেটগুলো সৈকতের আরও উপর দিকে পাঠাচ্ছে। ওখানে রয়েছে আরও শ্রমিক, তারা প্লেট কাটছে, আরও ছোট টুকরো করছে। আরেকদল জাহাজের পাইপ, বৈদ্যুতিক তার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আলাদা করছে। দেখলে মনে হয় জাহাজগুলো যেন কোনও লাশ, মানুষগুলো পিঁপড়ে, ব্যস্ত হয়ে লাশ খেয়ে শেষ করছে।

জাহাজ টুকরো করে রেইলকার-এ ওঠানো হচ্ছে। ওগুলো চলে যাবে উত্তর দিকের খান স্টিল ওয়র্কস্-এ। ওখানে লোহা গলিয়ে ইস্পাতের বার তৈরি হবে, চলে যাবে ওগুলো দক্ষিণ চিনে।

কয়েক একর জায়গায় তৈরি হয়েছে স্টোরেজ ইয়ার্ড। ওখানে রাখা হয়েছে বয়লার, লাইফবোট, নোঙর থেকে শুরু করে জাহাজের শতখানেক আইটেম। ওগুলো মুক্ত বাজারে বিক্রি করা হবে।

স্টোরেজ ইয়ার্ডের পাশে গড়ে উঠেছে শ্রমিকদের বস্তি। তাদের প্রয়োজনে রেইল-লাইনের ধারে জমে উঠেছে পতিতালয়। পিছু নিয়ে এসেছে একদল বাটপার, চোর, জুয়াড়ী—এরা শ্রমিকদের সামান্য সঞ্চয়টুকু হাতিয়ে নেবে ছলে-বলে-কৌশলে।

সরোকিন খেয়াল করল, জঙ্গল পিছিয়ে গেছে। তা-ই হওয়ার কথা। হাজারো শ্রমিকের রান্নার কাঠ ওখান থেকে জোগাড় করা হয়। তাদের জন্য কোনও বিদ্যুৎ নেই। চারপাশে নোংরা আবর্জনার স্তূপ। বাতাসে ভেসে আছে ধূলি ও ধোঁয়া। যেন এরা বায়ু দূষণে মরলে কিছু যায়-আসে না।

দশ মাইল দূরে স্টিল মিল-এ অন্যরকম ব্যবস্থা, সেখানে কোনও দূষণ নেই—ছিমছাম, পরিষ্কার। ওখানে কয়লা বা তেল দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়

না, কাজ হয় জল-বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে।

খান ব্রেকার্স ইয়ার্ডে এখন দারুণ একটা জিনিস এসেছে, মুদাস্‌সর খান সরোকিনকে সেটাই দেখাতে চায়।

সুপার ট্যাঙ্কারগুলোর নাকের কাছে ঝলমল করছে একটা প্রকাণ্ড ধাতব বিল্ডিং। লম্বায় প্রায় জাহাজের সমান। সাগরে পাইলিং শেষে বিল্ডিঙের পিলার তৈরি হয়েছে। পুরো বিল্ডিং পাঁচশো তেত্রিশ ফুট সাগরের ভিতর সেঁধিয়ে আছে। ছাদের মাঝখানে কাঁচের প্যানেল রয়েছে, ওগুলো দিয়ে ভিতরে আলো ঢুকছে। চারটে রেইল-লাইন বিল্ডিঙের ভিতরে ঢুকেছে। কপ্টার উপর দিয়ে যাওয়ার সময় দুটো ছোট ট্রেন দেখল সরোকিন। ডিজেল ইঞ্জিনগুলো জাহাজ থেকে কাটা পাঁচ ফুটি টুকরোগুলো সরিয়ে নিচ্ছে। সরোকিন বুঝতে পারল না কীভাবে ওগুলো ওরকম বাঙ্গির টুকরোর মত করে কাটা হয়েছে।

ব্রেকার্স ইয়ার্ড পেরিয়ে এল কপ্টার। সামনে পড়ল একটা পাথুরে বাঁধ। ওটা দিয়ে আওয়াজ ও পোড়া ধাতুর দুর্গন্ধ ঠেকানো হয়। কপ্টার বাঁধ পেরিয়ে এল, এরপর ঘাসের লন। একটু দূরে দূরে একটার পর একটা বাংলো। ওগুলো ভিজিটর, ক্লার্ক ও দক্ষ কর্মচারীদের জন্য। আরও এগিয়ে কপ্টারটা ধীরে ধীরে হেলি-প্যাডে নামল। একটু দূরে অপেক্ষা করছে একটা ছাদ-খোলা জিপ। ড্রাইভার সরোকিনের লাগেজ নিতে এগিয়ে গেল।

ইন্দোনেশিয়ায় থাকবে না সরোকিন, কাজেই ব্রিফকেস আর একটা লেদার গ্রিপ সঙ্গে রেখেছে। তার লাগেজ পড়ে আছে এয়ারপোর্টের লকারে। ড্রাইভারকে ব্রিফকেসটা জিপের পিছনে রাখতে দিল সে, কিন্তু প্যাসেঞ্জার সিটে বসে গ্রিপটা তুলে নিয়ে দু'হাঁটুর উপরে রাখল।

ব্রেকার্স ইয়ার্ডের দিকে রওনা হয়ে গেল জিপ। অল্পক্ষণেই ভ্লাদিমিয়ার সরোকিনের শ্রবণযন্ত্রের উপর শুরু হলো হাঁদা, জ্যাক-হ্যামার আর জেনারেটরগুলোর তীক্ষ্ণ শব্দের আক্রমণ। ক্রেনটা একটা দশ টনি ধাতব টুকরো সৈকতে ফেলল। ভোঁতা আওয়াজ হলো। ওখানে প্রায়-উলঙ্গ একদল শ্রমিক স্লেজহ্যামার আর ইলেকট্রিক করাত নিয়ে কাজে লেগে পড়েছে। তাদের সারাদেহে তপ্ত লোহার দাগ দেখল সরোকিন। অনেকের এক চোখ, দু'চারটে আঙুল বা পায়ের পাতার অংশ নেই।

হঠাৎ বিরাট ধাতব বিল্ডিঙের ভিতরে ভয়ানক একটা আওয়াজ হলো। সরোকিন চমকে গিয়ে থতমত খেল। ওর মনে হলো যে-কোনও সময় মাথাটা বিস্ফোরিত হবে। চোখের পানি গাল বেয়ে নামল, চিবুক পেরিয়ে শার্টে পড়ল। আওয়াজটা পুরো এক মিনিট ধরে চলল। ড্রাইভার এবার প্লাস্টিকের একজোড়া ইয়ারফোন বাড়িয়ে দিল। ওগুলো কানে পরে নিল সরোকিন। আওয়াজটা আবার শুরু হলো, তবে ইয়ারফোনের কারণে সহ্য করা যায়। শ্রমিকদের ইয়ারফোন দেয়া হয়নি, তারা কী করে সহ্য করছে বুঝতে পারল না সে। লোকগুলো চুপচাপ কাজ করছে। জিপের ড্রাইভারও কোনও ইয়ারফোন পরেনি। আওয়াজটা যেন কিছুই না!

প্রকাণ্ড বিল্ডিঙের সামনে থামল জিপ। একমুহূর্ত পর ভিতরের কর্কশ

আওয়াজটা থেমে গেল। সরোকিন টের পেল, শ্বাস আটকে রেখেছে সে। শ্বাস ফেলে ড্রাইভারের দিকে তাকাল, ইশারায় জানতে চাইল, ইয়ারফোন খুলবে কি না।

মাথা দোলাল ড্রাইভার, ইংরেজিতে বলল, 'কষ্ট হলো বলে আমি দুঃখিত। আমরা আসলে আওয়াজে অভ্যস্ত।'

সরোকিন জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কী ছিল?'

'জাহাজের করাত।' দশতলা বিল্ডিঙের একপাশে এলিভেটরটা দেখাল ড্রাইভার। 'আসুন।'

এক শ্রমিক অপেক্ষা করছে ওখানে, তার হাতে বিদেশি সাহেবকে গছিয়ে দিল সে।

শ্রমিক সরোকিনকে প্লাস্টিকের শক্ত একটা হেলমেট দিল। ওটার সঙ্গে আছে ইয়ার প্রোটেক্টার। চট্ করে কান বন্ধ করা যাবে। অতিথিকে নিয়ে লিফটে ঢুকল সে, দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাটন টিপল। ঝাঁকি খেয়ে লিফট উঠতে শুরু করল।

কপ্টারে আসবার সময় ব্রেকার্স ইয়ার্ডের গোটা প্রক্রিয়া দেখেছে সরোকিন, কিন্তু তখন বোঝেনি চারপাশে এত কর্মকাণ্ড ঘটছে। সুপার ট্যাঙ্কারগুলোর পর আরেকটা ক্রুজ শিপ কাটা হবে। ওটাকে দেখে মনে হলো পতিতাদের মধ্যে বসে থাকা কুলীন বংশের নববধূ। এরইমধ্যে গায়ে চৌকো একটা গর্ত করা হয়েছে। একটা ভাসমান ক্রেন ওটাকে নিয়ে অপেক্ষা করছে। সময় এলেই বিল্ডিঙের ভিতরে ঠেলে দেবে।

এলিভেটর দশতলায় পৌঁছে গেল। শ্রমিক জোড়া দরজা টেনে খুলে দিল। সরোকিনের নাক জ্বলে উঠল পোড়া ধাতুর গন্ধে। অপেক্ষা করল সে, বিশ সেকেণ্ড পর ভিতরের অন্ধকারে চোখ সয়ে এল। এবার দু'প্রান্তে দুটো দানবীয় দরজা দেখল। বিল্ডিঙের ভিতরে কোনও ঘর নেই। সব মিলে জায়গাটা হয়তো ফাঁকা একটা ছাউনি বলা যেত, কিন্তু ভিতরে বসে আছে প্রকাণ্ড একটা জাহাজ। বা বলা উচিত, জাহাজের অর্ধেক কঙ্কাল।

সরোকিন যে ক্যাটওয়াকে দাঁড়িয়ে আছে, তার ঠিক নীচে জাহাজের ব্রিজ। জাহাজটা ছাউনির ভিতরে ঢোকানোর আগে চিমনি ও মাস্তুল কাটা হয়েছে, নইলে ঢুকত না। সামনের অর্ধেক কাটা হয়ে গেছে। উইঞ্চগুলো এরপর জাহাজের পিছনের দিক টেনে জমিতে তুলবে। ঠিক জায়গায় এনে দেবে, ছাদ থেকে নেমে আসবে করাত, জাহাজের একটা টুকরো কেটে নামিয়ে দেবে। করাতটা দেখতে বিশাল একটা চেইনের মত। ওটার দিকে মনোযোগ দিল সরোকিন। চেইনের গায়ে অসংখ্য ধাতব দাঁত।

'কী বুঝলেন, মিস্টার সরোকিন?' জাহাজের ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছে মুদাস্সর আলী খান।

চোখ তুলে চাইল সরোকিন। গত দুটো বছরে একটুও বদলায়নি লোকটা। কাঁচা-পাকা দাড়িগুলো নাভি পর্যন্ত নেমেছে। প্রচুর ধূমপানের ফলে দাড়িতে তামাকের দাগ বসে গেছে। মাথায় হেলমেট। ওটা খুলে ফেলায় টুপিটা দেখা গেল। লোকটা জীবনের বেশিরভাগ সময় রোদে কাটিয়েছে, গায়ের রং পোড়া

বাদামী। চোখ দুটো পিঙ্গল, দৃষ্টি দেখলে মনে হয় বদ্ধ উন্মাদ। একবার তাকালে আর চোখের পাতা ফেলে না লোকটা। সরোকিন ছয় ফুট দু ইঞ্চি, বুঝতে পারছে মুদাস্‌সর খান লম্বায় অন্তত পৌনে সাত ফুট। বৃষস্কন্ধ। পিপের মত বুকের খাঁচা। বোঝা যায়, পেটের পেশি এই বয়সেও দড়ির মত প্যাঁচানো। সবটা মিলে প্রকাণ্ড লোকটাকে প্রাচীন কোনও ওকের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

খানের বয়স বায়ান্ন, অমানুষ হয়েছে লাহোরের বস্তিতে। শরীর স্বাস্থ্যের কারণে মস্তানীতে শাইন করে। এমন কোনও কুকর্ম নেই যা সে করেনি। ছাব্বিশ বছর বয়সে প্রথম বড় কাজে হাত দেয় সে। যা কামিয়েছিল, পাকিস্তানের একটা ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট কোম্পানিতে ইনভেস্ট করে। সে-সময় আফগানিস্তানে ঢুকে পড়েছে সোভিয়েতরা। তাদের ঠেকাতে পাকিস্তানে হড় হড় করে ডলার ঢালছে আমেরিকা। মুদাস্‌সর সুযোগটা নেয়। দু'হাতে যতটা পারে কামিয়ে নেয় আমেরিকান ডলার। সে জানত, যতই গোলমাল চলুক, আফগানিস্তানের পাহাড়ি এলাকায় ওপিয়ামের উৎপাদন কমেনি। এই ব্যবসায়ে জড়াতে অসুবিধে হয়নি ওর। চালানগুলো পাঠাতে শুরু করে সে করাচিতে। সেখান থেকে চলে যায় বিভিন্ন জায়গায়। বিশেষ করে আমস্টারডাম, মার্সেই আর রোমের হেরোইন উৎপাদন-চক্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে সে। তার উদ্যমে ওপিয়াম পৌঁছে যায় দুনিয়ার সব কোণে।

মুদাস্‌সর খান জানত আমেরিকা আফগাস্তিানে গৃহযুদ্ধ চাইছে, এরপরে তালিবানরা ক্ষমতায় বসবে। তা-ই হলো, তারা এসে ওপিয়ামের চাষ বন্ধ করে দিল। খান বাধ্য হয়ে অন্যদিকে চোখ সরাল, কিন্তু ততদিনে টাকার পাহাড় গড়ে নিয়েছে সে। ঘুষ দিয়ে মালোয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও নিউ গিনির গাছ কাটার অনুমতি নিল। নিজেই জাহাজের বহর কিনে গাছগুলো বহন করল। নিজের বিরাট এস্টেটে একদল বাঘ আনাল। বড়লোক চাইনিজদের কাছে হান্টিং রাইট বিক্রি করল। এফ্রোডিজিয়াক হিসেবে বিক্রি করা হলো বাঘের হাড়। এমন কোনও ব্যবসা নেই, যেখানে সে নাক গলাল না। লোকটা যে-কোনও ব্যবসায় বে-আইনী কাজ করতে পারলে খুশি হয়ে ওঠে। কিছুদিন আগে তার কোম্পানি তাইওয়ানে চারটে বহুতল অ্যাপার্টমেণ্ট ভবন তৈরি করে, ওখানে বাজে মেটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়। ভবনগুলো সামান্য ভূমিকম্পে ধসে পড়ে, মারা যায় প্রায় ছয়শো মানুষ। সে তখন ধরাছোঁয়ার বাইরে। মুদাস্‌সর আলী খানের পরিষ্কার কথা, সম্পদ বাড়লেই হলো, কী ভাবে সেটা আসবে, সেটা বড় ব্যাপার নয়।

ক্যাটওয়াকে উঠে এল মুদাস্‌সর আলী খান।

সরোকিন বলল, 'সত্যিই দেখার মত।' করাতের দিকে তাকাল, ঠিক করেছে বাধ্য না হলে ওই সাপের মত ঠাণ্ডা দু'চোখে চোখ রাখবে না।

মুদাস্‌সর খান নো স্মোকিং সাইনের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল, ভুসভুস করে ধোঁয়া ছেড়ে হাসিমুখে বলল, 'এশিয়ায় এই একটাই আছে। ওগুলোর দাঁতে বৈশিষ্ট্য আছে, এমন কী কার্বন স্টিলও কিছু না, মাখনের মত গলে যায়। জার্মানি থেকে আনিয়েছি। দুনিয়ার সেরা। দশটা জাহাজ কাটার আগে দাঁত বদলাতে হয় না। হ্যামবার্গ থেকে টেকনিশিয়ান এসে আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছে দাঁত কী

ভাবে বদলাতে হয়। করাতের নাম দিয়েছি আমিঃ ডেন্টিস্ট।' সরোকিন হাসছে না দেখেও পাত্তা দিল না সে, 'দাঁতের ডাক্তার, বুঝলেন? হাসির ব্যাপার।'

হাতের ইশারায় বিশাল ছাউনি দেখাল সরোকিন। 'আমার সোনাগুলো বুঝি এসবেই খরচ করছেন?'

'না, সব নয়—কিছুটা। ইন্দোনেশিয়ান সরকার বলেছিল আমি আধুনিক করাত বসালে ট্যাক্স কমিয়ে দেবে। ওরা ভাবেওনি যে এটা এসে যাওয়ায় অন্তত এক হাজার লোক চাকরি হারাবে। কাজেই ধরে নিলাম, ওরা ভালর জন্যেই তো বলেছে! একদল বাঁদরকে চাকরিতে রাখতে হবে না। ব্রেকিং ইয়ার্ডে একটা শুয়োর দুর্ঘটনায় মরলে আমাকে এক লাখ রুপি দিতে হয়। গত সপ্তাহে এক হারামজাদা-কাটার বাঙ্কার ফিউল ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দিয়েছে, তাতে পনেরোটা গেছে। জাহাজটা লক্ষ টুকরো হয়েছে। লোকসান। পুরোটা লোকসান!

'করাত এসে যাওয়ায় এখন আর বারবার সরকারী ইন্সপেক্শনও হবে না। ইচ্ছে মত জাহাজের অ্যাস্‌বেস্টস্‌গুলো যেখানে খুশি ফেলতে পারব। ঠিক করেছি, স্পেশাল ডাম্পে না ফেলে ওগুলো সাগরেই ফেলব। পুরোনো জাহাজের লোহার দাম অনেক কমে গেছে, এদিকে স্টিলের দাম গেছে বেড়ে, তার ওপর ইন্দোনেশিয়ার এক হাজার বাঁদর ঘাড় থেকে নামছে—দু'বছরে করাতের পয়সা উঠে যাবে। আপনি জানতে চেয়েছেন, অনেক টাকা খরচ হয়েছে কি না—হ্যাঁ। খরচটা আপাতত মেনে নিতে হবে ভবিষ্যতের প্রচুর লাভের জন্যে।' আবার হাসল মুদাস্‌সর আলী খান। 'আমার সবসময় মনে হয়েছে জীবনটা একটা ম্যারাথন, এখানে জোরে দৌড়ে জিততে হবে। বুঝলেন?'

একটা অ্যালার্ম ক্ল্যাক্সোন বেজে উঠল। মুদাস্‌সর খান মুহূর্তে ইয়ার প্রোটেক্টারটা কানে নামিয়ে নিল। তার এক সেকেণ্ড পরে কান বাঁচাল সরোকিন। আট ইঞ্চি পুরু করাত জীবন ফিরে পেয়েছে। মনে হলো চেইনটা বিদ্যুতের গতিতে ঘুরছে। এতই দ্রুত যে, কোনও দাঁত দেখা যায় না। ছাদের সঙ্গে আটকানো বড় দুটো স্প্রকেট-গিয়ার কটকট কটকট করে নড়ছে। র‍্যামগুলো করাত নামিয়ে দিল। করাতটা জাহাজের সামনের আরেকটা অংশ খাবে। প্রতিবার জাহাজের পাঁচ ফুট করে নামিয়ে দেবে। করাতের গতি আরও বেড়েছে, এবার র‍্যামগুলো পিছিয়ে গেল—করাত ঘুরতে ঘুরতে নেমে এল জাহাজের কীল-এ। ধাতব ছাউনির ভিতরে ভয়ঙ্কর আওয়াজটা চারপাশে ধাক্কা খেল। জাহাজের দু'পাশে তাক করা ওয়াটার ক্যানন করাতের বেল্টের দাঁত ঠাণ্ডা রাখছে। তেল গিয়ে তপ্ত লোহা শীতল করছে। করাত কীলে দাঁত বসালেই বাষ্প ছিটকে উঠছে। চোখের সামনে কাটা জায়গায়টা মুহূর্তে পুড়ে গেল, খানিকটা ধাতু বাতাসে মিশে গেল। কড়া গন্ধটা নাকে এসে লাগছে। একবার করাত কীল কেটে ফেললে তুলনামূলক হালকা লোহার প্লেটিং পচা কাঠের মত কাটবে।

চুপচাপ দেখছে সরোকিন, ঘুরন্ত চেইনের করাত নেমে এল, জাহাজের রেইলিং মুহূর্তে কাটল। ডেকের লোহা তপ্ত হয়ে উঠল। করাত নেমে গেল আরও। মাত্র দশ মিনিটে মেইন ডেক কাটল। জাহাজের অংশটা যেন মাখনের তৈরি। একটা টুকরো হঠাৎ আগুনের শিখা ছড়িয়ে খসে পড়ল। সফিস্টিকেটেড ব্রেকিং

সিস্টেম চেইনটা থামাল, ছাদের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। একটা শক্তিশালী ক্রেন জাহাজের টুকরো নিয়ে সামনের দরজার দিকে এগোল। দরজা দিয়ে ঢুকল চারটে খুদে লোকোমোটিভ ইঞ্জিন, ওগুলো টুকরোটা নিল। পিছিয়ে ছাউনি ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

'ওরা টুকরোগুলো ইয়ার্ডে নিয়ে রাখবে,' জানাল খান। 'একদল লোক হ্যাণ্ড-কাটার দিয়ে ওগুলো কাটবে। খণ্ডগুলো চলে যাবে স্টিল প্ল্যান্টে। এই করাত সবই কাটতে পারে, শুধু একটা জিনিস কাটতে পারে না—জাহাজের ডিজেল ইঞ্জিন। ওটা বাকি থাকে, পরে আমরা সরিয়ে নিই। এরকম বড় জাহাজ হাতে কাটতে দু'সপ্তাহ লাগে, তবে করাত আসায় দু'দিনে কাজ শেষ হয়ে যায়।'

আরেকবার বলল সরোকিন, 'সত্যিই দেখার মত।'

রাশানকে নিয়ে এলিভেটরের দিকে এগোল মুদাস্‌সর। 'এবার শোনা যাক আপনার খবরাখবর। কেমন চলছে ওদিকে?'

'আপনার অফিসে চলুন, বলব।'

দশ মিনিট পর মুদাস্‌সর আলী খানের বড় বাংলোয় পৌঁছে গেল তারা। অফিসটা বাংলো সংযুক্ত। অফিসের দেয়ালে লটকে আছে খানের এগারো সন্তানের ছবি। উল্টোদিকের দেয়ালে তার স্ত্রীর বিরাট এক পোর্ট্রেট—অত্যন্ত মোটা এক মহিলা। খান বিয়ার সাধল, মাথা নেড়ে পানি নিল সরোকিন। সে ব্রিফকেস খুলতে না খুলতে খান নিজের জন্য দ্বিতীয় বিয়ারটা খুলল।

'মিটিঙে আমি যা বলেছি, সব মেনে নিয়েছে কনসোর্টিয়াম,' বলল সরোকিন। 'এবার আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড দশগুণ বাড়াতে হবে।'

'বাহ্, চমৎকার প্রস্তাব!' হাসি-হাসি ভাব করল মুদাস্‌সর খান। 'আমার ভাগও তা হলে বেড়ে যাবে দশগুণ?'

সরোকিন মন্তব্যটা পাত্তা না দিয়ে একটা ফাইল এগিয়ে দিল। 'আগামী বছর আমাদের ওই পরিমাণ লাগবে। যোগাড় করতে পারবেন?'

বুক পকেটে রাখা রিডিং গ্লাস বের করে বিরাট নাকের উপরে বসাল খান, লিস্ট দেখল। বিড়বিড় করে অঙ্ক কষল। 'আপাতত একহাজার লাগবে। এরপরে সামনের দু'মাসে লাগবে দুশো করে। তার পরের দু'মাসে চারশো করে। তারপর থেকে ছয়শো করে।' সরোকিনের চোখে তাকাল খান। 'বাড়ানোর কারণটা কী?'

'রোগ। আমরা ধরে নিতে পারি টাইফয়েড আর কলেরা আরও বাড়বে।'

'ও।'

সরোকিন পরবর্তী আধঘণ্টা তার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করল। শেষে বলল, 'বুঝতেই পারছেন জার্মানি ছেড়ে দেবে, অন্য দেশও ছাড়তে চাইতে পারে।'

এতক্ষণ শুনেছে খান, মাঝে মাঝে পরিকল্পনায় পরিবর্তন এনেছে। এবার মাথা দুলিয়ে বলল, 'অসুবিধে নেই, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

সরোকিন মনে মনে আরেকবার স্বীকার করে নিল, এই পাকা ক্রিমিনালের মাথাটা ভাল খেলে।

আলাপ শেষ, এবার বিদায় চাইল সরোকিন, জানাল এবার ফিরতে চায়। সূর্যাস্ত এখনও দু'ঘণ্টা বাকি, এখন কপ্টারে রওনা হলে সন্ধ্যার আগেই জাকার্তায়

পৌঁছে যাবে সে। সে ঠিক করেছে, রাতটা ওখানে কোনও হোটেলে কাটাবে, আগামীকাল প্রথম প্লেনে মস্কো ফিরবে।

মুদাস্‌সর আলী খান হ্যাণ্ডশেক শেষে সরোকিনকে বিদায় দিল, লোকটা বেরিয়ে যাওয়ার পর বড় ছেলে আজগার আলী খানের কাছে ফোন করল সে। যে-ধরনের ব্যবসা সে করে, তাতে শুধু নিজের ছেলেদের বিশ্বাস করা যায়, আর কাউকে নয়। মুদাস্‌সর খানের ধারণা, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিয়েছেন ছয়টা মেয়ে দিয়ে। ওগুলোর পিছনে খামোকা অনেক টাকা বেরিয়ে গেছে। একটার আবার এখনও বিয়ে হয়নি। ওটার পিছনে অনেক যৌতুক বেরিয়ে যাবে। পাঁচ নম্বর মেয়েটা, নূরজাহান, ওটার মুখ ছিল ঘোড়ার মুখের মত—ওটার পিছনে গেছে পাঁচ লাখ রুপি। ষষ্ঠটা মমতাজ, ওটা দেখতে খারাপ হলেও ব্যবহারটা ভাল। মুদাস্‌সর খান ভেবে রেখেছে, ওটার বিয়েতে পাঁচ লাখের বেশি দেবে।

মুদাস্‌সর ফোনে বড় ছেলে আজগারের গলা শুনল। আজগার সালাম-কুশলাদি শেষে বলল, 'আব্বাজান, দুই দিন ধরে শিরি-ফোরের খবর পাওয়া যাচ্ছে না।'

'এবারের যাত্রায় ওটার ক্যাপ্টেন কে ছিল?'

'লোকমান আলী।'

মুদাস্‌সর আলী খান কাঁচা টাকার ব্যবসাগুলো নিজেই চালায়, ম্যানেজার রাখে না। তার সংগঠনের উপরের পর্যায়ের সবাইকে চেনে সে। সব তার নির্দেশে চলে। লোকমান আলী বাইশ বছর মালাক্কা স্ট্রেইটে জলদস্যুতা করেছে, তারপর দু'বছর হলো তাকে কাজে নিয়েছে খান। ওই লোক ক্ষ্যাপাটে হতে পারে, কিন্তু কখনও কোনও নির্দেশ পালনে দেরি করেনি। সে যোগাযোগ করেনি মানেই বুঝে নিতে হবে, তার খারাপ কিছু হয়েছে। মুদাস্‌সর আলী খান হিসাব কষে ফেলল, শিরি-ফোর আর নেই। সঙ্গে গেছে ক্যাপ্টেন লোকমান আলী আর চল্লিশটা কুত্তা।

'ওর জায়গায় আরও কয়েকজন ক্যাপ্টেন হতে চায়,' ছেলেকে বলল মুদাস্‌সর খান। 'ঠিক আছে, লোক নিয়ে নেব। তুমি তোমার লোকদের বলো, যেন কান খোলা রাখে। জলদস্যুদের জাহাজে হামলা হয়েছে এমন কিছু শুনলে যেন দেরি না করে আমাদের জানায়। যে-ব্যাটা লোকমানের সঙ্গে লড়াই করে জিতেছে, সে গল্প করে বেড়াবে।'

'জ্বী, আব্বাজান। ...একই কথা আমিও ভেবেছি, কান খোলা রাখতে হবে। এখনও হামলার কোনও রিপোর্ট পাইনি।'

'আর সব ব্যবসা ভালই চলছে। ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন একটু আগে আমার অফিস ছেড়ে গেছে। আমাদের জোরেশোরে নামতে হবে। যা লাগবে সেগুলোর লিস্ট দিয়ে গেছে। তোমাকে আগেই বলেছি, ওগুলো এখন পাওয়া জরুরি।'

'আপনার নির্দেশে আমি দ্রুত যোগাড় করছি।'

'ভাল। তোমার ছেলেদের কী খবর? ওরা ঠিকসময় কাজে নামতে পারবে তো?'

'নির্দেশের এদিক-ওদিক করবে না ওরা। সরোকিন আর তার ব্যাঙ্কের লোকগুলো বোঝার আগেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

ছেলের কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়ছে, মুদাস্‌সরের বুকের ভিতরে গর্ব জন্মাল। বড় ছেলেটা একদম তার মতই হয়েছে। আজগার বস্তিতে জন্মালেও নিজের ক্ষমতায় দু'হাতে মাটি খামচে উপরে উঠে আসত। 'তা হলে তো ভাল,' বলল মুদাস্‌সর। 'এদিকে ধলা ব্যাটারা এটাও জানে না যে-বিরাট গাড্ডায় পড়েছে।'

'সত্যিই তা-ই, আব্বাজান। আপনি ওদের ভাল নাচিয়েছেন। আতঙ্ক আর লোভের বশে মাথা গেছে ওদের। নাচছে নাচুক। ডুববে।'

জিভ দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করল মুদাস্‌সর। 'না, আজগার, আমরা চাই না ওরা ডুবুক। একটা কথা সবসময় মাথায় রাখবি, মরো-মরো গাছের ফল খেতে পারবি, তবে গাছটা সত্যিই মরে গেলে আর কখনও ফল পাবি না। সরোকিন আর তার কাস্টোমাররা সবাই ক্ষতির মধ্যে পড়বে, তবে আমরা কিছু রেখে দেব, যাতে পরে আবার ফল খেতে পারি।'

দশ

'তুই তো হাঁটতে হাঁটতে কার্পেটের চল্টা তুলে ফেললি,' বলল লিউ ফু-চুং। হোটেলের ঘরের কোণে সিঙ্গেল সোফায় বসে আছে ও। 'অন্তত দু'ইঞ্চি ছোট হয়ে গেছিস। এবার একটু বিশ্রাম নে।'

ঘরের অন্য প্রান্তে চলে যাচ্ছে রানা, প্লেট গ্লাসের জানালার সামনে গিয়ে থামছে। বাইরে টোকিয়োর গিন্‌জা ডিস্ট্রিক্টের বৈদ্যুতিক বাতিগুলো ঝলমল করছে, কিন্তু দেখেও কিছু দেখছে না রানা—ভাবছে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসের কথা। ওদের জাহাজটা এখন দ্য চুহা'র দিকে এগিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ পর উর্বশী ওর দল নিয়ে ড্রাই-ডকে উঠবে। রানা জানে, এ মুহূর্তে মার্ভেলের অপারেশন্স সেন্টারে ওর থাকা দরকার ছিল। কিন্তু তার বদলে এখন হোটেলের ঘরে বসে আছে। আরও কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে! অনিল ড্রাই-ডকের মালিকের নাম জানলে, তখন কোনও ব্যবস্থা নেয়া যাবে। নিজেকে খাঁচায় বন্দি সিংহ মনে হলো ওর, হোটেলের তিরিশ তলায় আটকা পড়েছে।

চওড়া জানালার ওপাশে এসে আছড়ে পড়ল তুমুল বৃষ্টির ছাঁট। কাঁচের ওপাশে বাতিগুলো আর ভাল দেখা যাচ্ছে না। প্রকৃতি আগে থেকেই অতিগম্ভীর ছিল, এখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। মেজাজ চড়ছে রানারও।

পাক্কা চব্বিশ ঘণ্টা হলো জুডি স্টিভেনসনকে তুলে নিয়েছে কপ্টার। ওর সঙ্গে ভিড়ে গেছে রানা, ফু-চুং ও দু'জন কমাণ্ডো। জাপানে পৌঁছে হেলি-প্যাডে নেমে এক দাড়িওয়ালাকে দেখেছে রানা। জুডি আর দাড়িওয়ালার চেহারা লক্ষ করে আন্দাজ করেছে, এদের আগে কখনও আলাপ হয়নি। লোকটা নিজের নাম বলেছে, জোনাথন উইলকিন্স। রানাকে কয়েকবার ধন্যবাদ দিয়েছে সে জুডিকে উদ্ধার করেছে বলে। কিন্তু রানার মনে হয়েছে, লোকটা নিজেকে লুকিয়ে রাখছে,

একটু যেন রেগেও আছে।

জুডি অবশ্য উদ্ধার পেয়ে কৃতজ্ঞ। মিস্টার উইলকিন্স একটা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করেছে, এক আর্দালি একটু দূরে দাঁড়ানো অ্যাম্বুলেন্সটা দেখিয়েছে জুডিকে। হাঁটতে শুরু করবার আগে রানার গালে চুমু দিয়েছে মেয়েটা। অ্যাম্বুলেন্সে উঠবার আগে রানার চোখে সাগর-নীল দু'চোখ রেখে বলেছে, 'গতকাল রাতে আরেকটা কথা মনে পড়েছে। উদ্ধারের ব্যাপারে।'

বলে ফেলো, শুনি, মনে মনে বলেছে রানা।

'আমি যখন কেবিনে আটকে ছিলাম, তখন আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি নেভিতে আছেন কি না। আপনি বলেছিলেন আপনি একটা সিকিউরিটি কোম্পানির কাজ করেন। আপনাদের কাজ জলদস্যুদের ধরে দেয়া। ...একটু খুলে বলবেন?'

জোনাথন উইলকিন্স ইতিমধ্যে অ্যাম্বুলেন্সের জাম্প সিটে বসে পড়েছে, মনে হয়েছে প্রশ্নের জবাবটা শুনতে চায় সে। একটু ঝুঁকে কান পেতেছে।

লোকটাকে একবার দেখেছে রানা, জুডির চোখে চোখ রেখেছে। 'সত্যি কথা বলিনি।'

'তা-ই কী?' বুকে দু'হাত ভাঁজ করেছে জুডি।

লাজুক হেসেছে রানা। 'মিথ্যে বলেছি। তখন যদি বলতাম আমি একটা জং-ধরা পুরোনো ফ্রেইটারের ক্যাপ্টেন—হঠাৎ করে আমাদের মাছ-ধরা সোনার-এ আপনাকে ধরেছি, আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারতেন? বিশ্বাস করতেন না যে উদ্ধার পাবেন।'

জুডি স্টিভেনসন দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ড রানার চোখে তাকিয়েছে, সন্দেহে দুলেছে, তারপর একটা ভ্রূ উঁচু করে বলেছে, 'মাছ-ধরা সোনার?'

'আমরা বন্দরে ভিড়লে বাবুর্চি মাঝে মাঝে ওটা দিয়ে মাছের বড় ঝাঁক খোঁজে।'

জানতে চেয়েছে উইলকিন্স, 'তা-ই যদি হয়, তা হলে সাগরের অত গভীরে কী করছিল ওটা?' তার কথায় ছিল অভিযোগ।

ঠোঁটে হাসি লটকে রেখেছে রানা। বলেছে, 'কী আর বলব, কপালটা ভাল ছিল আমার। আমরা চলেছি এমনসময় সোনারটা অ্যাভালাঞ্চের উপর দিয়ে গেল। বাবুর্চি তখন সোনারের সামনে দাঁড়িয়ে, আপনাদের জাহাজের আকৃতি দেখল। ও ভেবেছিল দুনিয়ার সবচেয়ে বড় তিমিটা দেখেছে। ব্রিজে ছিলাম তখন, দৌড়াতে দৌড়াতে এসে তিমির খবর দিল। আমি ঠিক করলাম, একবার দেখেই যাই। ঘুরে ওখানে গেলাম। অ্যাভালাঞ্চ মোটেই নড়ছিল না। শেষে মেনে নিতে হলো, ওটা কোনও দৈত্যাকার তিমি নয়। ঠিক করলাম, অক্সিজেনের ট্যাঙ্ক নিয়ে নীচে নামব।'

'ও,' জোনাথন উইলকিন্স মাথা দোলাতে বাধ্য হলো। রানাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি সে।

রানা আরও নিশ্চিত হয়ে গেল, জুডি আর ওই পিঠ-আড়ষ্ট ইংরেজ মোটেই রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির সদস্য হতে পারে না। প্রথমে ভেবেছিল, এরা রয়েল নেভির সদস্য, অ্যাভালাঞ্চ কোনও গুপ্তচর ভেসেল—ওরা উত্তর কোরিয়া বা

রাশার প্রশান্ত মহাসাগরের ফ্লিটের উপরে নজর রাখছিল। কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখেছে, কোনও স্পাই শিপে জলদস্যুদের হামলাটা মেলে না। একদল কমাণ্ডো অ্যাভালাঞ্চে উঠেছে, ক্রুদের হত্যা করেছে, তারপর কেউ বুঝবার আগেই চলে গেছে জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে। কেন? অ্যাভালাঞ্চে যারা ছিল, তারা হয়তো রয়েল নেভির প্রাক্তন নাবিক, রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির কাছ থেকে ভেসেলটা ধার নেয়া হয়। কোনও ধরনের অ্যাসাইনমেন্টে ছিল।

'তা হলে বাবুর্চিকে আমার ধন্যবাদ পৌঁছে দেবেন,' বলেছে জুডি, অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে উঠে বসেছে। আর্দালি দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আধ মিনিট পর রওনা হয়ে গেছে অ্যাম্বুলেন্স।

রানা, ফু-চুং, বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ান নেভির দু'জন কমাণ্ডো হেলি-প্যাডে দাঁড়িয়ে থেকেছে। ওদের জন্য কোনও গাড়ির ব্যবস্থা নেই। কোনও গাড়িতে লিফট চাইতে হবে, নইলে ট্রেইন-স্টেশন খুঁজে বের করতে হবে। মার্ভেল ছেড়ে যে কপ্টার ওদের এখানে পৌঁছে দিয়েছে, সেটাই ভাড়া করেছে রানা, সোজা চলে এসেছে টোকিয়োতে। সোহেল আগেই চার বেড-রুমওয়ালা একটা সুইট ভাড়া করেছে। ওখানে এসে উঠেছে ওরা। তখন থেকে অপেক্ষায় আছে সবাই। অবশ্য দুই কমাণ্ডো হোটেলের বিশাল ফিটনেস সেন্টারেই কাটাচ্ছে বেশিরভাগ সময়। পায়চারি করে বেড়াচ্ছে রানা, আশা করছে অনিলের ফোন আসবে। একটা মোটা বই নিয়ে বসেছে ফু-চুং, মাঝে মাঝে চোখ তুলে রানাকে দেখছে।

'ভাল লাগছে না কিছু,' জানালা দিয়ে ঝড়বৃষ্টি দেখছে রানা। 'বিশ্রাম?' উদাস শোনাল ওর কণ্ঠ। 'নেব।'

'কখন?' বইটা নামিয়ে রাখল ফু-চুং, নরম স্বরে বলল, 'বুঝি, লাশগুলো দেখার পর মাথায় আগুন জ্বলছে তোর। আমিও একই কথা ভেবেছি, ওরা ছিল সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। ভাল চাকরির আশায় আদম-ব্যাপারীদের কাছে ভিড়েছে। ওদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু যারা এসব করছে, তাদের নিশ্চয়ই পাব আমরা। তখন ওদের মরতে হবে।'

বৃষ্টির ছাঁটের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। কী যেন বলবে, কিন্তু বুক পকেটে সেল-ফোন বেজে উঠল। কল রিসিভ করল রানা, 'সোহেল, বল্।'

'আমরা এখন দ্য চুহার বিশ মাইল পিছনে,' বলল সোহেল। 'দশ মিনিট পর আমরা আন-ম্যাণ্ড এঅ্যারিয়াল ভেহিকেল আকাশে তুলব, কম আলোর ক্যামেরায় দ্য চুহার হোল্ড দেখব। এদিকে উর্বশী ওর দল নিয়ে অপেক্ষা করছে, দরকার হলে ড্রাই-ডকে উঠবে।'

'এখানে বৃষ্টি হচ্ছে। তোদের ওখানে আবহাওয়া কেমন?'

'ঠিকই আছে। কপাল ভাল যে চাঁদ নেই। সাগরে চার ফুট ঢেউ, হালকা ঝিরঝিরে বাতাস আছে। ...আরেকটা কাজে তোকে ফোন করেছি। তোদের জন্যে কয়েকটা তথ্য আছে।'

শ্বাস আটকে ফেলল রানা। 'অনিল খুঁজে বের করেছে দ্য চুহার মালিককে?'

'না। ওটা নিয়ে কাজ করছে এখনও। ফারা রাইনার চাইনিজদের অটপসি

করতে গিয়ে একটা জিনিস পেয়েছে। এখানেই আছে ও, ওর সঙ্গে কথা বল্।'

'আগে আরেকটা কথা,' বলল রানা, 'ইউএভি'র ফিডগুলো ই-মেইল করে আমার ফোনে পাঠিয়ে দিবি। ড্রোনটা দ্য চুহার ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় কী দেখায় জানতে চাই।'

'ঠিক আছে। ...ফারার সঙ্গে কথা বল্।'

ডক্টর রাইনারের কণ্ঠ শুনল রানা, 'টোকিয়ো আগের মতই আছে তো, রানা?'

'সুশি আগের মত গরম থাকে, আর গেইশারা ঠাণ্ডা,' বলল রানা।

'মেয়েরা একটু ঠাণ্ডাই হয়,' বলল ফারা। চট্ করে কাজের কথায় চলে এল, 'মনে হচ্ছে কয়েকটা লাশের পরিচয় জেনেছি। ওরা সবাই চাইনিজ। একই গ্রামের মানুষ। গ্রামটা ফুজিয়ান প্রভিন্সের, নাম শিচেন। সাতজন সম্ভবত একই একান্নবর্তী পরিবারের।'

অবাক হলো রানা, ফারা এত দ্রুত রিসার্চ করল কী করে? জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওদের ডিএনএ পরীক্ষা করেছ?'

'না। ওদের একজনের কাছে ডায়েরি ছিল, পড়েছি ওটা। পানিতে ভিজে কয়েকটা পৃষ্ঠা নষ্ট হয়ে গেছে, আর পড়া যায় না; তবে সবকিছু স্ক্যান করে কম্পিউটারে দিয়েছিলাম—যদি ট্র্যান্সলেটার কিছু বোঝে। ডায়েরির মালিকের বংশ—গাওলুং। তার সঙ্গে ছিল ছয় কাযিন। এক আদম-ব্যাপারী ওদের বলে জাপানে পাঠিয়ে দেবে। সেই লোকের নাম—সিয়েন লাউ। এরা শহর ছেড়ে রওনা হওয়ার আগে প্রত্যেকে এই লাউ-এর কাছে পাঁচশো ডলার দিয়েছে। চুক্তিতে ছিল টোকিয়োর বাইরে একটা টেক্সটাইল মিল-এ পৌঁছে দেয়া হবে, তখন বাকি পনেরো হাজার ডলার শোধ করতে হবে।'

'শিরি-ফোরের ব্যাপারে কিছু লিখেছে? ওরা ভেবেছিল ওটাই ওদের জাপানে নিয়ে যাবে?'

'জানি না। হয় অভিযানের ব্যাপারে কিছু লেখেনি, না হলে পানিতে কালি জাবড়ে গেছে।'

'আর কিছু পেলে?'

'বলার মত তেমন কিছু নয়। যুবকের নাম আনজি। নিজের স্বপ্নের কথা লিখেছে, একদিন তার হাতে অনেক টাকা জমবে, জাপানে নিয়ে যাবে প্রেমিকাকে—এসব।'

জানালার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'শহরের নামটা কী যেন বললে?'

'শিচেন।'

'শিরি-ফোর বা দ্য চুহা আগে কী করেছে না জানলেও, চিনের ওই শহরে গেলে জানা যাবে মানুষগুলো কোথায় যায়,' চট্ করে ফু-চুঙের দিকে তাকাল রানা। এদিকের সব কথাই শুনেছে ফু-চুং, ওর তীক্ষ্ণ চোখ বলে দিল, বাকিটা আন্দাজ করে নিয়েছে। 'ফারা, পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব,' বলে ফোন রেখে দিল রানা।

'এত কড়াকড়ির মধ্যেও আদম-ব্যাপারীরা চিন-এ বসে মানুষ উধাও করছে,' তিক্ত হাসল লিউ ফু-চুং।

'এরা বিরাট একটা দলের সামান্য অংশ,' বলল রানা। 'সাপের মাথাটা কাটতে হবে, নইলে মানুষ পাচার ঠেকানো যাবে না।'

'আমি প্রথম ফ্লাইট ধরে বেইজিঙে ফিরব,' বলল ফু-চুং।

'ফুজিয়ান প্রভিন্সের শিচেন গ্রামে যেতে হবে তোর,' বলল রানা। 'ওখানে আছে সিয়েন লাউ নামের এক পাচারকারী।'

'ফুজিয়ানের বেশিরভাগ মানুষ নিজেদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে,' বলল ফু-চুং। 'ওখানে গিয়ে চুপচাপ থাকতে হবে। সিয়েন লাউকে খুঁজে বের করে নেব।'

'এদিকে দ্য চুহার ব্যাপারে কী করা যায় দেখব আমরা,' বলল রানা। 'মনে হচ্ছে মানুষ-পাচার আর জলদস্যুতা একইসঙ্গে চলছে।'

'আমারও তা-ই ধারণা,' বলল ফু-চুং, 'দুটো ব্যাপার মিলে মিশে আছে। যেকোনও একটা রহস্যের জট খুলে গেলে পুরো অঙ্ক মিলে যাবে।'

অপারেশন্স সেন্টারের প্রকাণ্ড স্ক্রিনে আঁধার সাগর বিদঘুটে লাগছে। ফেনাগুলো নিচু ঢেউয়ের মাথায় তৈরি হচ্ছে, মনে হচ্ছে সবুজ বিদ্যুৎ-শিখা ঝলসে উঠছে। পরমুহূর্তে কালো জলরাশিতে আলো দূরে ছিটকে যাচ্ছে। দেখলে মনে হয় ক্যামেরার অপটিক্স কোনও ছন্দে সাগরের পাল্‌স্ মাপছে। দৃশ্যটা ঝাঁকি খেল, পাইলট আলম সিরাজ বিড়বিড় করে কী যেন বললেন।

মাসুদ রানা দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস বুঝে নেয়ার পর নিজেই পছন্দ মত যোগ্য লোক নিয়েছে। তাদের একজন বাংলাদেশ এয়ার ফোর্স-এর (অবঃ) ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ। কলিগরা বলেন, তাঁর যোগ্যতার অভাব নেই, তবে মানুষটা তিনি একটু ক্ষ্যাপাটে। কিছুদিন আগে সত্যিই এই অবিবাহিত ক্যাপ্টেন চাকরিতে রিজাইন করলেন—তাঁর নাকি সত্যিকারের রোমাঞ্চ দরকার, কোনও ট্রলার কিনে একা চলে যাবেন সাগরে। রানা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে, ওর চাহিদা সম্পর্কে জানায়, বলে সাগরে একটা অভিযানে গেলে কেমন লাগবে তাঁর—তাতে সাগরে ঘোরাও হবে, আবার আকাশেও ঘোরা চলবে। ভদ্রলোক ভেবে দেখার সময় নেন, তার দু'দিন পরে মার্ভেলে জয়েন করেন।

মার্ভেলের রবিনসন আর-ফোরটিফোর হেলিকপ্টারটা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে তাঁকে। তাঁর দায়িত্বে আরও আছে দুটো ইউএভি—আন-ম্যানড্ এঅ্যারিয়াল ভেহিকেল। ওগুলো মার্ভেলের পোর্ট-রেইলের পাশে রেখে আকাশে তুলে দেয়া যায়। আমেরিকান আর্মি তাদের শিকারি ড্রোনের পিছনে অন্তত দুই মিলিয়ন ডলার খরচ করে, কিন্তু সেই একই জিনিস এক লাখ ডলারে তৈরি করে লাল চিন। লো-লাইট ক্যামেরা সহ রিমোট কণ্ট্রোল্ড প্লেন—সবই আমেরিকানদের ড্রোনকে টেক্কা মারতে পারবে। ড্রোন দুটো লিউ ফু-চুং জোগাড় করে দিয়েছে, টাকা অবশ্য চ্যাণ্ড্রো পাপাগোপালাই দিয়েছেন। তাঁর অনেক শখ ছিল ওগুলোর, রানার কাজ শেষ হলে ওগুলো তাঁর সংগ্রহে রাখবেন, ঘুড়ির মত উড়িয়ে খেলবেন।

ক্যাপ্টেন সিরাজ এখন অপারেশন্স সেন্টারে একটা কম্পিউটারের সামনে বসে আছেন, একটা ড্রোনের জয়-স্টিক নিয়ে কাজ করছেন। এই ড্রোনটা মার্ভেলের

পনেরো মাইল র‍্যাডিয়াস ঘুরে দেখতে পারে।

ভিডিও লিঙ্ক-এর ফলে ক্যাপ্টেন সামনে ও নীচে দেখতে পাচ্ছেন। চ্যাং-হো ক্যামেরাটা ইউএভি-র নাকে বসে আছে, কিন্তু আপড্রিফট বা ক্রস উইণ্ড জানাতে পারবে না। আন্দাজ করা যাবে না পাঁচ ফুটি প্লেনটা কী অবস্থায় আছে এখন। ড্রোন হঠাৎ জোর বাতাসের টানে পড়ে গেছে। ক্যাপ্টেন সিরাজ জয়স্টিক একটু পিছিয়ে নিলেন, দ্রুত উপরে উঠতে চাইলেন। 'রেঞ্জ কী?' উর্বশীর কাছে জিজ্ঞেস করলেন।

রেইডারের দৃশ্য মনিটর করছে উর্বশী। জানাল, 'আমরা দ্য চুহার চার মাইল পিছনে, তিন মাইল পোর্টে আছি।'

ইউএভি এতই ছোট যে মার্ভেলের শক্তিশালী সার্চ রেইডার ওটাকে খুঁজে পাবে না। তবে রেইডারের রিপিটার স্ক্রিনে মস্ত ড্রাই-ডক আর ওটার দুই টাগ-বোট পরিষ্কার দেখা গেল।

সিরাজ থাম্ব কন্ট্রোল নেড়ে ক্যামেরা প্যান করলেন। সাগরের বুকে অজস্র সবুজ রেখা দেখা গেল। আরও সামনে সাগর অন্ধকার, তারপর আরও দূরে একটা উজ্জ্বল এমারেল্ডের রেখা দেখা গেল।

'ওই যে,' খামোকা বলে উঠল কে যেন।

উজ্জ্বল রেখাটা দক্ষিণে চলেছে। ওটার একটু সামনে রয়েছে দুটো ফুলস্টপ। ওগুলো টাগ-বোট। পিছনে জ্বলছে সার্চলাইট। দুই টাগ-বোট ড্রাই-ডকের পাঁচ হাজার ফুট সামনে, বোঝা টেনে নিয়ে চলেছে। ড্রাই-ডকের দু'পাশে কম উজ্জ্বল সার্চ-লাইট আছে, তবে হোল্ডে কোনও আলো নেই। ওখানে গাঢ় অন্ধকার জমেছে।

'ক্যাপ্টেন সিরাজ, আমাদের নিয়ে চলুন,' শান্ত স্বরে বলল সোহেল। কানে সেল-ফোন ধরল ও। 'রানা, দেখছিস নিশ্চয়ই?'

হোটেলের রুমে বসে আছে রানা, জানাল, 'না দেখার মতই। এক ইঞ্চি স্ক্রিনে পরিষ্কার দেখা যায়?'

'আগে আমি অনেক ওপর দিয়ে যাব,' বললেন সিরাজ। জয়স্টিক নাড়ছেন। 'কিছু না দেখলে ইঞ্জিন বন্ধ করে গ্লাইড করতে হবে।' চট করে সোহেলের দিকে তাকালেন। 'পরে ইঞ্জিন রি-ফায়ার না করলে কিন্তু ইউএভিটা হারাতে হবে।'

'শুনেছি আমি,' বলল রানা। 'কিন্তু এখন আমরা বিস্ময়ের সুযোগটা নষ্ট করব না। পরে আমাদের টিম ড্রাই-ডকে উঠতে পারবে। ঠিক আছে, দরকার হলে উনি সাগরে ইউএভি ফেলে দেবেন।'

বক্তব্যটা শুনেছে সোহেল, ক্যাপ্টেনকে জানিয়ে দিল।

ইউএভির গতি অনেক কমিয়ে আনলেন সিরাজ, তবুও দুটো টাগ-বোট পিছনে পড়ে গেল। উপরে তাকালে খুদে কালো প্লেন দেখা যাবে না। ড্রাই-ডকের অনেক উপর দিয়ে যাবে ওটা। তবে কেউ কান পাতলে ইউএভি-র ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনতে পাবে। প্লেনটা ঘুরে ড্রাই-ডকের স্টার-বোর্ডের পাঁচশো ফুট উপরে চলে এল। ক্যামেরা প্যান করলেন সিরাজ। দেখতে না দেখতে ড্রোনটা আটশো ফুট পেরিয়ে গেল।

ভেসেলটা দেখে একটা দুর্গ মনে হলো, ওটা যেন কোনও জাহাজ নয়। ওটার চারপাশে স্টিলের উঁচু দেয়াল। বো নেই বললেই চলে। একেকটা টাগ-বোট দৈর্ঘ্যে একশো ফুটের বেশি, কিন্তু ড্রাই-ডকের তুলনায় ওগুলো যেন খেলনা।

ভিডিও ক্যামেরায় যা পাচ্ছে, কম্পিউটারকে দিচ্ছে অনিল। সফটওয়্যার চিত্রগুলোকে বড় করছে, দৃশ্যগুলো পরিষ্কার তুলে ধরছে। কনট্রাস্ট বাড়াচ্ছে অনিল, ইউএভির ইঞ্জিনের কারণে যে কম্পন তৈরি হচ্ছে, সেটা কমিয়ে আনছে।

ক্যাপ্টেন সিরাজ একবার ড্রাই-ডকের উপর দিয়ে গেছেন। ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় ডেটা সংরক্ষণ করা হয়েছে, এবার অনিল মেইন স্ক্রিনে ওগুলো প্রথম থেকে দেখল।

'ওখানে কী দেখতে হবে, সেটা তো বলবি,' সেল-ফোনে বলল রানা।

'কিছুই না!' বিড়বিড় করল সোহেল। বিরাট স্ক্রিনে তাকিয়ে আছে ও।

'ওখানে আছেটা কী,' অধৈর্য হয়ে বলল রানা।

'দ্য চুহার রেইলিঙে যে বাতিগুলো জ্বলছে, সেগুলোর কারণে হোল্ডে কিছু দেখা যায় না,' বলল সোহেল। 'মনে হচ্ছে জাহাজের গায়ে বিরাট একটা কালো গর্ত আছে। আমরা আরেকবার সরাসরি ওটার উপর দিয়ে যাব।'

'আবার প্রায় ঘুরে এসেছি,' জানালেন সিরাজ। জয়স্টিকে ড্রোন নিয়ে কাজ করছেন তিনি, কিন্তু জেট-প্লেন চালিয়ে অভ্যেস হয়ে যাওয়ায় একপাশে কাত হলেন। বাঁক নিচ্ছেন!

কয়েক মিনিট পর ড্রাই-ডকের এক মাইল পিছনে পৌঁছে গেলেন তিনি। প্লেনটা এখন দু'হাজার ফুট উপরে। এবার সিরাজ ঝুঁকি নিলেন, থ্রটল বন্ধ করে ড্রোনটাকে খসে পড়তে দিলেন। মনে হলো প্লেনটা সাগরে গিয়ে পড়বে। সবাই জানে ইউএভিগুলো একটুতেই নষ্ট হয়ে যায়। আকাশে তুলতে হলে আচ্ছামত প্রপেলার ঘোরাতে হয়। নিজের ইচ্ছে হলে ইঞ্জিন দয়া করে চালু হয়।

ওরা দেখল, ওদের ড্রোন দ্য চুহার দিকে ঝাঁপ দিয়েছে। ড্রাই-ডকটা স্ক্রিনে বড় হয়ে উঠছে দ্রুত। সিকি মাইল দূরে থাকতে সিরাজ ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলেন। দৃশ্যটা আর ঝাঁকি খেল না। নীরব প্লেন অন্ধকার রাতে নেমে চলেছে ড্রাই-ডকের দিকে। অল্টিমিটার দেখলেন সিরাজ। ড্রোনটা এখন এক হাজার ফুট উপরে। অ্যাঙ্গেল পাল্টালেন তিনি, ড্রোন ঠিক যেন তীরের মত ছুটল—বলা যায়, স্টুকা ডাইভ বোম্বার হয়ে উঠেছে। তবে নীরব।

রেকর্ডার ইমেজ ধরছে, ডিস্কে তুলছে। ইউএভি পেরিয়ে গেল ড্রাই-ডকের ভার্টিক্যাল ট্র্যানসম। সিরাজ ড্রোন সোজা করে নিয়ে এগোলেন জাহাজের কালো অংশের উপর দিয়ে। নিশ্চিত করলেন, ক্যামেরা হোল্ডের নিকষ অংশ দেখিয়েছে।

বো'র পঞ্চাশ ফুট বাকি থাকতে ড্রোনের পিছন দিক নামালেন তিনি, এয়ার স্পিড বাড়াতে চাইলেন। তেত্রিশ ফুট উপরে থাকতে কন্ট্রোলের স্টার্টার টগল টিপলেন। প্লাসমা-স্ক্রিনের মনিটরে সাগর প্রকাণ্ড হয়ে উঠল। স্টার্টার কোনও কাজ করল না, ইঞ্জিন চুপ রইল। বাধ্য হয়ে টগল রিসেট করলেন সিরাজ, আরেকবার চেষ্টা করলেন। প্লাস্টিকের প্রপেলার একবার নড়ল, কিন্তু ইঞ্জিন আর চালু হলো না।

দৃশ্যটা অদ্ভুত। মনে হলো, প্লেন অতি দ্রুত গতিতে নামছে, অথবা সাগর উপরে উঠে এসে খপ্ করে ধরে নামিয়ে নিল ওটাকে। ক্যাপ্টেন সিরাজ চেহারা কুঁচকে ফেললেন। পরমুহূর্তে কালো হয়ে গেল স্ক্রিন।

সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতের আঙুল ফোটালেন সিরাজ, ভ্রূ কুঁচকে সবাইকে দেখে নিয়ে বললেন, 'একটা কথা কী, সবাই বলে, যে ল্যাণ্ডিং শেষে হেঁটে-চলে সরে যাওয়া যায়, সেটা খুব ভাল ল্যাণ্ডিং।'

সবাই জানে, ক্যাপ্টেনের কিছু করবার ছিল না। একইসঙ্গে ড্রোন চালিয়েছেন তিনি, আবার ক্যামেরাও নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

একটু আগে দেখা দৃশ্যগুলো স্ক্রিনে আরেকবার আনল অনিল।

স্যাটালাইট লিঙ্কে রানা জানতে চাইল, 'তোরা কী দেখলি?'

'এক মিনিট, অপেক্ষা কর্,' বলল সোহেল। 'স্ক্রিনে আবারও দেখতে পাবি।'

দ্বিতীয়বারে ইঞ্জিন বন্ধ ছিল, যে-কারণে ক্যামেরা কাঁপেনি—কিন্তু ওরা যা আশা করছে, সেটা দেখতে পেল না। বোঝা গেল, ড্রাই-ডকের পুরো হোল্ড ঢেকে রেখেছে কোনও ধরনের কাপড়। জিনিসটা সম্ভবত একটা প্রকাণ্ড কাভার। শক্ত কিছু নয়। জায়গায় জায়গায় বাতাস কাপড় নাড়িয়েছে। ড্রাই-ডক যা-ই সঙ্গে নিয়ে যাক, সেটা ঢাকা রয়েছে। দেখবার কোনও উপায় ছিল না।

'তোর কী মনে হয়, সোহেল?' জানতে চাইল রানা।

'কালো কাপড় দিয়ে হোল্ড ঢেকে রেখেছে,' বলল সোহেল। 'এখুনি রওনা দিচ্ছে উর্বশী। দেখে আসবে কী আছে ওখানে।'

ইতিমধ্যে কন্ট্রোল রুমের পিছনের দরজায় চলে গেছে উর্বশী, ফু-চুং না থাকলে এ-ধরনের অপারেশনে ওরই নেতৃত্ব দেওয়ার কথা। কালো কমব্যাট ইউনিফর্ম পরে আছে ও, একটু আগে বুলেট ভেস্ট পরে নিয়েছে—লম্বা চুলগুলো ঢাকা পড়েছে কালো ক্যাপে। বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল উর্বশী, 'মিস্টার আহমেদ, রানাকে বলুন, আমরা দেখতে চললাম।'

দ্রুত পায়ে স্টার-বোর্ডের ওয়াটার-লাইনে চলে এল উর্বশী। এ-ধরনের জরুরি সময় তিনজনের একটা টিম তৈরি থাকে। ওরা অ্যাকুয়া গ্যারাজে একটু আগে পৌঁছেছে। ইনফ্লেইটেবল বোট সাগরে নামিয়ে রওনা দেবে।

তিন কমাণ্ডো উর্বশীর জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের একজন নেত্রীর হাতে কমব্যাট হার্নেস ধরিয়ে দিল। উর্বশী সাইলেন্সার ফিট করা গ্লক পিস্তলটা পরীক্ষা করল। মুহূর্তের নোটিশে একটানে বের করবে বলে ওর পিস্তলে কোনও সেফটি ক্যাচ নেই। ওরা ভাবছে না ড্রাই-ডকে এত রাতে কোনও গার্ড থাকবে, তবুও সাবধান হওয়া উচিত। থ্রোট মাইক ও ট্যাকটিকাল রেডিয়ো পরখ করল উর্বশী, কানে গুঁজে নিল ইয়ার-পিস। চারজন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলল ওরা, আলাপ করল অপারেশন্স সেন্টারে সোহেলের সঙ্গে। কমিউনিকেশন ঠিকই আছে।

গ্যারাজের দরজায় লাল বাতি জ্বলছে। সেই আলোয় উর্বশী কালো ক্যামোফ্লেজ পেইন্ট হাতে-মুখে লাগিয়ে নিল, পরল কালো গ্লাভ্স্। ওদের ইনফ্লেইটেবল বোট যথেষ্ট বড়, আটজন যাত্রী এঁটে যায়। বড়সড় কালো আউটবোর্ড ইঞ্জিনটা শক্তিশালী, ফোর-স্ট্রোক। ওটার পাশেই আছে একটা

ব্যাটারি-চালিত মোটর, ওটা নিঃশব্দে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে—প্রয়োজন হলে প্রায় দশ নট গতি তোলা যায় ওতে। বোটের ফ্লোরবোর্ডে আরও তোলা হয়েছে জরুরি টুকটাক জিনিসপত্র।

এক কার্গো-মাস্টার কমাণ্ডোদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখল, তারপর হাতের ইশারায় উর্বশীকে জানিয়ে দিল—সব ঠিক আছে। জবাবে মাথা দোলাল উর্বশী। এবার এক নাবিক বাতি নিভিয়ে দিল। একটা কেব্‌ল্‌ সিস্টেম জাহাজের গা থেকে দশ-বাই-আট ফুট প্লেটিং সরিয়ে দিল। দরজাটা খুলে যাওয়ায় সামনে সাগর দেখা গেল। হিসহিস করছে সাগর। উর্বশী হাওয়ায় লবণের গন্ধ-স্বাদ পেল। আকাশে চাঁদ নেই বললেই চলে। সামান্য আলো। অন্ধকারে দ্য চুহার দেহ আবছা লাগছে। সামনে জ্বলছে টাগ-বোটের ফ্লাড-লাইট, সেই আলোয় বিরাট জাহাজটা অদ্ভুত লাগছে। ওটার উপরের ডেকে দূরে দূরে সোডিয়াম আর্ক ল্যাম্প জ্বলছে। তাতে অন্ধকার যায়নি।

জোডিয়াক ইনফ্লেইটেবল বোটের পাইলট বাটন টিপে ইঞ্জিন চালু করল। দু'পাশ থেকে বোট টেনে সাগরে নামাল উর্বশী ও দুই কমাণ্ডো, চটপট উঠে পড়ল জলযানে। মার্ভেলের গা ছেড়ে দ্রুত সরে গেল জোডিয়াক।

একটু আগে মার্ভেলের ডেকের ক্যামেরায় দেখেছে ওরা, ওদের জাহাজ ও দ্য চুহার মাঝে অল্প দূরত্ব রয়েছে। কিন্তু সাগরে বেরিয়ে এসে মনে হলো, ওই দুই জাহাজের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। সাগরে বড় ঢেউ নেই, জোডিয়াক সহজেই ঢেউ উতরে এগিয়ে চলেছে। আউটবোর্ড ইঞ্জিনে সাইলেন্সার রয়েছে, তবুও আওয়াজটা উর্বশীর কানে অতিরিক্ত লাগল। যদিও ও জানে এটা ফুলস্পিডে চালালেও এক মাইল দূর থেকে কিচ্ছু শোনা যাবে না।

মার্ভেল ছেড়ে আসবার দশ মিনিটের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ পথ পেরিয়ে এল ওরা। পাইলট এবার আউটবোর্ড ইঞ্জিন বন্ধ করে নিঃশব্দ ইলেকট্রিক মোটর চালু করল। উর্বশীর নির্দেশে অলক্ষে ওঠা যায় এমন অন্ধকার জায়গার খোঁজে দ্য চুহার স্টার্ন ঘুরে স্টারবোর্ড সাইডে চলে এল সে।

ড্রাই-ডক তিন নট গতিতে এগিয়ে চলেছে। জাহাজের স্টেম থেকে শুরু করে স্টার্ন পর্যন্ত—মনে হয় ধূসর স্টিলের কোনও দেয়াল। রেইলিঙের এখানে-ওখানে বাতি জ্বলছে, ওগুলো প্লেটিং আলোকিত করছে। জাহাজের মাঝখানে এসে একটা অন্ধকার জায়গা পাওয়া গেল। রেইলিঙের ওই জায়গায় বাল্‌ব্‌ নষ্ট হয়ে গেছে। জাহাজের গায়ের কাছে চলে গেল পাইলট। জাহাজে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে ঢেউ—দুলছে জোডিয়াক মাতালের মত। মোটরের টগল নিয়ে ব্যস্ত হলো পাইলট, একই জায়গায় রাখতে চাইছে বোটটাকে।

'গ্র্যাপল,' থ্রোট মাইকে জানাল উর্বশী।

কমাণ্ডোদের একজন বিদ্‌ঘুটে একটা অস্ত্র কাঁধে তুলল। জিনিসটা দেখতে রাইফেলের চেয়ে দেড়গুণ বড়। পিস্তল-গ্রিপের সঙ্গে রয়েছে একটা হোস-পাইপ, ওটার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে একটা সিলিণ্ডার। সিলিণ্ডারটা জোডিয়াকের মেঝেতে নামিয়ে রাখা হয়েছে। কমাণ্ডো এবার রাইফেলের বাড়তি অংশের লেজার রেঞ্জ ফাইণ্ডার অ্যাকটিভেট করল, মুহূর্তের জন্য রাইফেলটা আকাশে তাক করল। এবার

দ্য চুহার রেইলিঙের উপরের দিকে সাইট সেন্টারিং হলো।

ফিসফিস করে বলল সে, 'আটষট্টি ফুট।'

তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন, সে পিচ্চি একটা লাল লেন্সওয়ালা ফ্ল্যাশ-লাইট জ্বালল। সিলিণ্ডারের মুখের কাছে লাগানো ভালভ-এ নম্বর ডায়াল করল তারপর শুটারের একহাতে টোকা দিল।

রাইফেলওয়ালা কমাণ্ডো শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করল, জোডিয়াকের নড়া অনুভব করল, অপেক্ষা করল। বোট ঢেউয়ের দুলুনিতে উঠুক আগে। জোডিয়াক ঢেউয়ের মাথায় চড়তেই আস্তে করে ট্রিগার চাপল সে।

যতটুকু দরকার, কম্প্রেস্‌ড্ নাইট্রোজেন সিলিণ্ডার ছেড়ে বেরল, এর ফলে অস্ত্র ছেড়ে বেরিয়ে গেল বেঁটেমত একটা রাবার-কোটেড তীর। তীরের পিছনে ছোট একটা পুলিতে জড়ানো আছে এক মিলিমিটার পুরু ন্যানো-ফাইবার। গন্তব্যে পৌঁছে তীরের শরীর একটা গ্র্যাপলিং হুক হয়ে গেল। হুকটা রেইলিঙের এক ইঞ্চি পাশ দিয়ে ওপাশে গিয়ে পড়ল। ধাতব ডেকে কোনও শব্দ হলো না।

রাইফেলধারী কমাণ্ডো অস্ত্রটা নিচু করল, সুতো দুটো সাবধানে টেনে ড্রাই-ডকের রেইলিঙে আটকে দিল হুক। ফিসফিস করে বলল, 'ধরেছি মাছ!'

তার সঙ্গী গ্র্যাপলিং গানের ন্যানো-ফাইবার রিলটা খুলে নিল, একটা সুতোর সঙ্গে আটকানো স্ন্যাপ লিঙ্কে শক্ত নাইলন দড়ি বেঁধে দিল। এবার দ্রুত হাতে অপর সুতোটা টেনে ফিরিয়ে আনতে শুরু করল বোটে। ফলে উপরে উঠে যাচ্ছে নাইলনের দড়িটা। তিরিশ সেকেণ্ড পর গ্র্যাপলের গোড়ায় লাগানো পুলির ভিতর দিয়ে ফিরে এল নাইলনের দড়িটা। দড়ির একটা মাথা সে জোডিয়াকের বো'র একটা আংটার ভিতর দিয়ে ঘুরিয়ে আনল। একই কাজ করল পাইলট, সে স্টার্নের আংটার ভিতর দিয়ে ঘুরিয়ে শক্ত করে ধরল দড়ির অপর মাথাটা। এবার পুরুষরা দু'পাশ থেকে গায়ের জোরে দড়ি টানতে শুরু করল। ধীরে ধীরে পানি ছেড়ে উঠে গেল জোডিয়াকটা দুই ফুট উপরে। সবাই মিলে জোডিয়াকটাকে আরেক ফুট উপরে তুলল। একটু বিশ্রাম নিল, তারপর একই কাজ করল আরও তিনবার। এবার দুইপাশের দুই আংটার সঙ্গে শক্ত গিঁঠ দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় আটকে দিল বোটটাকে। এবার ওরা নিশ্চিত, বড় ঢেউ এলেও ডুববে না জোডিয়াক। এখন আর ঢেউয়ে ঢেউয়ে জাহাজের সঙ্গে ঘষা বা ধাক্কায় রাবারের শরীর ছিঁড়ে যাবে না।

যে-যার পিস্তল পরীক্ষা করে নিল, নিশ্চিত হলো চেম্বারে গুলি আছে, ম্যাগাজিনটাও ভরা। এবার একে একে দড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। প্রথমজনকে কাভার দেবার পর রেইলিং টপকাল দ্বিতীয়জন। তারপর রওনা হলো উর্বশী। ইয়ারফোনে শুটারের কণ্ঠস্বর শুনল ও, 'অল ক্লিয়ার। আসুন, ম্যাডাম।'

ডেকের কাছাকাছি পৌঁছে নীচে তাকাল উর্বশী। ওর পর আসছে পাইলট। অনেকটা নীচে জোডিয়াকটা দেখা গেল, দ্য চুহার গা ঘেঁষে আছে। ঠিক যেন একটা সীলের বাচ্চা, মায়ের গায়ে মিশে দুধ পান করছে। আরেকটু নীচে দুলছে সাগর।

একজোড়া হাত উর্বশীকে ধরে রেইলিঙের উপর দিয়ে হেঁচড়ে পার করিয়ে

দিল। স্তনে কোনও বাড়তি চাপ লাগেনি বলে কপালকে ধন্যবাদ দিল উর্বশী। ভারী ফ্ল্যাক ভেস্ট ওকে রক্ষা করেছে। মনে মনে বলল: ফারা রাইনার আটত্রিশ ব্রা পরে, ও হলে বুকে খুব ব্যথা পেত। পরমুহূর্তে হেসে ফেলল:- ও এখানে আসতে যাবে কেন, ও তো ডাক্তার। সে কি ফারা মেয়েটিকে হিংসা করে? কেন? রানা ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, হেসে কথা বলে... তাই?

শেষ কমাণ্ডো রেইলিং টপকানো পর্যন্ত একটা অর্ধচন্দ্র আত্মরক্ষা ব্যূহ তৈরি করল তিনজন। এবার শুটার তার গ্র্যাপলিং হুক থেকে খুলে জোডিয়াক আটকে রাখা দড়িগুলো একটা বিশেষ কাপলিঙে আটকাল। ওরা যখন আবার নেমে যাবে, তখন ওই কাপলিঙের কারণে এক টানে দড়ি খুলে নিতে পারবে।

দ্য চুহার উপরের ডেকে কেউ নেই। অবশ্য ওটাকে ডেক বলা উচিত নয়, বরং বলা উচিত একটা দশ ফুট চওড়া ক্যাটওয়াক। ওই ক্যাটওয়াক পুরো জাহাজ ঘিরে রেখেছে। কর্কশ কাপড় জাতীয় কিছু হোল্ড ঢেকে রেখেছে, সেটা না থাকলে ডেক দেখে মনে হতো ওটা কোনও লৌহ দুর্গের প্যারাপেট। কাভারের দিকে এগিয়ে গেল উর্বশী। ওটা কাপড় কি না, নিশ্চিত হতে পারল না। মনে হলো প্লাস্টিকের ফাইবার দিয়ে তৈরি। বড় কোনও তাঁবুর উপরে ক্যানভাস যেমন করে টাঙানো হয়, জিনিসটা সেভাবে হোল্ডের উপরে শক্ত করে টেনে সেঁটে দেয়া।

কমাণ্ডোদের একজন বুটের খাপ থেকে একটা নীলচে গার্বার ছুরি বের করল, ফ্যাব্রিক কাটবে। হাত তুলে ঠেকাল উর্বশী, ইশারায় শুটার ও তার সঙ্গীকে প্যারাপেট ধরে এগিয়ে অ্যাফ্‌ট্‌-এর দিকে সার্চ করতে বলল। নিজে পাইলটকে নিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। হাতের ইঙ্গিতে দুশো চল্লিশ ফুটি হোল্ডের একটা জায়গা দেখাল ও, ওরা চারজন ওখানে মিলিত হবে।

পিস্তলটা বের করে নিল উর্বশী। ডেকে নাইট ভিশন গিয়ারের সাহায্য পাবে না ওরা, সে-তুলনায় আলো অনেক বেশি, আবার এতটা আলো নেই যে সব পরিষ্কার দেখা যাবে। কপাল ভাল যে ক্যাটওয়াকে খুব কম জায়গা আছে, যেখানে সেন্ট্রি থাকতে পারে। কয়েকটা জায়গায় ভেন্টিলেশন ডাক্ট বা মেশিনারিজ হাউজিং আছে। ওখানে আড়াল নেয়া যাবে। স্টার-বোর্ডের রেইলিঙের পাশ দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে এগোল উর্বশী। পিস্তল কোমরের পাশে উদ্যত, ওর চোখ সামনের ছায়াগুলো দেখছে। স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস নিচ্ছে ও, কিন্তু বুকের মধ্যে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। হাঁটতে হাঁটতে ভাবল, ওর দলের কমাণ্ডোরা যদি ট্যাকটিকাল রেডিয়োতে বুকের এই আওয়াজ পেত, তা হলে কী হতো! পিছন ফিরে দেখল সতর্ক পায়ে অনুসরণ করছে ওকে জোডিয়াকের পাইলট, হাতের অস্ত্র তৈরি, ওকে কাভার করছে।

বো'র কাছে একটা চৌকো বড় ঘর, সম্ভবত ওখানে ব্যালাস্টের মেশিনারি ও ডোর কন্ট্রোল আছে। প্রথমে মনে হলো ওই ঘরে কেউ নেই, কিন্তু উর্বশী খেয়াল করল, ওখানে কয়েকটা বদ্ধ জানালা রয়েছে—কাঁচগুলো কালো রং করা। সাগরের হাওয়ায় শার্শিগুলো শীতল হয়ে আছে। কান পাতল উর্বশী, গালে ঠাণ্ডা লাগল। ভিতর থেকে কয়েকজনের গলার আওয়াজ শোনা গেল, কিন্তু বক্তব্য বোঝা গেল না। কোন্ ভাষায় কথা হচ্ছে? জানবার উপায় নেই। তবে লোকগুলো যে ভিতরে

আছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। চারজন। পুরুষ। এক হাত উপরে তুলল উর্বশী, চার আঙুল দেখাল পাইলটকে।

মাথা দোলাল সে।

দেরি না করে চৌকো ঘর পার হয়ে গেল ওরা। খেয়াল রাখল একমাত্র দরজাটার দিকে। প্রকাণ্ড একটা ভেন্টিলেশন হুডের আড়ালে চলে এল ওরা। হঠাৎ করে ঘরের দরজা দড়াম করে খুলে গেল। এক লোক বেরিয়ে এল আঁধারে। ঘড়ি দেখল উর্বশী। আড়াইটা বাজে। লোকটা অসময়ে টহল দিতে বেরিয়েছে। এবার বেরিয়ে এল আরেকজন! এদের পরনে কালো ইউনিফর্ম, গলার স্লিঙে ঝুলছে কম্প্যাক্ট সাব-মেশিনগান। অস্ত্রের মডেল চিনতে পারল না উর্বশী, কিন্তু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র আছে, সেটা বোঝাই যথেষ্ট এখন—গোলাগুলি শুরু হলে মারাত্মক বিপদে পড়বে ওরা। পিস্তল দিয়ে সাব-মেশিনগান সামলানো যাবে না। উর্বশী অনুমান করল, এরা সম্ভবত আর্মিতে ছিল, এখন মার্সেনারি হয়ে গেছে, জলদস্যুদের নেতা এদের টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে। এরাই অ্যাভালাঞ্চে হামলা করেছে, রিসার্চারদের মেরে জাহাজটা ডুবিয়ে দিয়েছে।

প্রথমে যে-লোক বেরিয়ে এসেছে, সে সঙ্গীকে কী যেন বলল। উচ্চারণ শুনে উর্বশীর মনে হলো, লোকটা রাশান বা কোনও স্লাভিক ভাষা বলছে। রানা এখানে থাকলে বুঝতে পারত। সঙ্গীকে নিয়ে ভেন্টিলেটরের গাঢ় অন্ধকারে সরে গেল ও। লোকগুলো ওদের পাশ কাটিয়ে গেল। দ্রুত হাঁটছে। বামহাতে ধরে রাখা টর্চ। দূরে গিয়ে পড়া আলোর দিকে চোখ রাখছে। ডানহাত খালি, মুহূর্তে সাব-মেশিনগান নামিয়ে গুলি ছুঁড়বে। প্রতি দশ পা এগিয়ে রেইলিঙের পাশে থামছে, ড্রাই-ডকের হাল-এ আলো ফেলছে, তারপর টর্চ ফিরিয়ে হোল্ড ঢেকে রাখা কাভারটা দেখছে। উর্বশী বুঝতে পারছে, লোকগুলো কোনও ভুল করছে না, ধরা পড়তে ওদের খানিকটা সময় লাগবে, কিন্তু ধরা পড়তে হবেই। ড্রাই-ডকের গায়ে ঝুলে থাকা জোডিয়াকটা দেখলেই ঝামেলা শুরু হয়ে যাবে।

প্রহরীরা একটু দূরে চলে যাওয়ায় গলায় আটকানো মাইকে ফিসফিস করল উর্বশী, 'দু'নম্বর টিম, দু'জন গার্ড তোমাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।'

'ঠিক আছে,' জবাব দিল ওরা।

সোহেল আহমেদ আগেই জানিয়েছে, দ্য চুহায় ওরা উঠেছে তার কোনও প্রমাণ রাখা যাবে না। সিদ্ধান্ত নিল উর্বশী, এখন আর তা সম্ভব নয়। একটু আগে গার্ডরা যখন বেরল, তখন খেয়াল করেছে ও, চৌকো ঘরের দরজা দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া বেরিয়েছে—এখন দুই গার্ডের একজন অন্তত ধূমপায়ী হলে বাঁচা যায়।

ফিসফিস করল উর্বশী, 'আমরা জোডিয়াক যেখানে ঝুলিয়েছি, তার তিরিশ ফুট সামনে ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কের একটা ভেন্ট আছে। ওদের ওখানে ধরব আমরা।'

'ঠিক আছে।'

'কোনও গোলাগুলি চলবে না।'

বো আবারও ঘুরে এগোতে হবে? না—উর্বশী সিদ্ধান্ত নিয়ে হাতের ইশারা করল। ওর পিছু নিল পাইলট।

দু'জন ঝুঁকি নিয়ে কাভার মোড়া হোল্ডের উপর দিয়ে এগোল। কাভারটা যদি কাপড়ই হয়, খুব শক্ত করে প্যারাপেটের সঙ্গে আটকানো হয়েছে। জুতোর তলায় অতি সামান্য দাবছে। বিশ বর্গ-ফুটের কাপড়গুলো সেলাই করে পুরো হোল্ডের কাভার তৈরি করেছে। বিশ ফুট পরপর পুরু তার দিয়ে ফ্যাব্রিক জোড়া দিয়েছে। তবে সেলাইয়ের ফাঁক দিয়ে হোল্ডের ভিতরে তাকানো সম্ভব। যে-কারণেই হোক, লোকগুলো দ্য চুহার হোল্ড ঢাকতে সময় ব্যয় করেছে।

হোল্ড আড়াআড়ি পার হলো ওরা, ভেন্টিলেটরের আড়ালে অন্য দু'জনের সঙ্গে দেখা করল। এই ভেন্টগুলো প্রকাণ্ড ট্যাঙ্ক থেকে বাতাস বের করে, বদলে টেনে নেয় সাগরের পানি—এতে ড্রাই-ডকের ওজন অনেক বেড়ে যায়। হোল্ডের মধ্যে ছোটখাটো একটা সাগর তৈরি হলে সহজেই আরেকটা জাহাজ ভিতরে ভরে নেয়া হয়। এরপর ড্রাই-ডকের পাম্পগুলো চালু হয়। জলযানের দেহে অসংখ্য নাজল রয়েছে, ওগুলো দিয়ে পানি বেরিয়ে যায়।

ওরা প্রহরীদের হাতের টর্চ লক্ষ করছে। ঘুরে এগিয়ে আসছে তারা। উর্বশীর মনে হলো ওরা এখানে সারাজীবন অপেক্ষা করছে। সময় পার হতে চায় না। তারপর লোকগুলো স্টার্ন ঘুরল, এগিয়ে এল স্টার-বোর্ডের দিকে। সোজা ওদের অ্যাম্বুশের দিকে আসছে। তবে অ্যাম্বুশে পড়তে তাদের আরও চারশো ফুট আসতে হবে। অপেক্ষায় থাকল ওরা। উর্বশী টের পেল, ওর মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল, কিন্তু ঠোঁট ভিজল না। অনুভব করল, ওর সঙ্গীরা উত্তেজিত, আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়তে তৈরি।

জোডিয়াকের দশ ফুট পিছনে প্রহরীদের একজন থেমে দাঁড়িয়ে সঙ্গীর কাঁধে চাপড় দিল। দু'জন কী নিয়ে যেন আলাপ করছে, খিকখিক করে হাসল। তারপর বামপাশের লোকটা রেইলিঙের পাশে গিয়ে প্যান্টের চেইন খুলে ঝুঁকে দাঁড়াল। প্রস্রাবের রেখা নীচের দিকে রওনা হওয়ায় নীচের দিকে তাকাল সে।

যা হওয়া উচিত নয়, তা-ই হলো। সাধারণত চলমান জাহাজে বাতাস সামনে থেকে আসে, তাতে প্রস্রাবের ধারাটা পিছনে গিয়ে পড়া উচিত। কিন্তু পিছন থেকে আসছে দশ নট গতির হাওয়া। লোকটা নিজের সৃষ্ট বৃষ্টি দেখতে ঘাড় ফেরাল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে গেল—হাত কেঁপে যাওয়ায় আরেকটু হলে তার কাপড়ে প্রস্রাব লাগত। সঙ্গীর উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আরেহ্, পাবলো!'

ড্রাই-ডকের গায়ে ঝুলে থাকা জোডিয়াকটা দেখেছে লোকটা!

উর্বশী ও তিন কমাণ্ডো বুঝে ফেলল, ওদের দ্রুত কাজে নামতে হবে। হাতে আর সময় নেই।

পাবলো নামের লোকটা রেইলিঙের দিকে ঘুরেও তাকাল না, সঙ্গী পানি ছাড়ছে ছাড়ুক, সে টর্চ নিভিয়ে দিয়ে হোল্ডের উপর দিয়ে সোজা ছুটল। মুহূর্তে মিলিয়ে গেল সে ঘন অন্ধকারে। কর্তৃপক্ষ সম্ভবত নির্দেশ দিয়ে রেখেছে—অস্বাভাবিক কিছু দেখলে দুই গার্ডের একজন সরে পড়বে, গার্ড-হাউজে রেডিয়ো করবে।

রেইলিঙের পাশে দাঁড়ানো লোকটার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাল না উর্বশী, দ্বিতীয় গার্ডের পিছনে ছুটতে শুরু করে বলল, 'একে ধরুন! আমি হোল্ডে যাচ্ছি!'

সামনের লোকটা শক্ত ফ্যাব্রিক মাড়িয়ে ছুটছে, চারপাশে কম্পন তৈরি হলো। পিছনে প্রাণপণে ছুটল উর্বশী। পায়ের নীচে কাপড়টা দাবছে, দৌড়াতে গিয়ে বারবার হাঁটু মচকে যেতে চাইছে। ও জানে, ওর যা ঘটছে, তা-ই ঘটছে ওই লোকটারও। পিস্তল সহ ওর ওজন একশো নয় পাউণ্ড, কিন্তু সামনের লোকটা অন্তত আশি পাউণ্ড বাড়তি ওজন নিয়ে ছুটছে। তার কাছে মনে হবে আলগা ট্র্যামপোলিনের উপর দিয়ে দৌড়াচ্ছে। সাব-মেশিনগানের চকচকে ব্যারেল দেখতে পেল উর্বশী। লোকটার ফরসা ঘাড়ে চুলের রেখা দেখল। পিস্তলটা উঁচু করল ও।

গার্ড বুঝে ফেলেছে, তার পিছু নিয়েছে কেউ। দৌড়ের ফাঁকে উরুর খাপে থাবা দিল সে, ওয়াকি-টকি বের করবে। তারপর হাল ছেড়ে দিল, ঘুরে দাঁড়িয়ে সাব-মেশিনগান বুক সমান উঁচুতে তাক করল।

উর্বশী ছুটবার গতি না কমিয়েই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। ওর দেহ পিছলে কাপড়ের উপর দিয়ে এগোল। পিস্তলটা বাড়িয়ে রেখেছে ও, শরীর স্থির হতেই গুলি করল।

বুলেট গন্তব্যে পৌঁছুল না, কিন্তু গার্ড ভয়ে শুয়ে পড়ল। এক মুহূর্ত চুপ করে পড়ে থাকল সে। সুযোগটা নিল উর্বশী, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে একের পর এক গুলি করে ম্যাগাজিন খালি করল। দু'জনের দূরত্ব এখনও অন্তত পঞ্চাশ ফুট। কোনও ফায়ারিং রেঞ্জে উর্বশী এই দূরত্বে বারোটার মধ্যে এগারোটা গুলি বুল্স্ আই-এ লাগাবে, কিন্তু এই অন্ধকার অপরিচিত জাহাজে একটা গুলি লাগলে সেটাই অনেক বেশি। একটা বুলেট গার্ডের ডান কাঁধে গর্ত তৈরি করেছে। আরেকটু হলে হাতটা সঙ্গে নিয়ে যেত বুলেট। ভারী দেহ নিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল লোকটা, কাঁধের সঙ্গে ঝুলে আছে অকেজো হাত। তার ইউনিফর্ম রক্তে মাখামাখি, বৈদ্যুতিক আলোয় মনে হলো রক্ত যেন কোনও ধরনের তেল। অস্ত্রটা হারিয়ে ফেলেছে সে, কিন্তু হারতে রাজি নয়, উর্বশীর দিকে তেড়ে এল।

এখন আর রিলোডের সময় নেই উর্বশীর। উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে ছুটল ও, লোকটার মুখোমুখি হবে। মাঝামাঝি জায়গায় মুখোমুখি হলো দু'জন। লোকটার গতি কাজে লাগিয়ে হিপ-থ্রো করতে চাইল উর্বশী। কিন্তু আহত গার্ড পাত্তা দিল না, বামহাতে ওর গলা আঁকড়ে ধরল। আছাড় খেয়ে নরম মেঝেতে পড়ল দু'জন। পড়বার সময় লোকটার এক হাঁটু উর্বশীর বুকের উপরে পড়েছে। ফুসফুসে চাপ খেয়ে দম আটকে গেল ওর। কিন্তু দ্রুত উঠতে হবে! দাঁড়াতে হবে!

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রায় একইসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। গার্ড গুরুতর আহত, কিন্তু না দমে কোমরের খাপে থাবা দিল, টেনে বের করল ছোরা। একটু আগে আহত কাঁধ টিপে ধরেছিল, এখন আঙুল থেকে রক্ত টপটপ করে ঝরল। উরুর পাশে ধরেছে ছোরা, ওটা উপরে না তুলেই শত্রুর পেটে গেঁথে দিতে চাইল। সহজেই পিছাতে পারল উর্বশী, পিস্তলটা রিলোড করতে চাইছে। কিন্তু একটু সময় দরকার ওর।

গার্ড জানে, পিস্তলধারিণী সুযোগ পেলে সে শেষ। মরিয়া হয়ে ক্ষ্যাপার মত এগিয়ে এসে ছোরা চালাল সে। আবারও পিছিয়ে গেল উর্বশী, বুঝে গেছে, আক্রমণ না করে বাঁচবার পথ নেই ওরও। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল উর্বশী, এক

পা এগিয়ে পুরো শক্তিতে সাইড কিক করল গার্ডের ডানপায়ের হাঁটুতে। ছড়-ছড়াৎ করে একটা বিশ্রী আওয়াজ শুনল ও—লোকটার কার্টিলেজ ছিঁড়ে গেছে। চিত হয়ে পড়ল গার্ড। উর্বশী না এগিয়ে পিস্তলে নতুন ম্যাগাজিন ভরল, হাতের ঝটকায় স্লাইড টেনে নিল—চেম্বারে পৌঁছে গেল বুলেট। রাশান চুপচাপ পড়ে আছে, ডান কাঁধের নীচে ছোটখাটো একটা লাল পুকুর।

সাবধানে আরেক পা এগোল উর্বশী।

রাশান গার্ড ফিসফিস করে বলল, 'নেইয়েত, স্পেসিভো!'

এগোল না উর্বশী। লোকটার বামহাত দেহের তলায় আটকা পড়েছে। তবে এখনও সে বিপদ ঘটাতে পারে। পিস্তলের বাঁটে মুঠো শক্ত করল উর্বশী। লোকটাকে এখনই মেরে ফেলা উচিত। কিন্তু একে জীবিতাবস্থায় মার্ভেলে নিয়ে যেতে পারলে জরুরি সূত্র পাওয়া যাবে।

নির্দেশ দিল উর্বশী, 'ছোরাটা দেখি।'

চেহারা দেখে মনে হলো লোকটা ইংরেজি বোঝে। খুব সাবধানে বামহাত বের করে আনছে। ডান কাঁধ নড়ে ওঠায় ব্যথায় মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার। উর্বশী চার ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে, ভাবছে, ছোরাটা ছুঁড়ে দেবে নাকি! না মনে হয়, সেরকম তেড়িবেড়ি দেখলে এক গুলিতে মগজ ছিন্নভিন্ন করে দেবে ও। ছোরাটা বের করে আনল লোকটা, মনে হলো ওর পায়ের সামনে ফেলবে। কিন্তু বুঝে উঠবার আগেই দ্রুত ছোরা নামিয়ে আনল রাশান, তীক্ষ্ণধার ফলা প্লাস্টিকের ফেব্রিক চিরে দিল। টানটান ফেব্রিকে ছোট্ট একটা ফুটো হলো, পরমুহূর্তে মনে হলো প্রবল ভূমিকম্প শুরু হলো—কম্পনে মাটি যেমন ফেটে যায়, প্লাস্টিকের ফেব্রিকও তেমন ফাটল। চিড়চিড় আওয়াজে ছিঁড়ছে মেঝে! রাশান মুহূর্তে উধাও হলো! আশি ফুট নীচে তার জন্য অপেক্ষা করছে হোল্ডের ধাতব মেঝে!

উর্বশী নড়বার আগেই ফাটল বেড়ে গেল। ওর ওজনে ফেব্রিক ঝুলে গেল। পরমুহূর্তে ও দেখল, উপুড় হয়ে পড়ে আছে—দ্রুত পিছলে নেমে চলেছে ক্রমবর্দ্ধমান খোঁড়লের দিকে।

এগারো

দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে দিল উর্বশী, কিন্তু ওর গ্লাভ্স কোনও কাজে লাগছে না, বরং পিছলে দিল! ফেব্রিকের ফাটল বাড়ছেই! গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়ছে ও! গহ্বরের কিনারায় পৌঁছে গেল, দু'হাতে ছেঁড়া ফেব্রিক শক্ত করে ধরল। কিন্তু ওর দেহের পতনের গতি অনেক বেশি! এক সেকেণ্ড পর গর্তের মধ্যে চলে গেল ওর মাথা। তারপর দু'কাঁধ!

চেঁচানোর সুযোগ নেই! চেঁচিয়ে লাভ কী? সরসরিয়ে নেমে চলেছে ও! ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার! আশি ফুট নীচে হোল্ডের মেঝে! গর্তে কোমরটা আটকাল! ফ্যাব্রিকের দুলুনিতে ভিতরে কাঁধ-মাথা দুলছে। দু'পা ছড়িয়ে পতন ঠেকাবার চেষ্টা

করল। কিন্তু না, নেমেই চলেছে, এবার সোজা নীচে গিয়ে পড়বে ও!

গর্তে ঢুকে গেল দু'উরু! এবার পতন! কিন্তু কে যেন খুব শক্ত করে ওর বাম গোড়ালি ধরেছে! তবুও পিছলে নামছে ও! পরমুহূর্তে টের পেল, কেউ ওকে প্রাণপণে টানছে উপর দিকে! প্লাস্টিকের কর্কশ ফেব্রিক শরীরে আঁচড় কাটছে! গাল কেটে গেল। তারপর ওকে খোঁড়ল থেকে বের করা হলো!

শরীর মুচড়ে চিত হলো উর্বশী, জোডিয়াকের পাইলটের ধবধবে দাঁতগুলো দেখতে পেল ও। স্বস্তির হাসি হাসছে লোকটা!

'ভগবান!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল উর্বশী, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ! এক পলকের জন্যে মনে হলো...' চুপ হয়ে গেল ও।

মাথা দোলাল পাইলট। 'একটু হলেই পড়তেন।'

'দ্বিতীয় গার্ড?' জানতে চাইল উর্বশী।

'সরানো হয়েছে।'

'আচ্ছা,' দ্রুত হাতে কমব্যাট হার্নেস খুলছে উর্বশী, বলল, 'হাতে সময় পাব না আমরা, যে-কোনও সময় ওদের খোঁজ পড়বে।' বেল্ট থেকে সাসপেণ্ডার খুলল ও, ওগুলো দিয়ে আট ফুটি একটা বেল্ট বানানোর ফাঁকে বলল, 'দুই নম্বর টিম, আপনারা দ্বিতীয় লাশটা নিয়ে আসুন।'

জবাব এল, 'আসছি, ম্যাডাম।'

'আপনার হার্নেসটা দিন,' বলল উর্বশী। পাইলটের হার্নেস নিয়ে বেল্ট হিসেবে ব্যবহার করল ও, ওর দড়ির দৈর্ঘ্য বাড়ল। এক প্রান্তে একটা লুপ তৈরি করে কাঁধ গলিয়ে পরে নিল। চোখে নাইট ভিশন মনোকল্ পরল। পেরিমিটার ফ্লাড-লাইটের দিকে তাকাল না আর।

দ্বিতীয় টিম চলে এসেছে, লাশটা নামিয়ে রাখল। দুটো ব্যাপার লক্ষ করল উর্বশী। এক—কেউ মৃত গার্ডের প্যান্টের চেইন আটকে দিয়েছে। দুই—গার্ডের ঘাড় মটকে ভাঙা হয়েছে। নির্দেশ দিল ও, 'আপনারা হার্নেস দিয়ে আমাকে ধরে রাখবেন।'

ক্রল করে ফাটলের পাশে চলে গেল ও। রাশান গার্ড সেলাইয়ের পাশে ছোরা বসিয়েছে। টানটান ফেব্রিকের চাপ ও-জায়গায় অনেক বেশি। ও ভেবেছিল ফেব্রিক পুড়িয়ে গর্ত তৈরি করবে, যেন অন্য গার্ডরা আন্দাজ করে দুই গার্ড জ্বলন্ত সিগারেট না নিভিয়ে চরম ভুল করেছে। কিন্তু এখন আর পোড়ানোর প্রয়োজন নেই। এই ফাটলই যথেষ্ট। গার্ডরা ধরে নেবে এরা হোল্ডের উপর দিয়ে শর্টকাট মারতে গিয়ে সেলাই ছিঁড়ে ফেলেছে। ফলে পতন!

গর্তের আরও কাছে সরে গেল উর্বশী, টের পেল ওর ওজনে ফেব্রিক ঝুলে পড়ছে। তবে সমস্যা নেই, টিমের সবাই ওর দিকে খেয়াল রাখবে; বিপদ হলে মুহূর্তে টেনে সরিয়ে নেবে। গর্তের দিকে একটু পিছলে নীচে নামল ও। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীরা দু'হাত ধরে পতন ঠেকাল। শ্বাস ফেলে বলল উর্বশী, 'আমাকে ধরে রাখুন।'

ফাটলের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিল ও, খুদে একটা টর্চ জ্বালল।

প্রথম কাজ পাবলোকে দেখা। লোকটা কেমন ভাবে পড়েছে তার উপরে

নির্ভর করে ওদের অপারেশনের সফলতা। গুলির ক্ষত পরে অনেক কিছু বলে দিতে পারে। নীচে তাকাল ও। স্বল্প আলোর অপটিক্স দুই ডিমেনশনাল হয়, ফলে ওর মাথা ঘুরে উঠল না। সরাসরি ওর নীচে একটা মাঝারি জাহাজ আছে, সুপারস্ট্রাকচার দ্য চুহার স্টার্নের দিকে তাক করা। পিছনের দিকে তাকাল ও, তারপুলিনে লেগে যাবে বলে জাহাজের চিমনি ও মাস্তুলগুলো কাটা হয়েছে। উপর থেকে ভেসেলের নাম, পরিচিতি বা বৈশিষ্ট্য দেখা গেল না। তবে এটা এখন পরিষ্কার যে, এই দল জলদস্যুতা ও জাহাজ অপহরণ—দুটো কাজের সঙ্গেই জড়িত। এরা কি মানুষও পাচার করে?

উর্বশী লো-লাইট গগল্স্-এর সুইচ টিপে ওটাকে ইনফ্রারেড করে নিল। মুহূর্তে চোখে সব কালো লাগল, তবে একটা কিছু জ্বলজ্বল করে উঠল। জাহাজের রেইলিঙে কী যেন জ্বলছে, জিনিসটা নেমে গেছে হোল্ডে। ওখানে জ্বলজ্বলে রঙের একটা ছোট্ট পুকুর। ইনফ্রারেড বদলে নিয়ে নাইট অপটিক্স চালু করল উর্বশী, টর্চ জ্বালল। আইআর-এর কারণে রক্তের দাগ ও দেহটা দেখা গেছে। পাবলো প্রথমে ফ্রেইটারের রেইলিঙে গিয়ে পড়েছে, তারপর নীচের ডেকে। মাংস ছেঁচে গেছে, মাথাটা থ্যাঁতলানো। লোকটা যেভাবে পড়েছে, মনে হয় না প্যাথোলজিস্ট ছাড়া আর কেউ বুঝবে, গুলি খেয়েছে।

ওকে টেনে তুলতে বলল উর্বশী। সরে এসে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হোল্ডে একটা ট্যাঙ্কার। বড়জোর চারশো ফুটি। চিমনি-মাস্তুল কেটে ফেলেছে।'

মার্ভেলের অপারেশন্স সেন্টারে বসে জিজ্ঞেস করল সোহেল, 'উর্বশী, জাহাজের নামটা জানাতে পারবেন?'

'না। আমাদের এক্ষুণি সরে যেতে হবে। গার্ডদের ফিরে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে, চলে আসুন।'

কমাণ্ডোরা মৃত লোকটার লাশ গর্তের মধ্যে ফেলে দিল। মুহূর্তে ওটা হারিয়ে গেল।

উর্বশীর ইশারায় ফিরতি পথে ছুটল সবাই। এক মিনিট পেরনোর আগেই জোডিয়াক যেখানে আছে, সেখানে চলে এল ওরা। একে একে দড়ি বেয়ে নৌযানে নামল ওরা। পাইলট তৈরি হতেই শুটার দড়ি খুলে দিল। ইনফ্লেটেবলটা ঝপাস্ করে সাগরে পড়ল, তার আগেই ওটার ইলেক্ট্রিক মোটর চালু হয়ে গেছে। কয়েক সেকেণ্ড টলমল করল জোডিয়াক, তারপর সামলে নিয়ে ড্রাই-ডকের গা ছেড়ে সরে গেল, ছুটল মার্ভেলের দিকে।

পনেরো মিনিট পর বিশ নট গতিতে মার্ভেলের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ওরা। জাহাজের গ্যারাজে অপেক্ষা করছে নাবিকরা, তারা ক্লোস্ড্-সার্কিট টিভিতে জোডিয়াক আসতে দেখল। ইনফ্লেটেবল আরও কাছাকাছি চলে আসায় গ্যারাজের লাল বাতি জ্বেলে দেয়া হলো, খুলে গেল দরজা। তিরিশ সেকেণ্ড [redacted] জোডিয়াক র‍্যাম্পে উঠে এল, ঝাঁকি খেয়ে থামল। পাইলট ইঞ্জিন বন্ধ করবার আগেই গ্যারাজের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

উপস্থিত হয়েছে সোহেল, উর্বশীর হাতে সেল-ফোন ধরিয়ে দিল।

কালো ক্যাপটা খুলে কানে ফোন লাগাল উর্বশী। 'দাশা স্পিকিং।'
'উর্বশী, আমি রানা। কী পেলে?'
'দ্য চুহার ভিতরে মাঝারি একটা ট্যাঙ্কার আছে, রানা। নামটা জানতে পারিনি।'
'ক্রুদের কী হয়েছে আন্দাজ করতে পারো?'
'না। হোল্ড পুরোপুরি অন্ধকার ছিল। মনে হয় তারা আগেই খুন হয়ে গেছে। অবশ্য দ্য চুহার দুই টাগ-বোটে থাকতে পারে।'
রানা এ-ব্যাপারে আর কিছু বলল না। এরা মানুষ বাঁচিয়ে রাখবে কেন? নরম স্বরে বলল ও, 'ভেরি গুড জব, উর্বশী। থ্যাঙ্কস্।'
'মিস্টার আহমেদের সঙ্গে কথা বলো,' সেল-ফোন সোহেলের হাতে ধরিয়ে দিল উর্বশী। ঠিক করেছে, কেবিনে ফিরে এখন লম্বা একটা শাওয়ার নেবে। রওনা হয়ে গেল।
'কী করবি ঠিক করেছিস?' জানতে চাইল সোহেল।
'অনিল তো বলেছে দ্য চুহা তাইওয়ানের দিকে চলেছে,' বলল রানা। 'তোরা আগেই ওখানে পৌঁছে যেতে পারবি। যদি দেখি সত্যিই তাইওয়ানের কোনও বন্দরে গেছে, আমিও চলে আসব।'
'মানে বলতে চাইছিস ওটা আসলে...' প্রসঙ্গ পাল্টাল সোহেল, 'আর যদি আগেই অন্য কোনও দিকে রওনা হয়?'
'ওটার সঙ্গে থাকবি।'
'গগল পাগল হয়ে যাবে রে,' আফসোস করল সোহেল। 'ওই ড্রাই-ডক ঘণ্টায় মাত্র তিন মাইল নড়ে! গগল নালিশ করছিল, ওটা সত্যিই হয়তো একদিন কোনও বন্দরে ভিড়বে, কিন্তু দেখা যাবে, ততদিনে আমরা সবাই বুড়ো হয়ে মরে গেছি!'
'ওকে বল্, আপাতত কিছু করার নেই,' বলল রানা।
'তোর মনে আছে নাকিমুচির শেষ জাহাজটা ট্যাঙ্কার ছিল?' জানতে চাইল সোহেল। 'ওটার নাম ছিল টা... কী যেন?'
যোগান দিল রানা, 'টায়ে-টায়ে।'
'হ্যাঁ। মনে হয় ওটা এখন দ্য চুহার পেটের ভেতরে। আমরা ইচ্ছে করলে জাপান নেভি বা কোস্ট গার্ডে খবর দিতে পারি।'
'পারি। কিন্তু...'
মুখের কথা কেড়ে নিল সোহেল, 'ড্রাই-ডকের দুই টাগ-বোটে গুরুত্বপূর্ণ কেউ থাকবে না। সেক্ষেত্রে জানা যাবে না মানুষগুলো কোথায় যায়।'
'তা-ই আসলে,' বলল রানা। 'জলদস্যু বল্, জাহাজ-ডাকাতই বল্, বা আদম-ব্যাপারি—এরা সবাই অতি চালাক। কেন? কী করে সম্ভব? সব একই সুতোয় গাঁথা মনে হচ্ছে না?'
যেন নিজেকেই বলল সোহেল, 'সব নিয়ন্ত্রণ করছে অতি বুদ্ধিমান কোনও ব্রেন? কবীর চৌধুরীর মত?'
'মনে হয়,' বলল রানা। 'কবীর চৌধুরী তো অনেকদিন হলো ডুব দিয়েছে।

শেষ শুনেছি আর্জেন্টিনায় ছিল। তবে এশিয়া জুড়ে যা ঘটছে সেটার মধ্যে কোনও বিজ্ঞানের গন্ধ নেই। আমার ধারণা দ্য চুহা তাইপের কাছাকাছি গিয়ে আরেক দিকে রওনা হবে।'

'নেতৃত্বে যে লোকটা আছে, সে অন্য কোথাও বসে আছে, নির্দেশ দিচ্ছে, কিন্তু আমরা তার কিছুই করতে পারছি না,' বলল সোহেল।

'আমরা এখন নাকিমুচির উপকার করতে পারি, টায়ে-টায়ে সহ দ্য চুহা ধরিয়ে দিতে পারি, কিন্তু ওতে শুধু কয়েকজন কর্মচারী ধরা পড়বে—আসল লোকটা থাকবে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।'

'একই কথা আমিও ভেবেছি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহেল। 'কিন্তু পরিস্থিতির কোনও ডেভেলপমেন্ট নেই! অস্থির লাগছে।'

'আমারও,' স্বীকার করল রানা।

দ্য চুহা যেখানে আছে, তার পাঁচশো মাইল উত্তরে রয়েছে আরেকটা ড্রাই-ডক—ওটার নাম দ্য চুহি। চুহা ও চুহি আসলে ভাই-বোন। ওই প্রকাণ্ড ড্রাই-ডকটা এখন শাখালিন দ্বীপপুঞ্জ ও জাপানের উত্তর শেষপ্রান্তে লা পেরোইস স্ট্রেইট-এ রয়েছে, এগিয়ে চলেছে রুক্ষ সি অভ ওখোটস্ক-এর দিকে। ওটাকে টানছে শক্তিশালী দুটো টাগ-বোট। ড্রাই-ডকটা প্রতি ঘণ্টায় ছয় মাইল এগোচ্ছে। উর্বশী চুহার ভিতরে যে জাহাজটাকে দেখেছে, তার চেয়ে অনেক বড় জাহাজ গিলেছে ওটা।

সি অভ ওখোটস্ক-এ ঢুকল দ্য চুহি। সাগর যেন ফুঁসছে। একটার পর একটা ঢেউ এল। টাগ-বোট ও ড্রাই-ডকের লম্বা টো-লাইনগুলো টানটান হলো, আবার ঢিল পড়ল—ডুবে গেল সাগরে। পরমুহূর্তে শেকলগুলো লোহার দণ্ডের মত শক্ত হয়ে উঠল, পানি ছিটকে দিল। টাগ-বোটগুলো ক্ষ্যাপা সাগরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, ভারী ড্রাই-ডক নিয়ে উত্তরদিকে চলেছে। দ্য চুহি যেন সাগরকে পাত্তা দেবে না—প্রকাণ্ড ঢেউগুলো এসে ওটার বো-এ আছড়ে পড়ছে। ফেনাগুলো মেইন ডেকে পৌঁছে গিয়ে ঝরছে। ড্রাই-ডক বারবার দেহ তুলছে, যেন ঠিক করেছে, পাগলা সাগরকে তোয়াক্কা করবে না!

দ্য চুহার মত এটার হোল্ডও ঢাকা। তবে প্লাস্টিক শিট দিয়ে নয়, স্টিলের শিট দিয়ে। ওগুলো সব ঝালাই করা। হোল্ড প্রায় এয়ারটাইট, তবে স্টার্নের উপরে বসানো ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ভেন্টিলেটরগুলো কাজে ব্যস্ত। শক্তিশালী মেশিনগুলো প্রতি মিনিটে হাজার হাজার কিউবিক ফিট বাতাস হোল্ডে পাঠাচ্ছে। বদলে একই সমান বাতাস বের করে নিচ্ছে। নীচের ডেকে অসংখ্য কেমিকেল ফিল্টার কাজ করছে—ওগুলো দুর্গন্ধ কমিয়ে আনছে। এ এমন এক বদ গন্ধ, যা অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না! গত পৌনে দুশো বছরে খোলা সাগরে ওই পচা গন্ধ পাওয়া যায়নি!

অনিল যতক্ষণ না কোনও সূত্র পাচ্ছে, টোকিয়োতে আটকে গেছে রানা। তিনদিন হলো জিমনেশিয়াম আর ঘর করছে ও। এদিকে ফু-চুং বেইজিং হয়ে শাংহাই-এ

পৌঁছে গেছে। একবার ফোন করেছিল, তারপর উধাও। বিশাল চিন ভূখণ্ডে চাইনিজ মোবাইল-ফোনের কোম্পানিগুলো এখনও বড় শহর ও আশপাশের এলাকার বাইরে সার্ভিস পৌঁছুতে পারেনি। বহু দূরের গ্রামাঞ্চলে গেছে ফু-চুং, ওখানে সেল-ফোন সবার চোখে পড়বে, কাজেই ও জিনিস সঙ্গে রাখেনি ও। ওর সঙ্গে এখন আর যোগাযোগের কোনও ব্যবস্থা নেই।

সোফায় বসে একটার পর একটা সিগারেট পোড়াচ্ছে রানা, এমন সময় বুকের কাছে টিট-টিট করে উঠল সেল-ফোন। ওটা বের করে স্ক্রিন দেখল রানা—সোহেলের কল। রিসিভ করল ও, 'বল্।'

'আর কত বিশ্রাম নিবি তুই?' ধমকে উঠল সোহেল। 'এত আয়েস কীসের তোর, শুনি! খাচ্ছিস আর মোটা হচ্ছিস! ব্যাটা, মর্কট!'

ধক্ করে উঠল রানার হৃৎপিণ্ড। 'অনিল কিছু পেয়েছে?' কণ্ঠে চাপা স্বস্তি ঠেকাতে পারল না, বলল, 'শালা রে, তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।'

'আমি মরে লাশ হয়েছি, না মিথ্যুক রাজনীতিক হয়েছি যে ফুল-চন্দন পড়বে! বে-আদব! অনিলের সঙ্গে কথা বল্। লাইনে আমিও থাকছি।'

'কী রে?' বলল অনিল। 'তোর জন্যে সামান্য খবর আছে।'

'বলে ফ্যাল!'

'ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স, কোটি ডলারের ট্যাক্স হেভেন, ছায়ায় লুকানো কোম্পানি আর ডিরাইভেটিভের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে অনেক কিছু শিখলাম,' বলল অনিল। 'প্রথম কথা হচ্ছে, দ্য চুহার মালিক খুঁজতে ডামি কোম্পানি খুঁজেছি আমি। তোর নিশ্চয়ই মনে আছে কয়েকটা কোম্পানির কথা বলেছি?'

'হ্যাঁ।'

'জানলাম, এই কোম্পানিগুলো ড্রাই-ডক কিনতে ফর্ম করা হয়েছে। এসব কোম্পানির আর কোনও অ্যাসেট নেই।'

'শুনেছি মাঝে মাঝে এরকম করা হয়,' বলল রানা। 'তা হলে কোনও ক্লেইম হলে দেখা যায়, ওই ড্রাই-ডক ছাড়া এসব কোম্পানির আর কোনও অ্যাসেট নেই।'

'এরা কখনও ইনশ্যুরেন্স ক্লেইম করতে পারবে না,' বলল অনিল। 'আইন তা-ই বলে। ...খেয়াল করলাম এসব কোম্পানি একই দেশে ফর্ম হয়নি। একটার হেড-কোয়ার্টার পাকিস্তানে, একটা তাইওয়ানে, আরেকটা দুবাই-এ। আমি সরাসরি এনপি অ্যাডভাইজার্স এলএলসি-তে যোগাযোগ করি। ওদের কোনও টেলিফোনও নেই! চিঠিপত্র পোস্ট-অফিসের বক্সে জমা পড়ে। পরে অন্য ঠিকানায় পাঠানো হয়।'

'ঠিকানাটা বের করা যায়?'

'না। পোস্ট-অফিসে ঢুকে ডাকাতি করলে আলাদা কথা।'

'দরকার হলে তা-ই করব আমরা,' বলল রানা। 'বলে যা।'

'এসব কোম্পানির করপোরেট স্ট্রাকচার দেখলাম। কপাল ভাল যে ওদের ডেটা-বেজে পাবলিক রেকর্ডগুলো পেয়েছি। খুঁজলাম কোম্পানির বোর্ডে একই নামের লোক আছে কি না। নেই। যেসব কোম্পানি দ্য চুহা নিয়ে কাজ করছে,

তাদের একটা ব্যাপার চোখে পড়ল। কাদা ঘাঁটতে শুরু করলাম। চল্লিশজন ডিরেক্টর পেলাম,' চুপ হয়ে গেল অনিল। দম নিয়ে বলল, 'মনে পড়ে গেল উর্বশী দ্য চুহায় উঠেছিল, ওখানে রাশান গার্ড ছিল। এবার খেয়াল করলাম, এসব ডিরেক্টররা সবাই রাশান। এখন আমাদের অপেক্ষার পালা। ইন্টারপোলে সার্চ করছি এখন। কয়েকটা নাম বেরিয়ে এসেছে। এরা রাশান মাফিয়ার মাঝারি নেতা।'

'ধরে নিলাম এরাই জাহাজ হাইজ্যাক করছে, কিন্তু আদম-ব্যাপারিরা অর্গানাইয্‌ড্‌,' বলল রানা। 'ওরা কী রাশান মাফিয়াকে নিজেদের এলাকায় ঢুকতে দেবে?'

'দেয়ার কথা না,' বলল সোহেল। 'কিন্তু মনে হচ্ছে এই দুই দল একইসঙ্গে মিলে কাজ করছে।'

'আদম-ব্যাপারিরা রাশানদের সঙ্গে কোনও চুক্তি করেছে, এমন কিছু আমাদের জানা নেই,' বলল অনিল। আগের প্রসঙ্গে ফিরল, 'ক্ষমতাশালী কেউ রাশান মাফিয়াকে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে নামগুলো ধার করেছে। ডামি কোম্পানির জন্যে ফর্ম করা হয়েছে ডামি ডিরেক্টর। কিন্তু দুটো ব্যাপার লক্ষ করবার মত—প্রথমত, এসব কোম্পানি দ্য চুহার অংশ কিনেছে। দ্বিতীয়ত, এদের ডকুমেন্ট পাকা করেছে জুরিখের এক উকিল। লোকটার নাম লিয়ার বেয়ারমান।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'কয়েকমাস আগে ইউরোপে একটা বিশ্রী অর্থনৈতিক স্ক্যাণ্ডাল হয়,' বলল অনিল। 'নাৎসিদের চুরি করা সোনা মেরে দেয় কয়েকজন ব্যাঙ্কার। ...তোর মনে পড়ে?'

'আবছা ভাবে।'

'তখন জানা যায় সুইস ব্যাঙ্কগুলো সুইটযারল্যাণ্ডে নাৎসিদের সোনা লুকিয়ে রেখেছে। এই লিয়ার বেয়ারমান ওই মামলায় রাজ-সাক্ষী হয়। এ বিরাট একটা মানি লণ্ডারিং নেটওয়র্কের সঙ্গে জড়িত ছিল। ধরা পড়ে বুঝতে পারে তার আর মুক্তি নেই। বাধ্য হয়ে সুইস প্রসিকিউটারদের সঙ্গে চুক্তি করে, তথ্য ছাড়তে শুরু করে। কেলেঙ্কারির খবর বেরিয়ে আসায় বড় কয়েকটা ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট আড়ালে চলে যেতে বাধ্য হয়। কয়েকজন মিনিস্টার বাধ্য হয়ে রিযাইন দেয়। গত পরশু দিনের খবর বলছি তোকে—এখন বেরিয়ে আসছে, পিএলও সারা দুনিয়া থেকে যে টাকা পেয়েছে, তার বিরাট একটা অংশ আটকে ফেলেছে সুইস ব্যাঙ্কাররা। এখন জানা যাচ্ছে এরা ভেবেছে ইয়াসির আরাফাত নেই, কাজেই সব তাদের নিজেদের হয়ে গেছে। এদের ওপরে খেপে আছে পিএলও। বেয়ারমানকে পেলে হয়তো মেরে ফেলবে। এখন সাধারণ মানুষ অপেক্ষা করছে, কী হয় দেখবে।'

'এই উকিল এখন আছে কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'জুরিখের বাইরে, রেজেন্সডোর্ফ প্রিযন-এ, প্রটেক্টিভ কাস্টোডিতে,' বলল অনিল। 'পাঁচ মাসে কয়েকবার তাকে স্পেশাল প্রসিকিউটোরিয়াল কোর্টে আর্মার্ড ভ্যান করে নেয়া হয়েছে। সাধারণ কেউ আশপাশে যেতে পারবে না। লোকটাকে পরিয়ে রাখা হয় ফ্ল্যাক ভেস্ট আর হেলমেট, মুখে থাকে ভারী ব্যাণ্ডেজ। সুইস

প্রেস ধারণা করছে প্লাস্টিক সার্জারি করে লোকটার মুখ বদলে দেয়া হবে। বিচার শেষে নতুন পরিচয় নিয়ে বহুদূরে কোথাও চলে যাবে সে।'

'আর্মার্ড ভ্যান?' বিড়বিড় করে বলল রানা।

'সঙ্গে পুলিশের এসকর্টও আছে,' জানাল অনিল। 'আমরা যদি ধরে নিই ওই লোক আমাদের হাতের অনেক বাইরে, তা হলে মাত্র একটা পথই থাকে। আমরা মাফিয়ার নেতাদের পিছু নিতে পারি। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হবে বলে মনে হয় না।'

'ক'টার পিছনে দৌড়াব আমরা?' বলল সোহেল।

'কোনও ভিজিটর বেয়ারমানের সঙ্গে দেখা করতে পারে?' জানতে চাইল রানা। জবাবটা অন্তরে পেয়ে গেল। বেয়ারমান এখন রাজ-সাক্ষী হওয়ায় ভাল অবস্থানে আছে, চমৎকার একটা চুক্তি পেয়েছে, এখন উল্টোপাল্টা বলে নিজের ক্ষতি করবে না। অন্য কোনও পথে লোকটাকে পেতে হবে।

'মাত্র একজন তার কাছে যেতে পারে,' বলল অনিল। 'তার স্ত্রী।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা, অদ্ভুত একটা চিন্তা খেলে গেছে ওর মনে। একটা পথ দেখতে পাচ্ছে ও। লিয়ার বেয়ারমানের মুখ খোলাবার একটা উপায় আছে। ব্যাপারটা অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ। আইনের অনেক বাইরে চলে যেতে হবে। তবে তথ্য পাওয়া যাবে। নিজেকে প্রশ্ন করল ও, আমরা যদি পিএলও-র লোক হই? পিএলও তো খেপে আছে। ...অভিনয় খুব ভাল হতে হবে।

নীরবতা ভাঙল সোহেল, 'কী ভাবছিস?'

'আমাদের কাছে লিয়ার বেয়ারমানের বউয়ের ছবি আছে?' জানতে চাইল রানা।

'সুইটযারল্যাণ্ডের নিউজ পেপারের আর্কাইভ ঘাঁটলে পেয়ে যাব,' জানাল অনিল।

'তা হলে জোগাড় কর্ তোরা,' বলল রানা। পরমুহূর্তে বোমা ফাটাল, 'আমি তা হলে জুরিখে চললাম, চারপাশ না দেখে কিছু বলব না—মুখ খুললে তোরা আমাকে পাগল ভাববি। ...তোরা এখন কোথায়?'

'পুব চিন সাগরে, তাইওয়ানের দুশো মাইল উত্তরে,' জানাল সোহেল।

'আর, দ্য চুহা?'

'আমাদের বিশ মাইল সামনে,' বলল সোহেল। 'ওটার রেইডার ওই পর্যন্ত কাজ করে। বারো ঘণ্টা পর পর ইউএভি দিয়ে ওটাকে দেখছি আমরা। এখনও কোর্স পাল্টায়নি।'

'পরে তোদের সব খুলে বলব,' বলল রানা। 'ড্রাই-ডকের সঙ্গে লেগে থাক।' দু'বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফোন রেখে দিল ও। মনে মনে হিসাব কষল, দ্য চুহা প্রতিদিন বড়জোর একশো পঞ্চাশ মাইল যায়, আরও দেড় দিন পর তাইপে-তে পৌঁছুবে। কিন্তু ওর মন বলছে ওটা কোর্স পাল্টাবে, অন্য কোনও দিকে রওনা হবে। এমন কোথাও যাবে, যেখানে গোপনে জাহাজ সরানো যায়। ভিয়েতনাম? ফিলিপাইনস? নাকি ইন্দোনেশিয়া?

হাতে বেশি সময় নেই। মার্ভেল তাইওয়ান ছেড়ে দূরে চলে গেলে মুশকিল

হবে। ওটার কপ্টারের রেঞ্জ এত বেশি নয় যে যখন-তখন ব্যবহার করা যাবে। দূর সাগরে চলে গেলে প্রয়োজনীয় রসদ পাবে না ও। হাতে মাত্র দু'দিন আছে। এরইমধ্যে জুরিখ ঘুরে পরিস্থিতি দেখে ঠিক করতে হবে কারা সঙ্গে যাবে, কী সঙ্গে নেবে।

যে-পরিকল্পনা ও করেছে, তাতে দ্রুত কাজ সারতে হবে। ভুলেও কোনও ভুল করা চলবে না। ওরা কেউ ধরা পড়লে রেজেন্সডোর্ফ-এ পচে মরবে। দলবল নিয়ে ওখানে ঢুকতে চায় না ও। আজ পর্যন্ত কেউ রেজেন্সডোর্ফ প্রিযন ছেড়ে পালাতে পারেনি। কাজেই ওদের উদ্ধার করবে না কেউ।

রানা মনে মনে বলল, 'খুব সাবধান, রানা! খু-উ-ব সাবধান!'

বারো

টোকিয়ো থেকে বেইজিঙে ফিরে একবার অফিসে ঢুঁ দিয়েছে ফু-চুং, ওখানে শুনেছে ফুজিয়ান প্রভিন্সে রিজিয়োনাল ইলেকশন চলছে। জেনে নিয়েছে, শিচেন মফস্বলের শহর, বরং বলা উচিত বড় একটা গ্রাম—জনসংখ্যা নয় হাজার। চারপাশের আর সব গ্রামের মতই ওখানে নির্বাচন উপলক্ষে তাঁবু গেড়েছে সেনাবাহিনী। সৈন্যদের ট্যাগ-আইডেণ্টিফিকেশন সঙ্গে নিয়েছে ও, পকেটে মোটা টাকা। স্নেকহেডের নেতা জানতে চাইলে বলবে, সেনাবাহিনী ছেড়ে পালিয়েছে।

এয়ার-চায়না ফ্লাইটে শাংহাই পৌঁচেছে। এরপর বাস টার্মিনালে গিয়ে ফুজিয়ান প্রভিন্সের বাস ধরেছে। বাইশ ঘণ্টার জার্নি। আটশো কিলোমিটার। মাঝখানে লিসুইয়ে এক ঘণ্টার বিশ্রাম। তারপর আবারও এগোনো। বাস শেষপর্যন্ত ওকে নামিয়ে দিয়েছে সানমিং-এ। এরপর আধঘণ্টা অপেক্ষা করে লোকাল বাস ধরে শিচেনের পাঁচ মাইল দূরে নেমেছে। সাড়ে চার মাইল হেঁটেছে। মিলিটারির প্রশ্নের ভয়ে এখন একটা সেতুর নীচে ইরিগেশনের গভীর নালার পাশে শুয়ে অপেক্ষা করছে। আর্মি সরে গেলে বেরোবে এখান থেকে। ওর তিন-ফুট দূর দিয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে শীতল স্রোত। আশপাশে কেউ নেই। বামে বহুদূরে ধানের খেত দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। ডানপাশে ঝোপঝাড়-জঙ্গল। মাঝখান দিয়ে ইঁটের রাস্তা চলে গেছে শিচেন-এ।

আগেই শিচেনে ঢুকতে পারত ও, কিন্তু ভেবে দেখেছে, যাওয়া উচিত হবে না। এসব খুদে মফস্বল শহরে সবাই সবাইকে চেনে। সন্দেহের দৃষ্টিতে ওকে দেখা হবে। সেনাবাহিনী যে-কোনও সময় চ্যালেঞ্জ করতে পারে। সে-রকম কিছু হলে নানান প্রশ্ন উঠবে। সেক্ষেত্রে বেইজিঙের অফিসে যোগাযোগ করতে হবে। সেনাবাহিনী ছেড়ে দেবে ঠিকই, কিন্তু জানাজানি ঠেকানো যাবে না।

সাত ঘণ্টা আগে লুকিয়েছে ফু-চুং। ঠিক করেছে রাত নামলে শহরে ঢুকবে। হুড়োহুড়িতে ভাল কোনও প্ল্যান তৈরি করতে পারেনি ও। ঠিক করেছে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে, পরিস্থিতি অনুযায়ী এগোবে।

এসবই ভাবছিল ফু-চুং, কিন্তু হঠাৎ গলার আওয়াজে সচেতন হয়ে উঠল। কাঠের ব্রিজে উঠছে কেউ। রাস্তার সুরকি ঢাল বেয়ে নালায় পড়ল।

'আরেকটু দূরেই,' পুরুষ কণ্ঠ আহ্লাদ করল, 'শহরে আসার সময় জায়গাটা দেখেছি। খুব সুন্দর জায়গা।'

'না, আমি বাড়ি ফিরব,' বলল নারী কণ্ঠ। কমবয়সী কোনও মেয়ে। কিশোরী, বা তরুণী। মনে হয় ভয় পেয়েছে।

পুরুষ কণ্ঠ বলল, 'তোমার কোনও ভয় নেই।' সুরে স্থানীয় টান নেই। শাংহাই বা আশপাশের বাসিন্দা। মেয়েটা মফস্বলের।

'না। প্লিইজ। আমার বাবা-মা চিন্তা করবে। আমার কাজ আছে।'

লোকটা ভদ্রতার মুখোশ খুলে ফেলল, 'এসো, আসতে বলেছি আমি!' কড়া স্বর। কামনা? রাগ? কণ্ঠে কর্কশ সুর।

ফু-চুঙের মাথার উপর দিয়ে চলেছে তারা। সেতুর কাঠ মচমচ করল, ধুলো নীচে পড়ছে। দু'জনের পদক্ষেপ বদলে গেল। মনোদৃষ্টিতে তাদের দেখতে পেল ফু-চুং। মেয়েটা দাঁড়িয়ে পড়তে চাইছে। কিন্তু লোকটা তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল ফু-চুং, নালা পার হয়ে সেতুর ও-প্রান্তে চলে গেল। উপরে লোকটা সঙ্গিনীকে ধরে নিয়ে চলেছে, হাঁপাচ্ছে। চাপা স্বরে বলল, 'খুব মজা পাবে! কোনও ভয় নাই!'

'ছাড়েন, ছেড়ে দিন আমাকে!' এক কথাই বারবার বলে চলেছে মেয়েটা। ভয়ে কাঁপছে গলা।

ডানপাশে ঝোপঝাড় আর জঙ্গল। মেয়েটাকে ওখানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হবে। সেতু পেরিয়ে গেল দু'জন। রাস্তা জঙ্গল পেরিয়ে শিচেনের দিকে বাঁক নিয়েছে। কেউ ওদিক থেকে এলে ভাল হতো। ফু-চুং জানে, সেতুর নীচে থাকাই ওর জন্য ভাল, কিন্তু একটা মেয়েকে ধর্ষণ করা হবে, আর চুপচাপ বসে থাকবে ও? ধস্তাধস্তির মাত্রা বেড়ে গেছে। যেতে চাইছে না মেয়েটা।

ঢাল বেয়ে উঠে এল ফু-চুং, সাবধানে চারপাশ দেখল।

লোকটা সোলজার। কাঁধে একে-ফোরটিসেভেন ঝুলছে। ওর ইউনিফর্ম মেয়েটির পোশাকের চেয়ে ঢের দামি ও পরিষ্কার। সঙ্গিনীকে দু'হাতে তুলে ঝোপের দিকে এগিয়ে চলেছে সে। তরুণীর দু'পা মাটি ছুঁই-ছুঁই করছে। মুক্তি পাবার জন্য পা ছুঁড়ছে, শরীর মোচড়াচ্ছে। লোকটা কাছের গাছগুলোর দিকে চলেছে।

পাহাড়ি এলাকা, সূর্য এইরমধ্যে ঢলে গেছে, গাঢ় কালো ছায়া নামছে। মেয়েটার পরনে সাধারণ স্কার্ট, সাদা ব্লাউজ। শীর্ণ কাঁধে পড়ে আছে চওড়া বেণী দুটো।

চুপচাপ অপেক্ষা করল ফু-চুং। লোকটা শিকার ধরে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। ওই জঙ্গলের ওপাশে আছে শিচেন। রাস্তার দিকে আরেকবার তাকাল ফু-চুং। কেউ আসছে না। দ্রুত পায়ে জঙ্গলে ঢুকল ও, কান পাতল। ওই লোক আরও গভীরে ঢুকছে। মেয়েটা চেঁচিয়ে সাহায্য চাইল, তারপর আবছা গোঙানির

আওয়াজ ভেসে এল। লোকটা নিশ্চয়ই এক হাতে ওর মুখ চেপে ধরেছে।

নিঃশব্দে এগোল ফু-চুং। একটা বিরাট পাইন গাছের তলায় চোখ পড়ল—সাদা কাপড়টা পাতার কার্পেটে পড়ে আছে। মেয়েটার ব্লাউজ। পায়ে পায়ে মোটা পাইনের পিছনে চলে এল ফু-চুং, আড়াল থেকে তাকাল।

তরুণীকে মাটিতে ফেলে জাপ্টে ধরেছে লোকটা। পাশেই পড়ে আছে রাইফেলটা। নিজের বুক দিয়ে মেয়েটাকে ঢেকে ফেলেছে সে। ঝটকা-ঝটকি করছে তরুণী, চিৎকার করতে চাইছে। কিন্তু লোকটা বাম হাতে তার মুখ চেপে ধরেছে, ডান হাতে স্কার্ট খুলছে। এবার পিশাচটা বুঝে গেল, এভাবে হবে না—মুখ ছেড়ে দিল সে, চিৎকারের সুযোগ পেল না তরুণী, চোয়ালে প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে মুহূর্তে জ্ঞান হারাল।

লোকটা নয় ফুট দূরে, ব্যস্ত হয়ে স্কার্ট খুলছে। তাকে না টপকালে রাইফেল পাওয়া যাবে না। শামুকের গতিতে পাইনের কাণ্ডের আড়াল ছাড়ল ফু-চুং। মানুষের চোখ সরাসরি সামনে যতটা দেখে, তার চেয়ে অনেক ভাল দেখে চোখের কোণ দিয়ে। ফু-চুং তিন কদম ফেলতেই ওর উপস্থিতি টের পেয়ে গেল লোকটা। দেরি না করে ধেয়ে গেল ফু-চুং। লোকটা রাইফেল তুলতে হুমড়ি দিল। বামহাতে বাঁটের গ্রিপ ধরে ফেলল সে, অভ্যস্ত ডান হাতে খুঁজল সেফটি ক্যাচ। টার্গেটের দিকে রাইফেল ঘোরাল সে। মনে মনে হায়-হায় করে উঠল ফু-চুং, লোকটা হয়তো গুলি মিস করবে, কিন্তু আওয়াজ শহরে পৌঁছে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসবে সেনাবাহিনীর সদস্যরা। ব্যাপারটা লোকটা নিজেও জানে, তাই ওকে সাইটে পাওয়ার আগেই ট্রিগার টিপছে।

তীরের মত ঝাঁপ দিল ফু-চুং। ডানহাত বাড়িয়ে দিল ব্যারেল ধরতে, ওর বাম হাতের কারাতে চপ ছুটল লোকটার উইণ্ড-পাইপের দিকে। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে ও, লোকটা ট্রিগার টিপে দিল! কিন্তু গুলি বেরুলো না!

তরুণীর বুকের উপর থেকে লোকটাকে তুলে নিয়ে ছিটকে পড়ল ফু-চুং। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে শত্রুসহ দু'বার গড়াল লোকটা। পিছনে মেয়েটা জ্ঞান ফিরে পেয়েছে, চিৎকার করে উঠল। ওদিকে মনোযোগ ফেরাল না ফু-চুং। লোকটা ওর বুকের উপরে পড়ে আছে। নড়ে উঠবার আগেই বাম হাতে চুল চেপে ধরে উঁচু করল ফু-চুং, পরপর দু'বার অ্যাডাম্‌স্ অ্যাপ্‌ল্-এ ডানহাতি চপ মারল। হাতে পুরো জোর পায়নি ও, তবে দু'বার আঘাত যথেষ্ট হলো। লোকটার উইণ্ড-পাইপ ভেঙে গেছে। কয়েক মুহূর্ত হাঁসফাঁস করল লোকটা, তারপর মারা গেল।

লাশ গা থেকে নামিয়ে দিল ফু-চুং, উঠে দাঁড়াল। মেয়েটা কাত হয়ে পড়ে আছে, গোঙাচ্ছে। তরুণীকে তুলে বসাল ফু-চুং, ব্লাউজটা নিয়ে এসে ওর গা ঢেকে দিল। তরুণীর চোয়ালের হাড় খুলে যায়নি, তবে কয়েকদিন গালে কালসিটে দাগ থাকবে। ব্যথায়-ভয়ে কাঁপছে। মুঠো পাকানো হাত দুটো খুলে দিল ফু-চুং। তরুণীর ডান তর্জনী অস্বাভাবিক বেঁকে গেছে। এবার ফু-চুং বুঝল কেন রাইফেলের গুলি বের হয়নি। মেয়েটা ধর্ষণকারীকে প্রাণপণে ঠেকিয়েছে, পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে ট্রিগারের পিছনে আঙুল ভরে দিয়েছে। ও ফু-চুংকে বাঁচিয়েছে, নিজেকে ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ফু-চুং যখন রাইফেল কেড়ে নেয়, তখন

ওর আঙুল ভেঙে গেছে।

'অনেক সাহস তোমার,' নরম স্বরে বলল ফু-চুং।

গোঙানির ফাঁকে জিজ্ঞেস করল তরুণী, 'কে আপনি?'

'এমন কেউ নই, যে বলব,' বলল ফু-চুং। 'ধরে নাও আমাকে দেখোনি তুমি। মাঠে কাজ করতে গিয়ে পিছলে পড়ে গিয়েছিলে তুমি, তখন আঙুল ভেঙে গেছে। আমার কথা বুঝতে পারছ তো?' লাশটা দেখল তরুণী, তারপর ঘুরে তাকাল। যেন নীরবে প্রশ্ন করছে। 'লাশের ব্যবস্থা করব আমি,' বলল ফু-চুং। 'তোমার কোনও চিন্তা করতে হবে না। কেউ জানবে না কী হয়েছে। এবার তুমি বাসায় চলে যাও। আজকের এই ঘটনা মন থেকে মুছে ফেলো।'

সরে বসল তরুণী, কাপড় পরছে। দুটো বোতাম খসে পড়েছে, কিন্তু ব্লাউজ পরা যায়। উঠে দাঁড়াল, দু'চোখের কোণে অশ্রু টলটল করছে। বামদিকের জঙ্গলের দিকে এগোল।

'একটু দাঁড়াও,' বলল ফু-চুং। 'শিচেনে গাওলুং নামের একটা পরিবার আছে, তাদের কয়েকজন দেশ ছেড়ে স্নেকদের সঙ্গে চলে গেছে। তাদের চেনো তুমি?'

তরুণীর চোখে কী যেন—ভয়? দুঃসংবাদের আশঙ্কা? কেঁপে উঠল একবার। মনে হলো যে-কোনও মুহূর্তে দৌড়ে পালাবে। কিন্তু নড়ল না, বোধহয় ঠিক করেছে উদ্ধারকারীর প্রশ্নের জবাব দেবে। বলল, 'হ্যাঁ, ওরা শহরে থাকে। ওদের একটা পুরোনো সাইকেলের দোকান আছে। সবাই ওরা ভাল মানুষ। আপনি কী ওদের জন্যে কোনও খবর নিয়ে এসেছেন?'

মেয়েটার কথায় মনে হলো গাওলুংদের ভাল করেই চেনে। হতে পারে মৃত যুবকটি যে-মেয়ের কথা লিখেছে, এ-ই সেই তরুণী। 'হ্যাঁ, একটা খবর আছে,' বলল ফু-চুং। পরের কথাটা বলতে গিয়ে তিক্ত হয়ে গেল ওর মন। 'হ্যাঁ, জাপানে পৌঁছে গেছে ওরা। কাজ পেয়েছে। ...এবার তুমি যাও!'

শেষ খবরটা শুনে, যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেছে সে, দ্রুত পায়ে জঙ্গলে হারিয়ে গেল তরুণী। দাঁতে দাঁত চাপল ফু-চুং—ওই ধর্ষণকারীর চেয়ে খারাপ কাজ করেছে ও। মেয়েটাকে এমন এক আশা দিয়েছে, যে-আশা কখনও পূরণ হবে না।

রাইফেলের স্লিং খুলে নিল ফু-চুং, সৈনিকের বেল্টও। চারপাশটা ঘুরেফিরে দেখে নিয়ে ফিরে এল। এবার লাশটা তুলে একজোড়া ওক গাছের তলায় নিয়ে রাখল। পনেরো মিনিট পরিশ্রম করে লাশটা গাছের উপরে তুলে বেঁধে ফেলল। আর্মি লোকটাকে খুঁজবে, সার্চ-পার্টি ধরে নেবে পালিয়েছে। লাশ পেতে কয়েকদিন লাগবে। মৃতদেহের গন্ধ সবাইকে ডেকে আনবে।

একটা ডাল ভেঙে নিয়ে পায়ের চিহ্ন মুছে ফেলল ফু-চুং, ফিরে এল সেই সেতুর নীচে। মেয়েটা এতক্ষণে বাসায় চলে গেছে। মা ওকে নিয়ে গেছে ডাক্তারের কাছে। ওর আর বিপদ হবে না। কিন্তু ফু-চুঙের বিপদ মাত্র শুরু হলো।

নিজেদের লোক না পাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে সরবে না মিলিটারি। কালকের রোল কল-এ ধরা পড়বে, তাদের একজন লোক কম। সার্চ-পার্টি খুঁজতে বেরবে। মৃত লোকের বন্ধুরা তাকে বাঁচাতে চাইবে। সবাই ধরে নেবে, সে কোনও চাষীর

সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে।

আর্মি পুরো শহর খুঁজবে। তারপর আশপাশের খামারে। সার্চ-পার্টি ধীরে ধীরে বৃত্ত বড় করবে। ফু-চুং আগামীকাল শহরে থাকলে আটকা পড়বে। তার মানে, ভোরের আগে স্নেকহেডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। সিয়েন লাউকে জানাতে হবে, ও আর্মি ছেড়ে পালিয়েছে, এবার দেশ ছেড়ে চলে যেতে চায়। কানাঘুষা শুনে ওই লোক নিশ্চিত হবে সত্যিই পালিয়েছে ও।

তারপর কী ঘটবে?

তেরো

ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন মনে মনে স্বস্তি বোধ করছে। একের পর এক ক্লান্তিকর ফ্লাইট শেষ হয়ে আসছে। আর মাত্র একটা ফ্লাইট, তারপর পৌঁছে যাবে রিজিয়োনাল ক্যাপিটাল পেট্রোপাভ্লোভস্ক-কামচাটস্কিয়িতে। এলিযোভো এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করতে হবে না, ওখান থেকে চলে যাবে সে কামচাটকা পেনিনসুলায়, সাগরের তীরে। রাশার শেষ পুব প্রান্ত ওটা। তার কাজ ওখানেই।

আজ থেকে পঁচিশ লক্ষ বছর আগে কামচাটকা সাগর ছেড়ে উঠে আসে। কয়েক হাজার বছরের মধ্যেই সাগর পর্বতগুলোকে ধুয়ে নামিয়ে দেয়, কিন্তু পরে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি এই এলাকা নিজেদের মত করে সাজিয়ে নিয়েছে। দেড়শো আগ্নেয়গিরির মধ্যে ঊনত্রিশটা এখনও জীবন্ত। যেমন কারিম্স্কি আগ্নেয়গিরি, উনিশশো ছিয়ানব্বুইর পর আবারও খেপে উঠেছে ওটা। মানুষজন অবশ্য আগেই সরে গেছে। এই আগ্নেয়গিরি এখন আকাশে ছাই ছুঁড়ছে। সেই সঙ্গে ইদানীং জুটেছে নাম-না-জানা আরেকটা।

প্রায় আড়াই দশক আগে ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন একটা সরকারি সার্ভে টিমের সঙ্গে এখানে খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা জরিপ করতে আসে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতারা ধারণা করেছিল এই বিশাল এলাকায় প্রচুর খনি পাওয়া যেতে পারে। সে-সময় প্রেসিডেন্ট রিগান আমেরিকার সামরিক শক্তির অকল্পনীয় বৃদ্ধি করে পশ্চিমা দেশগুলোর বাহবা কুড়াচ্ছে। সোভিয়েতরাও বাধ্য হয়ে নিজেদের মিলিটারি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল-কমপ্লেক্সের জন্য খনিজ সম্পদ খুঁজতে শুরু করে পূর্ণোদ্যমে। তারা জানত, বুলেট বা বোমা দিয়ে লড়াই হবে না, টক্কর দিতে হবে হাজারো ফ্যাক্টোরি গড়ে। ঠাণ্ডা লড়াই জিততে হলে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য অতি জরুরি হয়ে ওঠে নিজের জমি থেকে সম্পদ উত্তোলন। সে-সময় খনিজ সম্পদ খোঁজার পিছনে যে-পরিমাণ উদ্যোগ নেয়া হয়, সেটা পরে আর হয়নি। পাওয়া যায় কয়লা, লোহা, ইউরেনিয়াম ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ।

ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন ছিল তখন ব্যুরো অভ ন্যাচারাল রিসোর্সেস-এর ফিল্ড রিসার্চার। সেণ্ট্রাল কমিটি ব্যুরোকে সোভিয়েত সীমান্তের সমস্ত খনিজ সম্পদ খুঁজে বের করবার নির্দেশ দেয়। উনিশশো ছিয়াশিতে কামচাটকা পেনিনসুলায় আসে

সরোকিন। সঙ্গে ছিল আরও দু'জন। এই তিনজনের নেতৃত্বে ছিলেন মস্কো ইউনিভার্সিটির জিয়োলজির অ্যাকাদেমিক প্রফেসর আইয়ো আকানভ।

চারজনের এই দল চার মাস ধরে রেড আর্মির হেলিকপ্টার ও অল-টেরেইন ভেহিকেলে চড়ে চারপাশ ঘুরে দেখে। অ্যাকটিভ জিয়োলজির কারণে ধরে নেয়া হয় কামচাটকায় হীরার খনি পাওয়া যাবে। কিন্তু পরে দেখা গেল মস্কোর বিশ্বাস ঠিক নয়। অবশ্য হীরার বদলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্য এক সম্পদ পাওয়া গেছে।

সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে সরোকিনের। সে-সময়ে রিফের কাছে ক্যাম্প করেছিল ওরা। চারজন মিলে সারাদিন স্যাম্পল জোগাড় করত, আর রাতে বসে কল্পনা করত কী পেতে পারে। সে-সময় মনে হতো যা কিছু পাওয়া যাবে, সব তো আসলে ওদেরই। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। সম্পদের বদলে তারা পাবে খানিকটা প্রশংসা, সেই সঙ্গে পিঠ চাপড়ে আশ্বাস দেয়া হবে, ভবিষ্যতে তারা আগের চেয়ে বড় অ্যাপার্টমেন্ট পাবে।

সরোকিনের মনে পড়ে না কে প্রথমে কথাটা বলেছিল, হয়তো সে নিজেই, কিন্তু এখন আর মনে নেই। সবাই মিলে খুব হেসেছিল। পরে সবাই বারবার আলাপ করেছে, কল্পনা করেছে। সে-রাতে বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল কামচাটকায়। সবাই মিলে একটা ভোদকা শেষ করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে আর যা-ই দিক বা না দিক, সে-যুগের কমিউনিস্ট নেতারা সবাইকে প্রচুর পরিমাণে ভোদকা যোগান দিতে ভুল করত না।

একজন পষ্ট জিজ্ঞেস করেছিল—আমরা যা পাব, তা-ই সবাইকে বলব? ওরা চারজন সত্যিকার ঘটনা জানত। ওরা বুঝতে পারে, একবার রিপোর্ট করলে আর ফিরতে পারবে না কখনও। অনেক আলাপ করেছে ওরা। একজন বলেছিল, আরেকটা কাজ করা যায়, ওরা মস্কোতে ফিরে যেতে পারে, অপেক্ষা করতে পারে। পরে এখানে এসে রিফে কাজ করতে পারবে। সবাই বড়লোক হয়ে যাবে।

ইলাইয়ুশিন জেট-লাইনার থেমে গেছে, দরজা খুলে দেয়া হলো। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে অ্যাকাদেমিক আকানভের চেহারাটা মনে পড়ায় হাসল সরোকিন। লোকটা ওদের দু'ঘণ্টা স্বপ্নে ঘুরবার সুযোগ দেয়, তারপর বাস্তবে নামিয়ে আনে। লোকটা একবারও বলেনি ওদের অন্যায় হবে। লোভ তারও হয়েছিল। স্বাভাবিক। চালাক মানুষ ছিল, ভাল করেই জানত ওরা স্বপ্নে ভাসছে। দু'এক কথায় বলে ওরা কেন আর কামচাটকায় ফিরতে পারবে না। খুলে বলেছিল কেন ওরা খনিতে কাজ করতে পারবে না। জানিয়েছিল, ওরা যে সামান্য 'ওর' পাবে, তাতে জীবন চলবে না। বিশ্বের মার্কেট কী ভাবে চলে সেটা খুলে বলেছিল। লোকটা ওদের স্বপ্নের গোড়ায় কুঠার মারে। ধাক্কা খেয়ে সবার ভোদকার নেশা কেটে যায়।

সরোকিনের মনে পড়ছে, লোকটার কথা শেষ হতে না হতেই আবার বৃষ্টি নেমেছিল। আকানভ ওদের গ্যাসের লণ্ঠন নিভিয়ে দিয়েছিল। তখন ওরা কিছুক্ষণ চুপচাপ বৃষ্টির আওয়াজ শুনেছে। বৃষ্টির ফোঁটা টিপটিপ করে ক্যানভাসের তাঁবুতে পড়ছিল। তারপর যার-যার স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ে। সবাই বোধহয় কথাগুলো নিয়ে ভাবছিল, তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু সে নিজে ঘুমাতে পারল না, চুপচাপ পড়ে থাকল। সবার শ্বাস-প্রশ্বাস শুনছিল সে। গভীর ঘুমে ডুবে গিয়েছিল

সবাই। এরপর অন্তত তিনঘণ্টা পেরিয়ে যায়। সে-সময় সে ভেবেছে, ওরা ভাল করেই জানে ফিরে আসা সম্ভব নয়। তবে আরেকটা ব্যাপার ভাবেনি কেউ। পরিস্থিতি পাল্টায়।

ওরা সবাই ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবেছে। অন্তত সরোকিন বুঝেছে, সে এক দশককে ফিরতে পারবে না। কমিউনিস্ট সরকারের পতন হবে, তারপর গণতন্ত্র আসবে, তখন বদলে যাবে বহুকিছু। বেশিরভাগ মানুষ ভাবতে পারেনি কমিউনিস্ট শাসন এভাবে ব্যর্থ হবে। কিন্তু সে জানত, এটা হবেই। জনগণের মনে আর উৎসাহ ছিল না, সমস্ত কর্মকাণ্ড স্তব্ধ হয়ে পড়ছিল। নেতারা ধরে নিয়েছিল, তারা যেহেতু নিজেরা কাজ করে না, মানুষ কাজ করবে না। সরোকিন অনুভব করত, নীরব এক অভ্যুত্থান চলছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজের ওজনেই মুখ থুবড়ে পড়বে। অপেক্ষা করলে ও যা চায়, সেটাই পাবে। ধাঁধার টুকরোগুলো একের পর এক মিলে যাবে—তার নিজের কিছু করতে হবে না। তবে একটু সময় দিতে হবে।

তার সঙ্গীরা আরেকটা ব্যাপার মোটেই খেয়াল করেনি। ওর মত করে ভাবেনি তারা। সে ঠিক করেছিল, যে-সম্পদ পাবে, সব নিজের জন্য রাখবে, বাকিদের কিছুই দেবে না।

সে জানত, তারা পঁয়ত্রিশ দিন আগে রিফে এসেছে। আরও চারদিন পর হেলিকপ্টার আসবে। তার অনেক আগেই কাজে নামতে হবে। হাতে যথেষ্ট সময় আছে। ওদের বলা হয়েছিল ষাট বর্গ কিলোমিটার খুঁজে দেখতে হবে। নির্দিষ্ট দিনে হেলিকপ্টার পেদ্রোপাভ্লোভস্ক-কামচাটস্কিয়ি ছেড়ে আসবে, গ্রিডের নির্দিষ্ট অংশে তাদের খুঁজবে। ফ্লেয়ার ছুঁড়তে হবে তখন। উজ্জ্বল আলো দেখে তাদের তুলে নেবে কপ্টার।

পরে হেলিকপ্টার নিয়ে চিন্তা করলেও চলবে, জানত সে। প্রথম কাজ দলটাকে খনির কাছ থেকে সরিয়ে দেয়া। কিন্তু আকানভ এখন আর এই জায়গা ছেড়ে সরবে না। প্রশংসা ছাড়বার পাত্র নয় সে। চিন্তায় পড়ে গেল সরোকিন। এদিকে হাতে কোনও অস্ত্র নেই! দ্রুত কোনও ব্যবস্থা নিতে হবে, নইলে সব শেষ হয়ে যাবে!

আরও দেড় ঘণ্টা পড়ে থাকল সরোকিন। পরিকল্পনা শেষে দুঃখবোধ বা পাপবোধ এল না তার। সময় দিল সে দলের সবাইকে। গাঢ় ঘুমে তলিয়ে রইল তারা। রাত চারটের দিকে উঠে পড়ল সে, পেন-লাইট জ্বেলে তাদের মেডিকেল কেস খুলল। ভিতরে ছিল ব্যাণ্ডেজ, অ্যান্টিসেপটিক, অ্যান্টিবায়োটিক্স ও তিনটে সিরিঞ্জে মরফিন।

কালো মাছিগুলো জেদ করে ফিরে আসে বলে এখন আর চাপড় মারে না কেউ, বিরক্ত হলেও হুলের জ্বলুনি সহ্য করে। এতদিনে সবার মুখ-হাত-গোড়ালিতে অসংখ্য হুলের দাগ হয়ে গেছে। লাল ফুটকির শেষ নেই।

সরোকিন মরফিনের একটা সিরিঞ্জ তুলে নিল, তরলটা ফেলে দিয়ে প্লাঞ্জার টেনে নিখাদ বাতাস ভরল সিলিণ্ডারে। সার্ভে দলে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল মীর, এই ইউক্রেনিয়ান একসময় কিয়েভের সেরা কুস্তিগীর ছিল—সরোকিন ঠিক করল একে আগে সরাতে হবে। সূক্ষ্ম সুঁই বসিয়ে দিল সে মীরের গলায়, ক্যারোটিড

আর্টারিতে। লোকটার আর্টারিতে সামান্য পাল্স্ টের পেল সে। ধীরে প্লাঞ্জার দাবিয়ে দিল, কুস্তিগীরের রক্তস্রোতে মিশে গেল বাতাসের বুদ্বুদ। কালো মাছির কামড়ে অভ্যস্ত লোকটা, টেরও পেল না কিছু। এরপর কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল সরোকিন। এরইমধ্যে বুদ্বুদগুলো চলে গেছে লোকটার মগজে। নীরবে স্ট্রোক করল লোকটা, কোমায় চলে গেল। আরও দু'বার বুদ্বুদ নিয়ে খেলল সরোকিন। শুধু শেষদিকে সমস্যা করল বুড়ো প্রফেসর আইয়ো আকানভ। লোকটা নিডলের খোঁচা খেয়ে চোখ মেলল। সরোকিন বাধ্য হয়ে তার মুখ চেপে ধরল, বুকের উপরে চেপে বসে এক হাতে বাতাস ইনজেক্ট করল লোকটার আর্টারিতে। আকানভ আধ মিনিট উঠে বসতে চাইল, তারপর মারা গেল।

সরোকিন গ্যাস লণ্ঠনের আলোয় পরবর্তী কাজ ঠিক করে নিল। উপকূলের পাঁচ কিলোমিটার উত্তরে আছে একটা খাড়া পাহাড়ি ঢাল। ওখানে সাবধান না হলে যে-কেউ পা পিছলাবে, পুরো এক কিলোমিটার নীচে গিয়ে পড়বে। এই তিনজন যদি ওখান থেকে নীচে গিয়ে পড়ে? দেহ এত ক্ষত-বিক্ষত হবে যে চেনা জানে না। পাষাণহৃদয় ডাক্তারও ভয় পাবে দেখলে। এদের অটপসি হবে? মনে হয় না।

প্রথম রাতে দলের সবার নোটবুক আর ফিল্ড জার্নাল পড়ল সরোকিন। খনি বিষয়ে যা কিছু লেখা ছিল, ছিঁড়ে ফেলল। এদিকের এলাকা সম্পর্কে সব জার্নাল গায়েব করে দিল। খাড়া পাহাড়ি ঢালের এ-পাশ নিয়ে যা কিছু লেখা হয়েছিল, উধাও হয়ে গেল। কারও কৌতূহল উদ্রেক করবার মত কিছু থাকল না। নিজের জার্নালের বক্তব্য বদলে দিল সে। লিখল, তারা এসব এলাকা আগেই ঘুরে দেখেছে। আর কোনও দল আবার এদিকে ফিরে আসবে, সে সুযোগ থাকল না।

ভোরে একে একে লাশ ভরা স্লিপিং ব্যাগ সরাল সরোকিন। ইউক্রেনিয়ান মীর ছিল সবচেয়ে ভারী, তার জন্য একটা স্ট্রেচার তৈরি করল সে। নিজের জন্য একটা ব্যাকপ্যাক বানাল, ওটার সঙ্গে আটকে নিল স্লিপিং ব্যাগগুলো। এরপর টানতে শুরু করল। বারবার ক্লান্তিতে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়ল সে। শেষ লাশটা পরদিন ঢালে নিয়ে যেতে পারল। সে-রাতে আর ক্যাম্পে ফিরল না, লাশের সঙ্গে রাত কাটাল।

তৃতীয় দিন ফিরে এসে ক্যাম্প গোটাল, সমস্ত মালপত্র ঢালের উপরে নিয়ে গেল। লাশগুলোর সঙ্গে বেঁধে দিল সমস্ত প্যাক। এ-দিন সব কাজ শেষ করা গেল না। ঠিক করল পরদিন লাশগুলো ঢাল থেকে নীচে ফেলবে। ভাবতে ভাল লাগে না, মানুষগুলো হাজারো পাথরে ঠোক্কর খেয়ে বহু নীচে গিয়ে পড়বে, কিন্তু কিছু করবার নেই। লোকগুলো ঠিকমত গিয়ে নীচে পড়ল, সেটা নিশ্চিত হতে হবে। হেলিকপ্টার ডেকে আনবার ফ্লেয়ার শুধু প্রফেসার আকানভের কাছে ছিল। লোকটা আগামীকাল বিকেলে ওগুলো জ্বালত।

পরদিন ভোরে ভাল নাস্তা করল সরোকিন—পাঁউরুটি, ক্যান ভরা মাংস, কমলা-লেবু সঙ্গে কফি। খাওয়া শেষে প্রথমে মীরকে ঢালে গড়িয়ে দিল সে। বিনকিউলারে দেখল দেহটা গড়িয়ে নামছে, তারপর গতি বাড়ল, ছিটকে নীচের

দিকে রওনা হলো। মনে হলো লাফিয়ে লাফিয়ে নীচের দিকে ছুটছে লোকটা। একের পর এক আঘাতে রক্তাক্ত দেহটা ফাটা টমেটোর মত হয়ে গেল। হাড়গুলো অনেক আগেই ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে। সরোকিন ভাবল, সম্ভবত বাকি দু'জনের অবস্থা আরও করুণ দেখাবে।

এক ঘণ্টা পর পাহাড়ি ঢালে সাবধানে নামতে শুরু করল সরোকিন। পাথরের খোঁচায় তার দু'হাতে ক্ষত তৈরি হলো। নীচে নেমে পাহাড়ে চলবার সমস্ত গিয়ার খুলে ফেলল, খাবার ছড়িয়ে দিল চারপাশে। কয়েকটা ক্যান খুলে খাবার ফেলে দিল। এর ফলে মনে হবে সে চারদিন ধরে এই পাহাড়ের পায়ের কাছে পড়ে আছে।

বিকেল চারটের দিকে আসবে হেলিকপ্টার। তিনটের দিকে অবশিষ্ট মরফিন দুটো বামহাতে ইনজেক্ট করল সে, অপেক্ষা করল ওগুলোর কাজ শুরু হতে। কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারল, তার মাথা হালকা হয়ে উঠছে। এবার বড় করে একবার দম নিল সে, ঠিক করে রেখেছে, আর সবার জীবন যাবে, আর তার কিছুই হবে না, সেটা ভাল দেখাবে না—কাজেই ব্যবস্থা নিল।

ডান হাতে বড়সড় একটা পাথর তুলে নিল সে, বামহাত রাখল একটা বিরাট ব্যাসল্টের উপরে, আর দ্বিতীয়বার চিন্তা না করে নামিয়ে আনল বামহাতের উপরে। রেডিয়াস-উলনা, দু'হাড় মট্ করে ভাঙল। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সরোকিন। অ্যাড্রেনালিন আর মরফিনের জোরে আরেকটা ছোট পাথর তুলে নিল সে, মাথায় আঘাত করল। প্রথম আঘাতে চামড়া ফেটে গেল। মুখে গ্যাঁজলা উঠল তার, ব্যথায় বারবার চাইল: 'মরফিন ব্যথা কমিয়ে দিক! দূর করে দিক!' কিন্তু ব্যথা কমল না।

মনে হলো অনেক পরে বহুদূরে হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনল। কয়েকবার চেষ্টা করে শেষপর্যন্ত ফ্লেয়ার ছুঁড়তে পারল। ধোঁয়ার পিছনে ছুটল সাদা ফসফোরাস। পাইলট বোধহয় সঙ্গে সঙ্গে দেখল। লোকটা দেরি না করে চলে এল। সরোকিনের এরপর আর কিছু জানা নেই। তার ঘুম ভাঙল হাসপাতালে, পেদ্রোপাভ্লোভস্ক-এ।

খুব সাধারণ ভাবে তদন্ত হলো। কপ্টারের ক্রুরা যে বর্ণনা দিয়েছিল, সেটাই আরেকবার বলল সরোকিন। জানাল কীভাবে তারা নীচে গিয়ে পড়েছে। তদন্তকারী অফিসার বলল, সরোকিনের কপাল ভাল যে অল্পের উপর দিয়ে বেঁচে গেছে সে। মাথায় আঘাত পেয়েছে, হাতের হাড় ভেঙেছে, অনেক জায়গায় চামড়া ছড়েছে—কিন্তু এর চেয়ে অনেক খারাপ কিছু হতে পারত।

লোকটা তার নোটবুক বন্ধ করে দেয়ার পর সরোকিন শুধু বলেছিল, 'সত্যি, আমার কপাল ভাল যে এখনও বেঁচে আছি!'

টারমাক ছেড়ে এয়ারপোর্ট টার্মিনালে ঢুকল সরোকিন, কয়েকবার বাম বাহু ডলল। গত কয়েক বছর ধরে বৃষ্টি-ভেজা দিনে হাড়ের ব্যথাটা হয়, মনে পড়ে কী করেছে সে।

ইমিগ্রেশন এজেন্ট সরোকিনকে লম্বা লাইনের শেষে দেখতে পেয়েছে, হাতের

ইশারায় ডাকল। স্থানীয়দের কয়েকজন গজর-গজর করল, কিন্তু মুখে প্রতিবাদ করল না।

'আবার এসেছেন, মিস্টার সরোকিন?' হাসি হাসি মুখে জানতে চাইল গার্ড, পাসপোর্ট নিল। ওটার পাতার ফাঁকে একটা বিশ ডলারের নোট উঁকি দিল। ওটা চট্ করে চলে গেল গার্ডের প্যান্টের পকেটে।

'আপনাদের আগ্নেয়গিরি থামলে তবে না শান্তিতে মস্কোয় বসে আমার অফিসের কাজ সারতে পারব,' মৃদু বিরক্তি ফুটল সরোকিনের কণ্ঠে।

'এসব আসলে ভূতের কাজ,' গোপন কথা বলছে, এমন ভাবে বলল গার্ড। 'স্থানীয়রা বলে তাদের বাবা-দাদার আত্মা রাতে তিমি মাছ ধরতে যায়, আর ভোরে আগ্নেয়গিরিতে ফিরে বড় চুল্লিতে মাংস রাঁধে।'

'হাড় পেলে তখন ভূতের দোষ দেব,' বলল সরোকিন। 'আপাতত ধরে নিলাম এখানে টেকটোনিক অ্যাক্টিভিটি সমস্যা করছে।'

সেই ঘটনার পর সুস্থ হয়ে মস্কোতে ফিরে যায় সে, গোপন তথ্য নিজের কাছেই আটকে রাখে। নীরবে ব্যুরো অভ ন্যাচারাল রিসোর্সেস-এ কাজ করতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন টুকরো হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ওখানে চাকরি করে। রাশার অস্থির দিনগুলোয় বিদেশিদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে সে। এক পাকিস্তানী তাকে পরিচয় করিয়ে দেয় মুদাস্‌সর আলী খানের সঙ্গে। লোকটাকে একটুও পছন্দ না হলেও ভবিষ্যতের কথা ভেবে ঘনিষ্ঠতা গড়ে নেয় সে। জানত, এসব লোক পরে তার কাজে আসবে।

এক সিমপোজিয়ামে এক সুইস মেটালার্জিস্টের সঙ্গে পরিচয় হয় তার। ওই লোকই তাকে পরিচয় করিয়ে দেয় সুইস ব্যাঙ্কার ফ্রেডারিখ বাউয়ারের সঙ্গে। দেখেই চিনেছে দুজন দুজনকে রুথলেস অপরচুনিস্ট হিসাবে। বাউয়ারের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসতে বেশি সময় লাগেনি তার ও মুদাস্‌সর খানের।

টাকা ঢালে ব্যাঙ্কার, কয়েকটা ছায়া-কোম্পানি গঠন করে, দুটো রাশান ড্রাই-ডক কিনে নেয়। এরপর মুদাস্‌সর খানের উপর বর্তায় মানুষ সংগ্রহের কাজ। এদিকে সরোকিন চলে যায় কামচাটকায়। সে গত এক বছরে বহুবার কামচাটকায় এসেছে। এখানে এলে সরোকিন সব সময় নিজেকে ভলকানোলজিস্ট হিসেবে পরিচয় দেয়। সাধারণ মানুষ জানে ওই লোক কামচাটকায় যত রকমের অগ্ন্যুৎপাত হয়, সেগুলো পরীক্ষা করে। মাসে অন্তত একবার এখানে আসে। তার জন্য আভাচা হোটেলে একটা রিজার্ভেশন থাকে। এর বেশি কিছু জানবার দরকার কী?

সরোকিন ব্যাগ যোগাড় করে সোজা স্কাই অ্যাডভেঞ্চারার্স কোম্পানির কাউন্টারে চলে এল। বেশ কিছুদিন হলো পেনিনসুলার রুক্ষ পর্বত-চূড়ায় স্কিইং চালু হয়েছে। তিনটে কোম্পানি স্কিয়ারদের হেলিকপ্টারে তুলে পাহাড়ে নিয়ে যায়। স্কাই অ্যাডভেঞ্চারার্স কোম্পানি স্কি ট্রিপের ব্যবস্থা করে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় এই কোম্পানি বে-আইনি কিছু করে না, কিন্তু আসলে ওটা ডামি কোম্পানি। ফ্রেডারিখ বাউয়ার ওটা ফর্ম করেছে সরোকিনের জন্য। যেন যখন তখন

হেলিকপ্টার পেতে পারে। সবসময় এলিযোভো এয়ারপোর্টে তার জন্য একটা প্রাইভেট হেলিকপ্টার থাকলে মানুষের চোখ পড়বে, তা-ই এই ব্যবস্থা।

কাউন্টারের পিছনে বসে জাপানি ফ্যাশন ম্যাগাজিন পড়ছিল মেয়েটা, সরোকিনকে আসতে দেখে পত্রিকা রেখে কপট হাসি উপহার দিল। এই মেয়েকে আগে এখানে দেখেনি সরোকিন।

'স্কাই অ্যাডভেঞ্চারার্স-এ আপনাকে স্বাগতম,' বলল মেয়েটা।

'আমার নাম ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন,' প্রায় ধমকে উঠল সে। 'ইউরি কোথায়?'

মেয়েটা বিস্মিত হলো, তারপর ওর চোখে চাকরি হারাবার ভয় প্রকাশ পেল। অফিসের আরেকদিকে পর্দা টাঙানো আছে, দ্রুত পায়ে ওপাশে চলে গেল সে। পনেরো সেকেণ্ড পর পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল সরোকিনের পাইলট, ইউরি স্ত্রামভ। লোকটা জলপাই রঙের ফ্লাইট সুট পরে আছে। 'মিস্টার সরোকিন, ভাল আছেন?' ভদ্রতা দেখাল সে। 'ভেবেছিলাম হোটেলে উঠবেন। সকালে রওনা হবেন।'

'হ্যালো ইউরি,' বলল সরোকিন। অন্য কেউ শুনে ফেলতে পারে, কাজেই বলল, 'না, এখন ওখানে যাব না। অগ্ন্যুৎপাতটা রাত নামার আগেই দেখতে চাই।'

'তা হলে ফ্লাইট প্ল্যান জমা দেব?'

'দাও।'

চল্লিশ মিনিট পর মোচড়ানো একটা উপত্যকা ধরে ছুটে চলল কপ্টার। রুক্ষ পাহাড়গুলো কখনও কখনও আট হাজার ফুট উপরে উঠেছে। স্কাই অ্যাডভেঞ্চারার্সের এমআই-এইট কপ্টার দ্রুত ছুটছে। দূরে দেখা যায় কিছু চূড়া, ওগুলো পনেরো হাজার ফুটের বেশি। উত্তরে রয়েছে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ওটা গরম ছাই ছুঁড়ছে আকাশে। কয়লার গুঁড়ো মেশা বাতাসে পোড়া পোড়া গন্ধ। কপ্টারের বয়স মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর, কাজেই ওটার আওয়াজে কথা বলা যায় না। আরও দু'ঘণ্টা এই আওয়াজ সহ্য করতে হবে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল সরোকিন, মন থেকে সমস্ত চিন্তা দূর করে দিল।

অনেক পরে কাঁধে টোকা পড়ায় ঘুরে তাকাল সে। পাইলট সামনের দিকে কী যেন দেখাচ্ছে। সরোকিন দেখল ওরা গন্তব্যের কাছে চলে এসেছে।

এত উপর থেকে দূরে তাকালে মনে হয় চারপাশের প্রকৃতি অনাদিকাল থেকে এমনি পবিত্র। গালফ অভ শেলেকভ-এর কালো জলরাশিতে মিশে আছে হলদেটে দাগ। উপকূলে বেশ কিছু কন্টেইনমেন্ট বুম ছড়িয়ে আছে। কাজ এখনও বুম পর্যন্ত যায়নি। দূর থেকে দেখতে ভাল লাগছে, কিন্তু বাস্তবে লোহার খুঁটি দিয়ে একরের পর একর জমি তারপুলিনে ঢেকে দেয়া হয়েছে। তারপুলিনের উপরে বরফের ছবি আঁকা হয়েছে, কখনও ছাইয়ের ছবি। কয়েকটা জাহাজ সৈকতে আটকা পড়েছে। ওগুলোর উপর দিয়ে গেছে ক্যামোফ্লেজ নেট। নেটের উপরে বালি, মাটি, পাথর ফেলা হয়েছে, ওগুলো দিয়ে জাহাজের আকৃতি লুকানো হয়েছে।

এই এলাকার একশো মাইলের মধ্যে মানুষের উপস্থিতি বোঝা যেত না, যদি

না জাহাজগুলোর চিমনি ধোঁয়া ছাড়ত। কর্মীদের জন্য গরম খাবার ও তাপ না দিলে চলবে না।

সাগরের দিকে তাকাল সরোকিন। একটা ট্রলার তীরের দিকে ফিরে আসছে। প্রচুর মাছ ধরেছে, ওগুলোর ওজনে ডুবুডুবু। সর্বক্ষণ দুটো ট্রলার ডাঙায় তোলা জাহাজে ফিউল, মিষ্টি পানি ও খাবার যোগান দিচ্ছে। এই বসতি দুনিয়াকে কলা দেখিয়ে মাসের পর মাস টিকে থাকতে পারবে। সরোকিনের গর্বের কারণ রয়েছে। অর্ধেক জীবন ব্যয় করেছে সে পরিকল্পনার খুঁটিনাটি সব ঠিক করতে, তারপর গড়ে তুলেছে এই বসতি!

তার কারণে হাজার মানুষ পেট ভরে খেতে পাচ্ছে আজ।

তিক্ত হাসল সরোকিন, সব সামলেছে সে। কিন্তু একটা ব্যাপার এখনও মন থেকে মানতে পারেনি। বড় দ্রুত কাজ করতে হচ্ছে। ক্রমেই বাড়তি মানুষ পাওয়া কঠিন হয়ে উঠছে।

ইউরি স্ক্রামভ সাইট ম্যানেজারের কাছে রেডিয়ো করেছে, লোকটা হেলি-প্যাডে হাজির হয়েছে। কপ্টার নীচে নামতেই এগিয়ে এল সে। দরজা খুলে নেমে পড়ল সরোকিন, কেঁপে উঠল হাড় কাঁপানো শীতল হাওয়ায়। তারা আছে আর্কটিকের মাত্র চারশো মাইল দক্ষিণে। মে মাস চলছে, কিন্তু শীত যেন জমিয়ে দেবে।

'এলেন তা হলে, সরোকিন,' বলল গিলবার্ট ওয়ালজ্যাক। 'আসুন।' সঙ্গী জিপের সামনের সিটে উঠতেই গিয়ার দিল সে, খুশি মনে বলল, 'আমাদের কাজ ঘুরে দেখবেন?' দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী খনি ইঞ্জিনিয়ার সে, লম্বা-চওড়া লোক, প্রচুর মদ গিলতে পারে।

সরোকিন মাত্র একবার এই প্রোজেক্ট ঘুরে দেখেছে, তখনই মনে মনে ঠিক করেছে, আর কখনও প্রোজেক্ট দেখতে যাবে না। মাথা নাড়ল সরোকিন, 'ভাল ভাবে কাজ চলছে জানি, বরং আপনার অফিসে চলুন। আমার ব্যাগে একটা স্কচ উইস্কি আছে।' ওয়ালজ্যাকের ভাল-মন্দ যা-ই হোক, তার কিছু যায়-আসে না। কিন্তু এখন লোকটাকে খুশি না করে উপায় নেই। প্রতি বছর ওয়ালজ্যাক বেতন হিসাবে পাঁচ মিলিয়ন ডলার পাচ্ছে, এই বেতনের হাজারগুণ কাজ আদায় করে নিতে হবে ওর কাছ থেকে মাথায় হাত বুলিয়ে।

ছয়টা জাহাজ সৈকতে বাঁধা আছে, ওগুলো সব পুরনো ক্রুজ লাইনার। মুদাস্‌সর আলী খান এক বছর আগে জাহাজগুলো যোগাড় করে দিয়েছে। ওগুলোর বয়স হয়েছে, কিন্তু জিনিসগুলো সরোকিনের প্রয়োজন পূরণ করতে যথেষ্ট। গিলবার্ট ওয়ালজ্যাক তিনশো ফুটি একটা ক্রুজ শিপের অ্যাম্বাসেডার সুইটে আস্তানা গেড়েছে। এটাই তার অফিস।

একসময় সুইটের সোনালী-নীল ডেকোরেশন ছিল দেখবার মত, কিন্তু এখন কার্পেটিও নানান জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। এখানে-ওখানে পড়ে আছে সিগারেটের বাট। আসবাবপত্রের ছাল চামড়া উঠে গেছে, বাতির ফিক্সচার ছিঁড়ে নামানো হয়েছে। সরোকিন টয়লেটে গিয়ে টের পেল নাকে প্রস্রাবের বিশ্রী দুর্গন্ধ আসছে। পারদ খসে যাওয়া আয়নাটা নষ্ট হয়ে গেছে, নিজের অবয়ব দেখে বিরক্ত হলো

সে, কাজ সেরে প্যান্টের চেইন টেনে টয়লেট ছেড়ে বেরিয়ে এল।

সুইটের লিভিং রুমের একটা সোফায় বসেছে ওয়ালজ্যাক। তার মুখোমুখি বসল সরোকিন। সাইট ম্যানেজার দুটো টাম্বলারে স্কচ ঢালল, একটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ড্রাই-ডকে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।'

'কোন্‌টায়?' স্কচ নিল সরোকিন।

'দ্য চুহায়। আপনার দুই কমাণ্ডো নিয়ম না মেনে টার্পের উপর দিয়ে হোল্ড পার হতে চেয়েছে। লোক দুটো টার্প ছিঁড়ে নীচে পড়ে মারা গেছে।'

হালকা চুমুক দিল সরোকিন, 'এমন তো নয় যে কেউ ধাক্কা মেরেছে?'

'না। এরা হারিয়ে যাওয়ায় আর সবাই খুঁজতে বের হয়। লাশ পাওয়ার পর হোল্ড আর জাহাজ খুঁজেছে তারা। ড্রাই-ডকে কেউ ওঠেনি। কারও সঙ্গে মারামারির চিহ্ন ছিল না। ধারেকাছে বলতে একটা ইরানিয়ান ফ্রেইটার ছিল। ওটার মোল্লারা জানে না আমরা কী করি, কাজেই ধরে নেয়া যায়, ওরা আমাদের উপরে হামলা করেনি।'

বিড়বিড় করে কপালের দোষ দিল সরোকিন। সে ড্রাই-ডকের জন্য স্পাত্‌স্‌ন্যাজের প্রাক্তন যোদ্ধাদের নিয়েছে। তাদের ট্রেইনিং অনুযায়ী তারা প্যাট্রলের সময় অন্যদিকে যায় না। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, এই দু'জন ভুল করেছিল। সবাইকে বলা হয়েছে, একবার কোনও জাহাজ দখল করলে যেন সতর্ক থাকে। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে, খোলা সাগরে এরা খামোকা সতর্ক থাকবে কেন! লোক দু'জন প্যাট্রলের পথ বদলে হোল্ডের উপরে যায়, ফেব্রিক ছিঁড়ে নীচে পড়ে। এর ফলে অন্যরা সাবধান হবে।

কোনও সন্দেহ নেই যে, ব্যাপারটা দুঃখজনক দুর্ঘটনা। এদের ব্যাপারে সমস্ত চিন্তা মন থেকে দূর করে দিল সরোকিন। জিজ্ঞেস করল, 'এদিকে সব খবর ভাল?'

দক্ষিণ আফ্রিকানের দাঁতগুলো খয়ে যাওয়া, হলদেটে, বিশ্রী। মনে হলো দাঁত খিঁচাল। 'দারুণ চলছে সব। আপনি যে রিফ পেয়েছেন, তার তুলনা হয় না। আগে কখনও এরকম খনি দেখিনি। রিফে খনিজের শেষ নেই। হাসতে হাসতে বারো পার্সেণ্ট পাই। আর এখন পর্যন্ত শুধু পাহাড়ি ঢালে কাজ চলছে। আমরা আসল খনি এখনও ধরিইনি!'

'কবে প্রথম চালান পাঠাতে পারবেন?'

'যা ভেবেছি, তার আগে। দ্য চুহিতে যে জিনিস আছে, সেজন্য তিনগুণ লোক দিয়েছি। ওটার ফিরতে দশ দিন লাগবে, তারপর মাল সহ দক্ষিণে রওনা করিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে। দু'দিন আগে বাউয়ারের সঙ্গে কথা হয়েছে। প্রসেসিং সেণ্টার তৈরি হয়ে গেছে। আগামী সপ্তাহে ব্যাঙ্কগুলোর ডাইস আর স্ট্যাম্প চলে আসবে।'

'তারপর? ব্যাঙ্কগুলো ওগুলো নিয়ে নেবে?'

'যত দ্রুত সম্ভব দিতে হবে।'

ওয়ালজ্যাক নতুন করে স্কচ ঢালল, গ্লাস তুলে দিল সরোকিনের হাতে। টোস্ট করে বলল, 'বাউয়ারের অসীম লোভ আর নির্বোধ গরিবগুলোর বোকামির

প্রতি। ভালই বুদ্ধি বের করেছেন সরোকিন, রাজা হয়ে যাবেন আপনি অল্পদিনেই।'

মৃদু হেসে চুমুক দিল সরোকিন স্কচে।

চোদ্দ

রাত প্রায় বারোটা বাজে। সাইকেলের দোকানের উপরের তলায় থাকে গেনজি গাওলুংরা। তাদের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল লিউ ফু-চুং। ওর কথা শুনে মুষড়ে পড়েছে দম্পতি। ওরা একবার ছেলে হারিয়েছে, চলে গেছে সে স্নেক-হেডের সঙ্গে, এবার শুনতে হলো, সাগর সারাজীবনের জন্য তাকে নিয়ে গেছে। ফু-চুং নিজেকে চিন মিলিটারিচালিত শিপিঙের খালাসি হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। বলেছে, শাংহাই ফেরবার পথে তারা একটা কন্টেইনার পেয়েছে। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে ওটা তুলে আনে ওরা। সবাই ভেবেছিল কেউ দামি কিছু হারিয়েছে। ফু-চুং লাশের ব্যাপারে আর বিস্তারিত কিছু বলেনি, শুধু বলেছে, ওরা ডায়েরি পড়ে প্রতিজ্ঞা করে ছেলেটার পরিবারকে খবর পৌছে দেবে।

গেনজিকে দেড় ঘণ্টা পটানোর পর জানা গেছে স্নেক-হেড কোথায় থাকে। এই সিয়েন লাউয়ের অফিস কাছেই। কেন ফু-চুং লোকটা সম্পর্কে জানতে চাইছে, সেটা জিজ্ঞেস করেনি গেনজি। সন্তান হারিয়ে আর কোনও কিছুতেই আগ্রহ নেই মানুষটার। হু-হু করছে তার মন হুতাশে। স্বাভাবিক।

হাঁটছে ফু-চুং। শহরে বৈদ্যুতিক আলো এসেছে, তবে সবাই এখনও নিতে পারেনি। সন্ধ্যায় বেশিরভাগ বাড়িতে মোমের বাতি জ্বলতে দেখেছে ও। এখন সব অন্ধকার। বিকেলে শহরের স্কয়্যারে বিশ চাকাওয়ালা মিলিটারি ট্রাক এসেছিল। আরও সৈন্য এসেছে। সেনাবাহিনী স্কয়্যারে ক্যাম্প করেছে।

হাঁটবার গতি বাড়াল ফু-চুং। রাস্তা একদম ফাঁকা। কোনও মানুষ নেই। শহরে মিলিটারি এলে যা হয়। সবাই যার-যার বাসায় বসে আছে। ফু-চুং জানে, একটা বার-এ যেতে হবে। ওটা ওয়্যারহাউজ ড্রিস্ট্রিক্টে। ওখানে আছে সিয়েন লাউ, একটা বার চালায় সে। এই লোকই আনজি গাওলুং ও তার ভাইদের মৃত্যুর মুখে পাঠিয়েছে।

মিন নদী থেকে এদিকে একটা খাল এসেছে, ওটার পাশ দিয়ে গেছে রাস্তা। লং মার্চ স্ট্রিট। দু'পাশে অ্যাসফল্টের বাড়ি ও ওয়্যারহাউজ। এখানে ওখানে বাতি দেখা গেল। নোনা ধরা বাড়ি-ঘর আর করোগেটেড আয়রনের ওয়্যারহাউজগুলো পুরোনো আমলের গন্ধ ছাড়ছে। ওগুলো যেন পাশের বাড়ির গায়ে পড়বে। মাঝে মাঝে ফাঁকা জমি, ঝোপঝাড় জন্মেছে। মাটি কালো, তাতে মিশে আছে গ্রিজ।

ডানপাশে একটার পর একটা তিনতলা অ্যাপার্টমেণ্ট ভবন। নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে ফু-চুং। ভবনগুলোর মাঝখানে সরু গলি আছে, ওখানে আবর্জনার স্তূপ পড়ে আছে। বর্জ্যের ভিতরে দৌড়াদৌড়ি করে খাবার খুঁজছে ইঁদুর-বিড়াল। একটা

শিশু পাশের একটা অ্যাপার্টমেন্টে কেঁদে উঠল। বাতি জ্বালল মা।

রাস্তার শেষমাথার একটা দোকান এখনও খোলা, ভিতরে আলো জ্বলছে। গানের শব্দ শুনতে পেল ফু-চুং। আন্দাজ করল, ওটাই বার। হাঁটার গতি কমাল ও, আনজির কথা মনে পড়ল। স্নেকহেড তাকে নিয়ে গিয়ে আর কারও হাতে তুলে দিয়েছে। পরের ঘটনা জানা নেই। শেষপর্যন্ত ছেলেটা লাশ হয়ে মার্ভেলের ডেকে পড়ে ছিল। আনজির অনুসরণ করবে ও, নিজেও লাশ হয়ে যেতে পারে। একবার নিজেকে সিয়েন লাউয়ের হাতে তুলে দিলে আর কিছু করবার থাকবে না। অন্ধের মত এগিয়ে যেতে হবে। কোথায়, কে জানে!

পপ মিউজিক ভেসে আসছে। কয়েকবার বড় করে শ্বাস নিল ও। ফাঁদে পা ফেলতে মন সায় দেয় না, কিন্তু আর কোনও পথও নেই। সিয়েন লাউকে ধরতে পারে ওরা, কিন্তু অপরাধী-চক্রের নেতারা শিকলের উপরের লিঙ্কটাকে সরিয়ে নিলেই আর কাউকে পাওয়া যাবে না। আগেও এমনই ঘটেছে। আসলে এদের সঙ্গে যেতে হবে, জানতে হবে কী ভাবে এদের ঠেকানো যায়।

শেষ কয়েক পা দ্রুত এগোল ফু-চুং। কোনও বাউন্সার নেই, দরজা ঠেলে বারে ঢুকল ও। বার কাউন্টারের পিছনে আছে দুটো স্পিকার, ওগুলো অতিরিক্ত জোরে বাজছে। ঘরের ভিতরে সিগারেটের ধোঁয়া এত ঘন যে মনে হলো টিয়ার গ্যাসের মধ্যে পড়েছে। ধোঁয়ায় দু'চোখ জ্বলে উঠল ওর। বিয়ার পড়ে মেঝে পিছলা হয়ে আছে। কাঠের প্ল্যাঙ্কিঙ এখানে-ওখানে পচে গেছে। বেশিরভাগ কাস্টোমার তরুণ, আমেরিকান তরুণদের অনুকরণে কালো লেদারের জ্যাকেট পরেছে। তরুণীদের পরনে মিনি-স্কার্ট ও পেট-খোলা টপ্স্। দ্রুত ছন্দের গান চলছে, কিন্তু ফু-চুঙের মনে হলো, এখানে অন্য কিছু ঘটছে। নোংরা কিছু।

পিছনে বার কাউন্টার, ওটার সামনে টুলে বসে আছে কয়েকজন। ফু-চুং চট্ করে বুঝে নিল আসল সমস্যা কোথায়। ওখানে তিনজনের পরনে ইউনিফর্ম। আর সবাই সতর্ক হয়ে উঠেছে। সিয়েন লাউ এখানে থাকলেও অন্যদের মতই নিশ্চুপ। ভুলেও মাতাল সৈন্যদের ঘাঁটাবে না সে। কাজেই ধরে নেয়া যায় তরুণরা মুখ সামলে রাখবে। সৈন্যরা পেট ভরে বিয়ার গিলে চলে গেলে পরিবেশ স্বাভাবিক হবে।

ফু-চুঙের দিকে দ্বিতীয়বার দেখল না কেউ। কাউন্টারের এক কোনায় গিয়ে টুলে বসল ও, একটা বিয়ার চাইল। আর কোনও দিকে দেখছে না এমন একটা ভঙ্গি নিল, কোমরের পেট-মোটা থলি খুলল, বের করল টাকার মোটা বাণ্ডিল। নিশ্চিত হলো, বার-টেণ্ডার ওগুলো দেখেছে। লোকটা বিয়ার দিয়ে গেল। দ্রুত চিন্তা করছে ফু-চুং, বিয়ারে এক চুমুক দিয়ে অর্ধেক নামিয়ে দিল, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, কী করবে।

সৈন্যরা চলে গেলে ভাল হতো। কিছুক্ষণ পর নিশ্চয়ই রাতের মত বার বন্ধ হয়ে যাবে। কাল সকালে মৃত সৈন্যের খোঁজ পড়বে, আর্মি গ্রাম তন্নতন্ন করে খুঁজবে—সিয়েন লাউ তখন আড়ালে চলে যাবে, লাশটা না পাওয়া পর্যন্ত স্মাগলিং রিং বন্ধ রাখবে। আর্মি দু'চারজন খারাপ লোককে ধরবে, পিটাবে, কিন্তু কিছুই জানতে পারবে না। লাউ চুপচাপ অপেক্ষা করবে, লাশ পাওয়ার পর আর্মি

একসময় বাধ্য হয়ে চলে যাবে। তখন সে নতুন করে নিজের আদম-পাচার শুরু করবে। ফু-চুং জানে, ও আজ রাতে পাচার হয়ে গেলে ভাল হয়। যত দ্রুত সম্ভব জানতে হবে স্নেক-হেড ও জলদস্যুদের মধ্যে কী সম্পর্ক। আড় চোখে তিন সৈন্যকে দেখল ফু-চুং। এবার এদের এখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে। বার-টেণ্ডারের তিক্ত চেহারা বলছে, কিছুক্ষণ পর সবাইকে চলে যেতে বলবে সে।

সৈন্যের একজন প্রচুর বিয়ার টানছে। লোকটা কর্পোরাল। সঙ্গের দু'জন বয়সে কম, পদেও। কর্পোরাল আকাশ-কুসুম গল্প শুনিয়ে তাদের মুগ্ধ করছে, সেইসঙ্গে একের পর এক বিয়ার শেষ করছে। দুই জোয়ান হাঁ করে শুনছে। চেহারা বলে দেয় এরা কয়েকদিন আগেও খামারে কাজ করত। যা-ই শুনছে, বিশ্বাস করছে, ভাবছে দুনিয়ায় কী না কী যে ঘটছে, আর তারা লাঙ্গল নিয়ে পড়ে ছিল! কর্পোরালের কথাবার্তায় মনে হয় সে শহরের মানুষ। ফু-চুং ভাবল, ও যে শহুরে সৈন্যকে খুন করে এসেছে, এই লোক হয়তো তারই বন্ধু! গল্প বানাতে ওস্তাদ এ, বলে চলেছে কী ভাবে শত শত মেয়েকে পাগল করেছে। কত লোক তার কাছে হেরে গেল, তার কোনও হিসাব নেই। কমবয়সী সঙ্গীদের মাথা নষ্ট করছে লোকটা। দুই তরুণ এসব শুনে ভবিষ্যতে কী করে বসবে, কে জানে! লোকটা আরেকটা কাহিনি শুরু করেছে, মাথা কাত করে কাছের মেয়েটাকে দেখাল সে, চাপড় দিল ওর উরুতে, চাতুর্যের হাসি নিয়ে বলতে শুরু করল, 'কিছু কিছু মেয়ে আবার আমাকে দেখেই...'

স্থানীয় তরুণরা কিছু করে কি না দেখতে অপেক্ষা করল ফু-চুং। কালো জিন্স ও মোটর সাইকেলের জ্যাকেট পরা এক লোক ঘরের অন্ধকার প্রান্তে তাকাল, দ্রুত চোখের ইশারা করল। সৈন্যরা দেখেনি, কিন্তু ফু-চুং দেখেছে। ওদিকের প্রায় অন্ধকার টেবিলে বসে আছে তিনজন লোক। তাদের সঙ্গে বসেছে দুটো মেয়ে, দেখলে মনে হয় যমজ। তাদের দু'পাশের লোক দুটো বডি-গার্ড। সম্ভবত তৃতীয় লোকটা এ শহরের স্নেকহেড, সিয়েন লাউ। কালো টি-শার্টের উপরে কালো সুট পরেছে সে, চোখে কালো সানগ্লাস। সিয়েন লাউ আস্তে করে মাথা নাড়ল। আর্মির সঙ্গে গোলমালে যেতে চায় না সে।

ফু-চুঙের দৃষ্টি লক্ষ করেছে স্নেকহেড। নিজের মনের ইচ্ছা লুকিয়ে রাখল না ফু-চুং। উঠে দাঁড়াল, বিয়ার শেষ করে বোতলের গলাটা ধরল। সিয়েন লাউ রে-ব্যান সানগ্লাস নাকের ডগায় নামিয়ে দিয়ে ওকে দেখছে। চেহারায় কোনও অনুভূতি নেই। তার দুই সঙ্গী কিছুই টের পায়নি।

কর্পোরালের পিছনে চলে গেল ফু-চুং, লোকটার মাংসল কাঁধে টোকা দিল। লম্বা-চওড়া লোকটা পাত্তা দিল না, ঘাড় ফেরাল না। তার সঙ্গের এক জোয়ান ফু-চুংকে সতর্ক চোখে দেখল। ইতিমধ্যে ঘরের সবাই টের পেয়ে গেছে কিছু ঘটছে। ফিসফিস করে কথা বলছে তারা, তারপর চুপ হয়ে গেল। স্টেরিয়োতে এখনও গান বাজছে। ফু-চুং দ্বিতীয়বারের মত কর্পোরালের কাঁধে টোকা দিল। আগের চেয়ে জোরে।

বারের স্টুলে চরকির মত ঘুরল কর্পোরাল, ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল। ফু-চুং যা ভেবেছে, তার চেয়ে অনেক স্বাভাবিক আছে লোকটা। টলছে না। শুয়োরের মত

কুতকুতে দু'চোখ সরু করল সে, সামনে দাঁড়ানো কাঁধ-সমান লোকটাকে দেখল। মনে হলো চিন্তায় পড়ে গেছে সে। ভাবছে, এই খাটো শালার-পো শালা তার সঙ্গে লাগতে এল কী করে! বুঝে উঠতে পারল না, ব্যাটা কোন্ সাহসে এল!

ভদ্রতার সঙ্গে বলল ফু-চুং, 'আমার মনে হয় তোমার ওই ভদ্রমহিলার কাছে মাফ চাওয়া উচিত। তারপর তোমরা এখান থেকে চলে গেলে সবাই খুশি হবে।'

কর্পোরালের কণ্ঠ গমগম করে উঠল, হাসছে। 'তোমার তা-ই মনে হয়?' আরেকবার হেসে নিল সে। 'তুমি নিজে বরং চলে যাও।' ভারী একটা হাত রাখল সে ফু-চুঙের বুকে, তারপর গায়ের জোরে ধাক্কা মারল।

তৈরি ছিল ফু-চুং, চট্ করে পিছলে সরে গেল ও। কর্পোরাল শত্রুকে ঠেলতে গিয়ে নিজেই এক পা এগিয়েছে। ফু-চুং যা ভেবেছে, কর্পোরালের দুই সঙ্গী স্টুলে বসে থাকল। ওরা আশা করছে ওদের ওস্তাদ দারুণ একটা পিট্টি দেবে এই লোকটাকে। কর্পোরাল বিদ্যুৎ-গতিতে শত্রুর মাথা লক্ষ্য করে ঘুসি ছুঁড়ল। ঝুঁকে পড়ে ঘুসি এড়িয়ে গেল ফু-চুং। সঙ্গে সঙ্গে এল বামহাতি জ্যাব। এবার আর সরতে পারল না ও, ঘুসি এসে পড়ল পাঁজরের উপরে। তীব্র ব্যথার ফাঁকে ভাবল ফু-চুং, হয় লোকটা মোটেই মাতাল নয়, নইলে বার-এ মারামারিতে রীতিমত অভ্যস্ত।

কর্পোরাল নিজের বিয়ারের বোতল তুলে নিল, ওটার তলার অংশ কাউন্টারে আছড়ে ভাঙল। তার হাতে রয়ে গেল অর্ধেকের বেশি। তলার অংশ ছুরির মত তীক্ষ্ণধার। দেরি না করে শত্রুর মাথা লক্ষ্য করে চালাল সে। ফু-চুং নিজের বোতলটা ভাঙতে পারত, কিন্তু কর্পোরালকে মেরে ফেললে ওর চলবে না। এদের তিনজনকে বার থেকে বের করে দিতে হবে, কিন্তু পুলিশ আসবে না, এমন কিছু করতে হবে!

কর্পোরাল দাঁত খিঁচিয়ে হিসহিস করে বলল, 'আমার মনে হয় একটু রক্ত হারানো উচিত তোমার!' শত্রুর গলায় বোতল বসাতে চাইল সে। কাঁচ আরেকটু হলে ফু-চুঙের কার্টিলেজ-আর্টারি ছিঁড়ে দিত, কিন্তু লাফিয়ে পিছিয়ে গেল ও। ভাঙা বোতল ওর মুখের সামনে দিয়ে চলে গেল। কর্পোরালের পাঁজরে বোতলে গুঁতো বসাল ও। পেটের পেশিতে আঘাত পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, পিছিয়ে গেল।

তার সঙ্গের দুই জোয়ান উঠে দাঁড়িয়েছে।

ওদের দিকে কড়া চোখে চাইল ফু-চুং, চাপা স্বরে বলল, 'এর মধ্যে নাক গলিয়ো না।' কর্পোরালের দিকে দেখল, পরমুহূর্তে মার্শাল আর্টের স্ট্যান্স-এ দাঁড়াল, মনে হলো আসলে ওর শরীর পানি দিয়ে তৈরি। বোতলটা আস্তে করে ছেড়ে দিল ও।

শত্রুর অনুকরণে কুঁজো হয়ে দাঁড়াল কর্পোরাল, মুখের সামনে দু'হাত দ্রুত দোলাল, চোখ রাখল ফু-চুঙের দিকে।

মস্ত ভুল করল সে।

ফু-চুঙের ঊর্ধ্বাঙ্গ নড়ল না, কিন্তু পরপর তিনবার লাথি ছুঁড়ল ও—পাঁজরে, হাঁটুতে ও পেটে। পেটে খুব ভাল ভাবে লাগল না, তবে লোকটার সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

কর্পোরালকে সোজা হতে দিল না ফু-চুং, মুহূর্তে তার গায়ের কাছে চলে গেল। মনে হলো ওর দু'হাত দ্রুত কী যেন করল। লোকটা একের পর এক ঘুসি খেল—গলায়, পাঁজরে, সোলার প্লেক্সেস-এ, মাথায়, আবার পাঁজরে, নাকে। দ্রুত পিছিয়ে গেল ফু-চুং। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড নিয়েছে ও। লোকটার মুখ এখন রক্তাক্ত একটা পিণ্ড।

তার সঙ্গের এক জোয়ান হাত মুঠো করে ফেলল, ভাবছে কর্পোরালের সাহায্যে এগোবে কি না। সুযোগটা দিল না ফু-চুং, তার গলায় হাত রেখে বাধা দিল। চাপা স্বরে বলল, 'ওর জন্যে বিপদে পোড়ো না। ওটা কোনও মানুষ না।' ফু-চুঙের শ্বাস একেবারে স্বাভাবিক, আস্তে করে ধাক্কা দিয়ে ছেলেটাকে স্টুলে বসিয়ে দিল।

কর্পোরাল এখনও দাঁড়িয়ে আছে, টলছে সামনে-পিছনে। চোখে তীব্র ঘৃণা। সাধারণত এমন ঘটলে সৈন্যরা পরে আবার দলবল নিয়ে আসে। সুযোগটা দিল না ফু-চুং, লোকটার মাথার পাশে পরপর দুটো রাউণ্ড-হাউজ কিক মারল। কর্পোরাল প্রথম কিকে উবু হয়ে গেল, চোখ উল্টে গেল তার। দ্বিতীয় কিকে ধড়াস্ করে পড়ল সে। মেঝে থরথর করে কাঁপল। জ্ঞান হারিয়েছে লোকটা। আগামী কয়েক ঘণ্টা ঘুমাবে। অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা চুপচাপ পড়ে থাকবে, কথা বলতে পারবে না। পরে প্রতিশোধের কথা ভাববে।

দুই জোয়ানের দিকে তাকাল ফু-চুং। 'ভাগ্য তোমাদের নিজেদের হাতে, ওর বদলে ভাল কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত তোমাদের। ওর মুখে বড়বড় কথা শুনতে পাবে, কিন্তু তোমরা বিপদে পড়লে ও কোনও সাহায্যে আসবে না। কথাটা বুঝতে পেরেছ?' নীরবে মাথা দোলাল এক জোয়ান। 'ওকে ক্যাম্পে নিয়ে যাও। সার্জেন্টকে বোলো ও সিঁড়ি থেকে নীচে পড়েছে। এরপর আর কখনও এখানে এসো না।'

মারপিট করা হবে না বুঝে স্বস্তির শ্বাস ফেলল দু'জন। অজ্ঞান কর্পোরালকে তুলে নিল ওরা, ওজনটা নিয়ে ধীর পায়ে বার ছেড়ে চলে গেল দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ফু-চুং, হাতের ইশারায় বার-টেণ্ডারের কাছে আরেকটা বিয়ার চাইল। এবার মনে হলো কোনও বাঁধ ভেঙে গেছে, সবাই একইসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল।

ফু-চুং এক চুমুক বিয়ার শেষ করতে না করতে সিয়েন লাউয়ের এক বডি-গার্ড চলে এল। লোকটা ভদ্রতার সঙ্গে বলল, 'মিস্টার লাউ তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

নীরবে বডি-গার্ডকে দেখল ফু-চুং, আরেক চুমুক বিয়ার খেয়ে উঠে দাঁড়াল। ও ভাল করেই জানে, একবার মাঠে খেলতে নামলে আর পেছানোর পথ থাকে না। ওর জীবন নিয়ে খেলবে ওই স্নেকহেড। ওকে হয়তো তুলে দেবে পরের লিঙ্কের কাছে। সেরকম হলে ওকে কি সমুদ্রগামী কোনও ট্রলারে ওঠানো হবে? কন্টেইনারে আটকা পড়বে ও? তার অনেক আগেই তো লোকটা ওকে মেরে ফেলতে পারে। এসব চিন্তা করে লাভ কী? বডি-গার্ডের পিছু নিল ও, অন্ধকার টেবিলের দিকে হাঁটছে।

যমজ তরুণীদের কী যেন বলল সিয়েন লাউ। মেয়েদুটো টেবিল ছাড়ল। পাশ কাটানোর সময় তাদের একজন ফু-চুঙের উরুতে নিতম্ব ঘসে গেল। পাত্তা দিল না ফু-চুং, সিয়েন লাউয়ের উল্টোদিকের একটা চেয়ার টেনে বসল। সানগ্লাস খুলল লাউ। লোকটার বয়স তিরিশের বেশি নয়, আন্দাজ করল ফু-চুং। কিন্তু পঙ্কিলতা তার চেহারায় ছাপ ফেলেছে। দেখলেই মন বলে, এ অন্ধকারময় দুনিয়ার লোক।

'নিশ্চয়ই এত কীর্তির পিছনে কোনও কারণ আছে তোমার?' বলল লাউ।

'ওরা বারে থাকলে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না।'

'মানে?'

জবাব দিল না ফু-চুং, গলায় ঝোলানো ডগ-ট্যাগটা খুলে নিল, দাগে ভরা টেবিলের উপরে রাখল।

লাউ ওটা তুলে নিল না, পার্টির দিকে তাকিয়ে হিসাব কষল। 'ইলেকশনের জন্যে আর্মির যারা এসেছে, তাদের সঙ্গে এখানে এসেছ তুমি?'

'না। আমার স্টেশন ছিল ফউজোউয়ে।'

'কিন্তু এখানে চলে এলে কেন?'

'কিছুদিন আগে আমার এক বন্ধুর কাযিনকে সাহায্য করেছ তুমি।'

'আমি বহু মানুষের উপকার করেছি। ...তো ওই লোকের কী উপকার করেছি?'

'তুমি ওকে সোনার পাহাড়ে পাঠিয়ে দিয়েছ,' বলল ফু-চুং। সাধারণ চাইনিজরা আমেরিকাকে সোনার পাহাড় বলে। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল ফু-চুং, তারপর বলল, 'আমিও যেতে চাই।'

'সম্ভব না।'

'কেন?'

উদাস হয়ে গেল সিয়েন লাউ। 'উপকারের বদলে টাকা নিই আমি।'

এ-কথায় থলি থেকে এক তোড়া নোট বের করে আনল ফু-চুং। 'আমি জানি কীভাবে কাজটা করা হয়। আমার এখনই অনেক টাকা দিতে হবে। আর বাকি টাকা আমেরিকায় পৌঁছে। আমার কোনও আত্মীয়-স্বজনকে চেনো না তুমি, কাজেই ওদের ধরতে পারবে না।' কয়েকটা উয়ান-এর নোট সরাল ফু-চুং, এবার দেখা গেল ইউএস ডলারের নোট। 'এখনই পাঁচ হাজার দেব। চায়না ছাড়ার সময় আরও দু'হাজার। এরপর আমার কথা একেবারে ভুলে যেতে হবে।'

নাক কুঁচকাল সিয়েন লাউ, চোখ সরু হয়ে গেল। 'আর আমি যদি এখন তোমার টাকা নিয়ে পরে স্বীকার না করি যে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে?'

দু'পায়ে টেবিলটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ঘোরাল ফু-চুং, এক বডি-গার্ডের বুকে জোরে ঠেকাল। ফুসফুসে ব্যথা পেয়ে শ্বাস ছাড়ল লোকটা। এক লাফে উঠে দাঁড়াল ফু-চুং, টেবিলের উপরে কনুই দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল—সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের কাঠ দু'টুকরো হয়ে গেল, খসে পড়ল ওগুলো। তার আগেই টেবিলের একটা পায়া চলে এল ওর হাতে। ওটা দ্বিতীয় বডি-গার্ডের কণ্ঠে ঠেকাল, লোকটা পিস্তল বের করবার সাহস পেল না।

সিয়েন লাউ চেয়ারে বসে আছে, নিজ চোখেও বিশ্বাস করতে পারছে না তার

সেরা দু'জন লোককে এভাবে শায়েস্তা করা যায়।

'আমি তোমাদের তিনজনকে মেরে ফেলতে পারতাম,' স্পিকারের আওয়াজের উপর দিয়ে বলল ফু-চুং। কথাটা সবাই শুনল। এবার বলল, 'আমি একটা ভাল প্রস্তাব দিয়েছি। তুমি রাজি না হলে বলে দাও, আমি চলে যাব।'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তুমি সোনার পাহাড়ে ভাল করবে,' বলল লাউ। এবার শয়তানির হাসি হাসতে শুরু করল সে।

টেবিলের পায়া ফেলে দিল ফু-চুং, আগের চেয়ারে বসে পড়ল। বডি-গার্ড আলতো হাতে গলা ঘসল, প্রতিপক্ষের দিকে তাকাল না আর।

'এখান থেকে কোথায় যেতে হবে?' জানতে চাইল ফু-চুং।

'তোমার সঙ্গে যাবার মত আরও দু'জন আছে এখন,' বলল লাউ। ঘড়ি দেখল সে। 'ঠিক করেছিলাম আগামীকাল রাতে ওদের রওনা করিয়ে দেব, কিন্তু ওই কর্পোরাল এদিকটা গরম করে তুলবে। আমার একটা ট্রাক আছে, এক ঘণ্টা পর রাস্তার ওদিকের প্রথম বাঁকে অপেক্ষা কোরো। আগামীকাল আমার কণ্ট্যাক্টের সঙ্গে ফউজোউয়ে দেখা হবে তোমার। ওরাই তোমাকে বুঝে নেবে। দরকারী কাগজ তৈরি করবে।' থেমে গেল সিয়েন লাউ। তার চোখের দৃষ্টি কড়া হয়ে উঠল। 'একটা পরামর্শ মনে রেখো, ভুলেও ওদের সঙ্গে লাগতে যেয়ো না। আজ রাতে খেলা দেখিয়েছ তুমি, কিন্তু বাড়াবাড়ি করতে গেলে মারা পড়বে।'

ঘাড় কাত করল ফু-চুং, মেনে নিয়েছে উপদেশটা।

***